তিব্বতে সওয়া বছর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সূচীপত্র

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'তিব্বত মে সওয়া বর্ষ' নামক ভ্রমণ কাহিনীর ভাষান্তর এই গ্রন্থ। লেখকের অনুরাগী বন্ধু শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মতে এটি হিন্দী সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী। অনেকদিন আগে এই বইটির একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট বিনয় সহকারেও এ কথা বলা যায় যে সেটি পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বত্র বিশ্বস্ত অনুবাদ ছিল না। উপরন্তু মূল গ্রন্থের পাদটীকাগুলো সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জিত হয়েছিল। বর্তমান অনুবাদে সেগুলোকে মূল কাহিনীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে রাখা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে মূল বইটি দিল্লী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার আগে অবশ্য এর কিছু কিছু অংশ পাটনা এবং এলাহাবাদের কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে মূল গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য এমন কি গ্রন্থটির কোনো পরবর্তী সংস্করণ বা মুদ্রণের কোনো সংখ্যাও এখন আর পাওয়া যায় না। ফলে প্রথম সংস্করণে যে সমস্ত অসঙ্গতি বা ত্রুটি ছিল পরবর্তী কালে তা বর্জিত বা সংশোধিত হয়েছিল কিনা তা বোঝবার কোনো উপায়ই এখন আর নেই। অতএব অনুবাদ করতে গিয়ে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রথম সংস্করণের যে সংখ্যাটি আছে তারই সাহায্য নিতে হয়েছে। রাহুলজীর অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের আরও একটি মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে—এখানে তিনি নিজে কোনো ভূমিকা লেখেননি। সে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদ শ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। আলোচ্য গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তাঁর এবং বহু পাদটীকার সংযোজনও করেছিলেন তিনি। রাহুলজীর বাসনা ছিল যে তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি যেন ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় কিন্তু নানা কারণে বইটির প্রকাশে আরও কিছু সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক কারণে যে প্রেসে বইটির মুদ্রণ কাজ চলছিল সেখানে হামলা হয় এবং তার ফলে গ্রন্থের একটি অধ্যায় খোয়া যায়। যতদূর মনে হয় পরবর্তী কালে সেই অধ্যায়টি পুনরায় আর লেখা হয়নি। তবে গ্রন্থ-সম্পাদক তাঁর লেখা ভূমিকায় ঐ অধ্যায়ে কি ছিল তা সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে, যখন তিব্বত ছিল এক

নিষিদ্ধ দেশ, তখন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এক মহৎ সংকল্পে ব্রতী হয়ে, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে গোপনে সে দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁর সেই নিষিদ্ধ যাত্রার বর্ণনা আজও আমাদের মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। রাহুলজী যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তখন তিব্বতের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী দেশ সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং মঙ্গোলিয়াতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, আর মহাচীনে তখনো যবনিকা কম্পমান। রাহুলজী তখনো মার্ক্সবাদে আস্থাবান হননি, বৌদ্ধদর্শনে বিশেষভাবে আগ্রহী ছাত্র মাত্র। সে জন্যই বোধহয় তাঁর এই ভ্রমণলিপিতে ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ কোনো আলোচনা করেননি, যদিও সে দেশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত কুফল তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উপরন্তু একটা অধ্যায়ে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে মঙ্গোলিয়াতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে যাবার ফলে তিব্বতের বিহারগুলোতে সে সময় মঙ্গোল ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তিব্বত যে রাজনৈতিকভাবে চীনেরই অংশ সেটা কিন্তু রাহুলজী তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীতে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। পরবর্তী কালে আমাদের দেশের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা তার নেতারা তিব্বতের তথাকথিত স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা প্রবহমান ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। রাহুলজী তাঁর ভ্রমণকালে ও দেশের যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপ দেখেছিলেন, আজ নিশ্চিতভাবেই সে অবস্থা নেই তবুও পাঠক এ বই থেকে পরবর্তী কালে তিব্বতে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলোর কারণ সম্বন্ধে বেশ খানিকটা অবহিত হতে পারবেন।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে যাদের সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় বন্ধুবর শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় ও তদীয় পত্নী গীতা মুখোপাধ্যায়ের। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটি বাংলায় অনুবাদ করবার সুযোগ দিয়ে চিরায়ত প্রকাশনের শ্রীশিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় আমায় অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। জানি না রাহুলজীকে যথাযথভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে পারলাম কিনা।

মলয় চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

সংবত ১৯৩৩। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে। লাহোরে এক বন্ধু এসে একজন সাধুর সংবাদ দিয়ে বলল, তিনি নাকি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সাধুজীর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাও বন্ধুটির মুখেই শুনলাম। সম্প্রতি সাধুজী নাকি কাশ্মীর-লাদাখ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। বর্তমানে সাধুজী একটু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের দিকে ঝুঁকেছেন এবং সে সম্পর্কে বিস্তৃততর জ্ঞান লাভের জন্য সিংহলে যাবার কথা ভাবছেন। আমার বন্ধুটির সঙ্গে সাধুজীর পরিচয় হবার পর তিনি তাঁকেও সিংহলে তাঁর সহযাত্রী হতে অনুরোধ করেছেন। বন্ধুটি এ বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম এবং আমার অনুরোধমতো বন্ধুটি আমাকে সেই সাধু বাবা রামোদার দাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঐ চেহারা যদি সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটির পর আর কখনও না দেখতাম তা'হলেও ঐ বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু চেহারা আর তার মধ্যেকার উজ্জ্বল দুটি চোখকে কোনো দিনই ভুলতে পারতাম না। সমস্ত অবয়বের মধ্যেই একটা সংকল্পে অটল থাকার দৃঢ়তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। বাবা রামোদারের তৎকালীন আস্তানা ছিল বিহারের সারণ জেলাতে। এরপর নানা ঘটনাচক্রে আমি লাহোর থেকে পাটনা চলে আসি।

ইতিমধ্যে বাবা লঙ্কায় চলে গিয়েছেন। আমার পূর্বোক্ত বন্ধুটির সঙ্গে যখন পাটনায় পুনরায় দেখা হলো, তখন তিনিও লঙ্কায় যাবার যোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত। হিন্দী সাহিত্য জগতে বর্তমানে আমার বন্ধুটিকে সকলে আনন্দ কৌশল্যায়ন বলেই জানে। লঙ্কা থেকে লেখা বন্ধুর চিঠিপত্রে বাবা রামোদার দাসের খবরা-খবর অবশ্যই থাকত।

পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বাবা রামোদার তাঁর নতুন পরিকল্পনা মনের মধ্যে নিয়ে পাটনাতে সদাকৎ আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর পরিকল্পনার কথা অবশ্য আগেই আমাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। তিব্বতী

এবং চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থাদি অধ্যয়নের জন্য তিনি ঐ সব দেশে যেতে আগ্রহী এবং এ জন্য পাঁচ বছর সময় লাগবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। এখন তাঁর আরও পরিকল্পনা যে, দেশে ফিরে নালন্দায় এক আর্য বিদ্যালয় স্থাপন করবেন এবং সেখানেই শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেবেন। লঙ্কা থেকে প্রায় উনি এক আলমারি বইপত্র এবং একটি নোট বই সঙ্গে এনেছিলেন। ঐ নোট বুক থেকেই জানতে পারি যে, তিনি সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রটিকে আলোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। সমস্ত বইপত্র এবং সেই নোট বুকটি আমার কাছে রেখে তিনি তিব্বত চলে গেলেন। এরপর তাঁর প্রথম পত্র পাই নেপাল থেকে এবং দ্বিতীয়টি শীগর্চী থেকে।

এ সময় নতুন একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। বাবা রামোদার যেমন রিক্তহস্তে লঙ্কা গিয়েছিলেন, তেমনভাবেই তিব্বত পাড়ি দিলেন। রাহাখরচের জন্য সাকুল্যে একশোটি টাকা তাঁর সঙ্গে ছিল। লঙ্কাতে উনি ভিক্ষুদের পরিবেণতে (বিদ্যালয়ে) পড়তেন এবং পড়াতেন। নিজের ত্যাগময় ভিক্ষু জীবনের নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উনি এবং আনন্দ লঙ্কার সমস্ত বৌদ্ধ-সমাজকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে, তিব্বতে গিয়ে কোনো মঠে ছাত্র হিসেবে থেকে অধ্যয়ন করবেন আবার প্রয়োজন মতো অধ্যাপনা করেও নিজের খরচ চালাবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ও রকম ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কদর তিব্বতে হবে না। তিব্বতের কোনো ড-ছঙ-এ (বিদ্যালয়) গের-গেন (অধ্যাপক) কিম্বা গে-শো (লেকচারার) হওয়া তাঁর পক্ষে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হলো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারত থেকে আর্থিক সাহায্য ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে খুবই কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এ রকম অবস্থায় কাশী বিদ্যাপীঠের পরিচালক-মণ্ডলী তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আমাদের দেশে তেমন গুণগ্রাহী কই, যাঁরা নিজ কর্মক্ষেত্রে নীরবে কাজ করে যাওয়া কর্মীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। সে দিক থেকে কাশী বিদ্যাপীঠের পরিচালকমণ্ডলীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তবে এঁদের সাহায্য পৌঁছাবার আগেই লঙ্কা থেকে সাহায্য গিয়ে পৌঁছেছিল, অবশ্য তাতে শর্ত ছিল এই যে,

তিব্বতের কাজ সমাপ্ত করে বাবা রামোদার লঙ্কায় ফিরে যাবেন।

কিন্তু এ বার সিংহলে উনি কয়েকমাস মাত্র ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর 'বুদ্ধচর্যা' লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কাশীতে 'বুদ্ধচর্যা' প্রকাশের ব্যবস্থা করে, তারপর বিহারে স্বাধীনতাআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন এমন পরিকল্পনা করে তিনি কাশীতে এলেন। ঘটনাচক্রে আমার আস্তানাও তখন কাশীতে। আচার্য নরেন্দ্রদেবও সে সময় ওখানেই ছিলেন। এ সময়ে তিব্বতযাত্রা সম্পর্কে লাসা পৌঁছানো পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। কিছুদিন পর কাশী বিদ্যাপীঠ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে যাত্রাপথের বিবরণ সম্পূর্ণ লেখা হয়ে ওঠেনি। তা'ছাড়া লাসা পৌঁছাবার আগের অংশটি, যা তখনও ছাপার অপেক্ষায় ছিল, পুলিশের হামলায় খোয়া গেলো। গ্রন্থের চতুর্থ পর্বের পরেই ছিল এই অধ্যায়। পাঠকদের চোখে সহজেই এই অসঙ্গতি ধরা পড়বে। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে বাবা রামোদার সাত দিনে লাসা পৌঁছেছিলেন এবং লাসাতে উপস্থিত হয়েই মহাগুরু দলাই লামার কাছে সংস্কৃত ভাষায় পদ্যছন্দে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে ভারত এবং তিব্বতের সুপ্রাচীন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং নিজেকে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিয়ে তিব্বতে থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করতে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

তিব্বত থেকে বাবা রামোদার বহু চিত্রপট এনেছিলেন, যার অনেকগুলো কাশী বিদ্যাপীঠ বন্ধ হয়ে যাবার পর এদিক ওদিকে ছিটকে যায়। ভ্রমণ বৃত্তান্তের যে-যে অংশ লেখা হতো, আচার্য নরেন্দ্রদেব, আমার সহধর্মিণী এবং আমি, লেখকের মুখ থেকে সেগুলো শুনতাম। সেই সময় আমার এবং আমার স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমার একবার মনে হয়েছিল যে, সমস্ত ঘটনাই লিখে রাখব, কিন্তু বাবা রামোদার তাঁর জীবনকাহিনী দ্বিতীয় বার আর শোনাতে রাজি হননি। তবু তাঁর সে দিনের বলা কাহিনীর যতটুকু আমার মনে পড়ছে তা হলো :

ভদন্ত রাহুল, আজমগড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে

তিনি কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। উনি বিবাহ করেননি, বাল্যকালেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং সারণ জেলার একমা নামে একটা জায়গায় জনৈক বৈষ্ণবের মোহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে একমার সেই মঠটিই তাঁর ঘরবাড়ি হয়ে যায়। তারপর আবার তিনি অধ্যয়নের জন্য কাশীতে এবং অযোধ্যায় আসেন। বর্তমানে ভদন্ত রাহুল আমিষ ভোজনের একজন জোর সমর্থক এবং তাঁর বিশ্বাস যে, মাংসাহার ত্যাগ করার ফলেই জাতি এ রকম ক্ষীণকায়, দুর্বল হয়ে পড়ছে। অথচ এই সে দিন বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী রামোদার পশুবলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অযোধ্যায় এক মন্দিরে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। এরপর তিনি আর্য সমাজের দিকে ঝোঁকেন এবং আরবী ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর মৌলানা মহেশপ্রসাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সারণ জেলা ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র এবং পরবর্তী কালে হাজারীবাগ জেলে তাঁর স্থান হলো। গদর আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেবার জন্য আমেরিকা প্রবাসী শিখদের, পাঞ্জাবের শিখ ধর্মমন্দির থেকে পতিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে গদর আন্দোলনের কর্মীরা কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ধর্ম-মন্দিরের ঐ কলঙ্কজনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে, দেশের সমস্ত ধর্মীয় সংগঠনেই তা প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। গয়াতে বৌদ্ধমন্দিরও বৌদ্ধদের হাতেই তুলে দিতে হবে, এই মর্মে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। গয়াতে কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকেই ভদন্ত রাহুল এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ মতবাদের দিকে ঝোঁকেন। তারপরের ঘটনা তো সকলেরই জানা।

এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পাঠকদের আমি রাহুলজীর প্রকৃত সত্য খোঁজার আগ্রহ এবং মৌলিক চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আজ হিন্দী সাহিত্য জগতে মৌলিক সৃষ্টির চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু মৌলিক রচনার জন্য চাই মৌলিক জীবন। বাঁধা পথের পথিকরা কি কখনও নতুন পথ আবিষ্কার করতে পারে? আমাদের দেশে তিব্বতী ভাষা কোথাও শেখানো হয় না, আর রেলগাড়ীর অগ্রিম কাটা টিকিট হিমালয়ের উচ্চতা অতিক্রম করার পথে কোনো কাজেই লাগে না। জার্মানীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, অধ্যাপক রুডলফ অটো

সিংহলে থাকার সময় রাহুলজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনার রচনায় এ রকম আধুনিক বিশ্লেষণপদ্ধতি কিভাবে এল। উত্তরে রাহুলজী বলেছিলেন —দেখুন মাত্র কয়েকমাস ইংরেজী লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়েছিল, তাই আধুনিক পদ্ধতি বলে আপনি যা বোঝাতে চাইছেন তার উৎস কি তা বলতে পারব না।

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী কি ? তার পরিচয় এই বইয়ের প্রতি পাতায় ছড়ানো আছে। আমার মতে এইটিই হিন্দী ভাষায় প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য।

লিখনশৈলীর ব্যাপারে দু'একটি কথা এখানে না বলে পারছি না। হিন্দীর অধিকাংশ সাহিত্যিক আজ অতিকথন এবং অতিরঞ্জনের দোষে ভুগছেন। যার ফলে বিষয়বস্তু কখনও গভীরে পৌছাতে সক্ষম হয় না এবং সামান্য বিষয়েই কঠিন কঠিন শব্দের তুফান ছুটতে থাকে। এ বইয়ে কিন্তু অত্যন্ত সংযত শব্দ চয়নের পরিচয় আছে প্রতিক্ষেত্রে এবং তা অবশ্যই বাহুল্য বর্জিত। এইটিই আদর্শ লিখনপদ্ধতি।

আমার পক্ষে এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা যে, বিদগ্ধ লেখক তাঁর গ্রন্থের সম্পাদনা করার দায়িত্বভার আমাকে দিয়েছেন। যাত্রাপথের বিবরণকে কতকগুলি অধ্যায়ে এবং অধ্যায়গুলিকে উপঅধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। কিছু কিছু পাদ-টীকাও আমি যোগ করেছি। পুস্তকের প্রথমাংশ প্রয়াগের সরস্বতী, কাশীর বিদ্যাপীঠ এবং পাটনার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঐ সমস্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারীগণ এটিকে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। বিশেষত সরস্বতীতে মুদ্রিত ছবির ব্লক দিয়ে সরস্বতী কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাহুলজীর ইচ্ছা ছিল যে ইংরাজী ১৯৩৩ সালেই যেন তাঁর বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমি আরও অন্য অনেক গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি, এটা আমার দুর্ভাগ্য। তা'ছাড়া তাড়াহুড়োতে আরও কিছু ভুলচুকও হয়ত থেকে যেতে পারে।

পাটনা, ১৯৩৪ জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো	জন্ম :	৫৫৭ খৃঃ.
ঐ	শাসনকাল :	৫৭০-৬৩৮ খৃঃ.
তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের	প্রবেশ :	৫৮০ খৃঃ.
সম্রাট মঙ-স্রোন-মঙ-ব্‌চন	শাসনকাল :	৬৩৮-৬৫২ খৃঃ.
ছুর-স্রোঙ-মঙ-ব্‌চন	ঐ	৬৫২-৬৭০ খৃঃ.
ল্‌দেগ-চুগ-ব্‌র্তন	ঐ	৬৭০-৭৪২ খৃঃ.
স্রোঙ-ব্‌দে-ব্‌র্তন	ঐ	৭৪২-৭৮৫ খৃঃ.
ওদন্তপুরী বিহার	নির্মাণ ও সমাপ্তিকাল :	৭৬৩-৭৭৫ খৃঃ.
মগধ সম্রাট ধর্মপাল	শাসনকাল :	৭৬৯-৮০৯ খৃঃ.
মু-নি-ব্‌চন-পো		৭৮৪-৭৮৬ খৃঃ.
আচার্য শান্তরক্ষিত	রাজপুত্রকে ভিক্ষুদীক্ষা দান :	৭৬৭ খৃঃ.
ল্‌দে-ব্‌চন-পো	শাসনকাল :	৭৮৭-৮১৭ খৃঃ.
র্‌ল-পো-চন	ঐ	৮১৭-৮৪১ খৃঃ.
দর-ম-উ-দুম-ব্‌চন	ঐ	৮৪১-৮৪২ খৃঃ.
রিন-ছেন-বসঙ-পো		৯৫৮-১০৫৫ খৃঃ.
আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	তিব্বতবাস :	৯৮২-১০০৪ খৃঃ.
সোমনাথ কাশ্মীরী	তিব্বত গমন :	১০২৩ খৃঃ.
শা-লু মঠ	স্থাপনা :	১০৪০ খৃঃ.
নারো-পা	মৃত্যু :	১০৪০ খৃঃ.
ডে-পুঙ মহাবিহার	স্থাপনা :	১৪১৬ খৃঃ.
সে-রা মহাবিহার	ঐ	১৪১৯ খৃঃ.
টশী-লুন-পো মহাবিহার	ঐ	১৬৩৭ খৃঃ.
চোঙ-খ-পা	জন্ম :	১৩৫৭ খৃঃ.

প্রথম পর্ব

ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ সমূহ

সিংহল থেকে ফেরা

১৯২৬ সালে একবার আমার লাদাখ যাবার সুযোগ হয়েছিল। সে সময় ফিরতি পথে তিব্বতের সীমান্ত-লাগোয়া ডংরী-খরস্থুম প্রদেশে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম। ইচ্ছা থাকা সত্বেও অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে সেখানে বেশীদিন থাকতে পারিনি, ফিরে আসতে হয়েছিল। এরপর অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা এই উভয় দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলাম সিংহলে। সেটা ১৯২৭-২৮ সালের কথা। সিংহলে থাকাকালীন সময়েই আর একবার তিব্বত যাবার প্রয়োজন অনুভব করলাম। সিংহলে অধ্যয়ন কালেই দেখেছিলাম যে, ভারতের প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র সমূহ এবং বৌদ্ধযুগের বহুবিধ শাস্ত্রবিচার ইত্যাদি বিষয়ের বহু অজানা তথ্য একমাত্র তিব্বতে গেলেই পেতে পারি। অতএব সিংহলে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিব্বত যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার সিংহলের কাজ শেষ হতে ১৯২৮ সালের নভেম্বর পার হয়ে গেলো। অতঃপর ১লা ডিসেম্বর রাত্রিতে তিব্বতের উদ্দেশে সিংহল ত্যাগ করলাম।

তিব্বতে যাওয়াটা যে খুব সহজ ব্যাপার নয়, সেটা ভালো করেই জানতাম। সে জন্য অনেকদিন আগে থাকতেই কিভাবে, কোন পথে ও-দেশে যাব তার একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। এটাও আমার জানা ছিল যে, সোজা সরল পথে পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির সাহায্যে বৃটিশ ভারতের সীমানা পার হওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না। কারণ, প্রথমত সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে আর দ্বিতীয় কারণ, বিগত জীবনে আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ। সে জন্যই কালিম্পঙ থেকে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত যে সোজা রাস্তাটি গিয়েছে সে পথে যাবার চিন্তা প্রথমেই বাদ দিলাম। কারণ ঐ পথ, গ্যাংচী পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের খরদৃষ্টির মধ্যে। অতএব সোজা পথের আশা ত্যাগ করে বাঁকা পথে, অর্থাৎ নেপালের ভেতর দিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। এ পথ বেশ দুর্গম, তা'ছাড়া নেপালে ঢোকাও বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ

নেপালের রাজকীয় সরকারের দৃষ্টিতে ভারতীয় মাত্রেই সন্দেহের পাত্র। তিব্বত সরকারের ধারণাও তথৈবচ। সুতরাং আমাকে তিনটি সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে তিব্বতে যেতে হবে। তিব্বত সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য কাওয়াগুচি নামে জনৈক জাপানী বৌদ্ধ শ্রমণ এবং মাদাম নীলের লেখা তিব্বত সম্পর্কিত বই দু'খানা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললাম। বই দুটিতে তিব্বতীদের আচার-আচারণ ছাড়া বিস্তৃত কিছু পেলাম না। অতএব ভারত সরকারের সার্ভে ম্যাপ দেখে কাঠমাণ্ডু থেকে তিব্বত যাবার রাস্তাটুকুই শুধু টুকে নিলাম। নক্সা, মানচিত্র ইত্যাদি সঙ্গে রাখাও বিপজ্জনক। শিবরাত্রির সময়ে পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য নেপালে প্রচুর তীর্থযাত্রীর ভিড় হয়। ঠিক করলাম ঐ ভিড়ের মধ্যে মিশে তীর্থ-যাত্রী সেজেই নেপাল প্রবেশ করব। এর আগে একবার শিবরাত্রির সময়ে নেপালে গিয়ে প্রায় দেড় মাস কাটিয়েছিলাম। সে জন্য ঐ সময়ের লোক-সমাগম ইত্যাদি বিষয়গুলি বেশ ভালোই জানা ছিল। শিবরাত্রির অবশ্য এখনও তিন মাস বাকী, তাই এই সময়টা পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের বৌদ্ধতীর্থ এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখে নেব স্থির করলাম।

ট্রেনে কলম্বো থেকে তলেমন্নার, সেখান থেকে দেড় ঘণ্টার ষ্টীমার যাত্রা। ধনুস্কোডীতে নেমে আমার প্রথম কাজ হলো শুল্ক বিভাগের আওতা থেকে আমার বইপত্র ছাড়ানো। বইপত্রও বড় কম নয়, মণ পাঁচেক তো হবেই। বইপত্রের অধিকাংশই ত্রিপিটক এবং তদ্‌সম্পর্কিত ভাষ্য। যাই হোক, সেগুলো সহজে উদ্ধার করা গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই রেলে পার্সেল করে ওগুলোকে পাটনা পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। এ বার ঝাড়া হাত পা, অতএব নিশ্চিন্ত মনে এ অঞ্চল পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। মাদুরা, শ্রীরঙ্গপত্তনম, পুণা দেখা শেষ করে পৌছালাম কার্লেতে। কার্লের গিরিগুহাটি মালবাড়ি রেলষ্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে। এ পথে মোটর যাতায়াত করে। দেখলাম পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করা হয়েছে। গুহার সামনে বিশাল চৈত্য, সেখানে অবস্থিত বিভিন্ন স্তম্ভের গায়ে নির্মাতাদের নাম খোদাই করা রয়েছে। চৈত্যের পাশে ছোট ছোট কুঠরি, এগুলোতে ভিক্ষুদের বাস ছিল।

কার্লে থেকে নাসিক। নাসিকের আশপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট গুহা আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে, আমি মাইল পাঁচেক দূরের পাণ্ডব গুহাটি দেখতে গেলাম। এখানকার গুহাটির অবস্থান কার্লের গুহার মতো অত উঁচুতে নয়। গুহার চারদিকে মহাযান-পন্থীদের দেবদেবীর প্রচুর মূর্তি। এখানে একটা বিশালাকারের বুদ্ধমূর্তি আমাকে মুগ্ধ করল। কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীর মূর্তিও এখানে আছে। একটা শিলালিপিতে এই ধর্মের ভক্ত শক রাজপুত্র উষবদাত ও তাঁর পত্নীর নামোল্লেখ আছে। খৃষ্ট জন্মের একশো বছর কিম্বা তারও কিছু

আগে এই বংশ নিজেদের দেশ ত্যাগ করে প্রথমে সিন্ধু-গুজরাট অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন, পরবর্তী কালে উজ্জয়িনী এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। উষবদাত বিখ্যাত শকরাজ নহপানের জামাতা। খৃষ্ট পূর্ব ৫৩ সালে রাজা সাতকর্ণী কিম্বা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীর কাছে নহপান পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে উজ্জয়িনী তাঁদের অধিকারচ্যুত হয়। অনেকের মতে শক-বিজয়ী রাজা সাতকর্ণীই ইতিহাসের বিক্রমাদিত্য।

নাসিক থেকে বেরুল অর্থাৎ ইলোরা যাবার পরিকল্পনা ছিল। ঔরঙ্গাবাদ রেলষ্টেশনে নামতেই একদল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হলো। প্রশ্নকারী পুলিশ কর্মচারীদের কয়েকজনের ব্যবহার যতদূর অভদ্র হতে হয়। আমিও বিরক্ত হয়ে তাদের কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে অস্বীকার করলাম। বলা বাহুল্য আমার এ হেন ব্যবহারে পুলিশ-পুঙ্গবেরা আরও ক্ষেপে উঠল এবং আমাকে নিয়ে তহশীলদারের কাছে হাজির করল। সৌভাগ্যক্রমে তহশীলদার ভদ্রলোক ছিলেন ঐ সব পুলিশ কর্মচারীদের ঠিক বিপরীত। তিনি যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই এই জিজ্ঞাসাবাদের কারণ জানালেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গভর্নর ইলোরা পরিদর্শনে আসছেন, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এগুলো করা হচ্ছে। যাই হোক তহশীলদার ভদ্রলোকের অনুগ্রহে তাড়াতাড়িই ছাড়া পেলাম এবং ইলোরা যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ইলোরা পর্যন্ত মোটর গাড়ী যায়। আমিও বলা বাহুল্য, তারই শরণ নিলাম। মোটরে যেতে যেতে মিঃ. স্থথর নামে এক আমেরিকানের সঙ্গে পরিচয় হলো। শুনলাম তাঁর কপালেও আমারই অনুরূপ ব্যবস্থা জুটেছে। ভদ্রলোক আমেরিকার ওহিও-ওয়েসলীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। তিনি ইন্দোচীনের আঙ্কোরভাট ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সমূহ দর্শন করে এ দেশে এসেছেন। ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। আমরা এক সঙ্গে ইলোরার কৈলাস মন্দির এবং তার চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। এখানকার বিশাল ভাস্কর্যের কীর্তি দেখে উনি তো অবাক। বললেন —ইলোরা আঙ্কোরভাটের চেয়েও সজীব আর বর্ণময়।

বেরুলে থাকবার কোনো জায়গা নেই। না আছে কোনো ডাকবাংলো বা কোনো হোটেল। গুহার কাছেই একটা পুলিশ চৌকী। চৌকীর পুলিশ কর্মচারীরা সকলেই মুসলমান এবং অতিশয় সজ্জন। এদের সহৃদয় ব্যবহার ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনের পুলিশের দুর্ব্যবহারের দুঃখ ভুলিয়ে দিলো। এদের সঙ্গে বসে ঝর্ণার জল সহযোগে এদেরই তৈরি রুটি দিয়ে আমরা প্রাতরাশ সারলাম। এরপর আবার ইলোরা দর্শন। এ বার শুরু করলাম বৌদ্ধগুহার দিক থেকে। কৈলাসের বাঁ-দিকে বারোটি বৌদ্ধ-গুহা। তারপর হিন্দুধর্মের গুহা, মাঝখানে কৈলাস এবং আমার বাঁ-দিকে চারটি জৈনগুহা। আসলে এগুলোকে গুহা না বলে পাহাড়ের গায়ে খোদাই

কনৌজ কৌশাম্বী

১৭ই ডিসেম্বর প্রথমে গো-শকট এবং পরে মোটর বাসে জলগাঁও পৌছালাম এবং সেখান থেকে সাঁচী রওনা হয়ে গেলাম। মিঃ সুথরের ভ্রমণ পরিকল্পনা অন্য রকম অতএব এখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো।

সাঁচী পৌছালাম ভোরবেলা। এ সেই স্থান যেখানে দেবপ্রিয় সম্রাট অশোকের পুত্র কুমার মহেন্দ্র ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে চিরপ্রস্থানের আগে অনেক দিন কাটিয়ে ছিলেন। এখান থেকেই একদিন বুদ্ধদেবের বাণী সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতেরও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানেই বুদ্ধদেবের প্রধান দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়নের দেহাস্থি প্রোথিত ছিল যা পরবর্তীকালে তুলে লণ্ডন মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অতি সম্প্রতি আবার তা দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সাঁচী স্তূপ দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। ভূপাল রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ব্যবস্থাদিও খুব সুন্দর। ১৯ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত কোঁচে এক বন্ধুর আশ্রয়ে কাটল। দশার্ণদের ভূমি শুকনো হলেও কত সুন্দর, মনোরম। (দশার্ণ পূর্ব মালবের প্রাচীন নাম। বর্তমানে ধসান নামে পরিচিত)।

শিবরাত্রির আগেই মধ্যদেশের (কুরুক্ষেত্র থেকে বর্তমান বিহার প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম, এখনও নেপালীরা এ অঞ্চলকে মধেস এবং এখানকার অধিবাসীদের মধেসিয়া বলে থাকে) তথাগতের পবিত্র পাদস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে এমন স্থান সমূহ আবার দর্শন করার কাজ সেরে ফেলতে হবে। অতএব ২৭শে ডিসেম্বর আবার আমি আমার বিগত বৈষ্ণব জীবনের রামউদার সাধু হয়ে গেলাম। (পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিশ বছর বয়সেই ঘর ছেড়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক মোহন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সারণ জেলার কোনো এক জায়গায় বাস করতেন। সে সময় তিনি তাঁর পূর্ব নাম ত্যাগ করে রামউদার সাধু এই নাম গ্রহণ করেছিলেন)। সঙ্গে রইল শুধু ছোট্ট একটি ঝোলা এবং সিংহলে আমার অধ্যাপক বন্ধু ভিক্ষু আনন্দের দেওয়া ছোট একটি বালতি। এই সম্বল করে ২৭ তারিখেই কনৌজ পৌছে গেলাম। এখন আমি বৈরাগী মানুষ তাই আশ্রয়ের জন্য বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। টাঙ্গাওলাকে বললাম শহরের কাছাকাছি যদি কোনো বাগান থাকে সেখানে নামিয়ে দিতে। ভাগ্য ভালো কাছেই একটা বাগান পেলাম। বাগানটিতে ছোট একটা মন্দিরও রয়েছে। মন্দিরের পূজারী আমাকে স্থান নির্দেশ করে দিলেন। দু'বছর পরে খোলা আকাশের নীচে শীতের রাত্রি কাটাবার অভিজ্ঞতা হলো এবং বলা বাহুল্য অভিজ্ঞতাটি সুখকর নয়। (রাহুলজী দু'বছর সিংহলে ছিলেন এবং সেখানে চারদিক সমুদ্র-বেষ্টিত থাকার ফলে শীতের আধিক্য বোধ হয় না)।

কনৌজ? নতুন কনৌজ ধুলোবালি আর আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসেছি মৃত অতীতের সন্ধানে, তাই ধুলো, ময়লা, আবর্জনা দেখে পিছিয়ে আসার প্রশ্ন আমার নেই! ২৮শে সকাল বেলায় সামান্য কিছু জলযোগ সেরেই স্তূপের ধুলো-ময়লা ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। এমনিতে সারা দেশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ধুঁকছে কিন্তু এইসব জীর্ণ প্রাচীন নগরী দেখলে মনে হয় এদের অবস্থা আরও অনেক বেশী শোচনীয়। বহু শতাব্দী আগে এদের অধঃপতনের যাত্রা শুরু হয়েছে, কে জানে আরও কতকাল চলবে। বিশেষ করে এ অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা ভাষায় অবর্ণনীয়। আমি চর্মকার সম্প্রদায়ের একজনকে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে নিলাম। সারাদিন আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবে সে দাবি করল মাত্র চার আনা।

বিশাল কনৌজ একদিনে দেখা সম্ভব নয় এবং তার বর্ণনা করাও এই সীমাবদ্ধ পরিসরে অসম্ভব। আমি যথাক্রমে অজয় পাল, রৌজা, টিলামহল্লা, জুম্মা মসজিদ, সীতা রসোই, বড়াপীর, ক্ষেমকলাদেবী, মখদুমজাহানীয়া, কালেশ্বর মহাদেব, ফুলমতী দেবী ও মকরন্দনগর দর্শন কোনোক্রমে শেষ করলাম। সর্বত্রই প্রাচীন নিদর্শনের ছড়াছড়ি দেখলাম। শুনলাম সত্য-মিথ্যায় পল্লবিত কাহিনীর প্রচার। ভাঙা অথচ সুন্দর পাথরের মূর্তির আধিক্য চোখে পড়ল। এগুলোর মধ্যে থেকে ঐতিহাসিক কান্যকুব্জ নগরীর ক্ষীণ রেখা বহু কষ্টে খুঁজে নিতে হলো। ফুলমতী দেবীর চারপাশে অবশ্য বুদ্ধমূর্তির সংখ্যাই বেশী।

আমার পথপ্রদর্শককে চার আনা পয়সা দিলাম। সে উৎসাহিত হয়ে তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করে দিলো। বলা বাহুল্য, সেগুলোর বিনিময়েও তাকে আরও কিছু অর্থ দিলাম। এ বার ফেরার পালা। কিন্তু ফেরবার জন্য টাঙ্গার খোঁজ করে হতাশ হলাম। কাছেই কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছিলেন। আমাকে দেখে একজন বললেন —আসুন শাহ্ সাহেব। কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা উচ্চশ্রেণীর ফকিরকে শাহ্ সম্বোধন করে জানতাম, তাই তাদের সম্বোধনে একটু কৌতুক বোধ করলাম। বললাম —ভাই, এই দুনিয়ায় ধুলো ঘেঁটে বেড়ানোই যাদের কাজ, তাদের আবার কোত্থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া।

—জুম্মার নামাজ কি জামা মসজিদে সারলেন? আসুন না আমাদের সঙ্গে খানিক বসুন, পান খান।

—না ভাই অনেক ধন্যবাদ। পান খাওয়ার অভ্যেস নেই, তা'ছাড়া এখনই ফরাক্কাবাদ যেতে হবে।

এঁরা আমার লম্বা আলখাল্লা দেখেই ফকির ঠাউরেছেন। এ রকম ভুল অবশ্য অনেকেই করেন, আবার সনাতনী হিন্দুদের কাছে তো আমি নাস্তিক বলে

পরিচিত। ওখানে আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম, ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা লরী পেয়ে গেলাম। লরী চেপে কনৌজ থেকে বিদায় নিলাম। পথের দু'পাশে সবুজ ক্ষেত, আমের বাগান, কোথাও গ্রাম্য হাট আর রোগা শরীর, ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক, বই বগলে দেশের ভবিষ্যৎ বর্তমানের গ্রাম্য ছাত্রদলের বাড়ি ফেরা —এইসব দেখতে দেখতে ফরাক্কাবাদ পৌঁছালাম। ওখান থেকে ফতেগড় অভিমুখী ট্রেনে চেপে মোটা ষ্টেশনে নামলাম। রাত্রিটা ষ্টেশনে কাটল। একে ডিসেম্বর মাসের রাত তার ওপর কন্‌কনে উত্তুরে বাতাস, সারারাত শীতটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম। সকালে উঠে সংকিসা বসন্তপুরের রাস্তা ধরলাম।

২৯শে ডিসেম্বর ভোরেই কালী নদী পার হলাম নৌকায়। তারপর মেঠো পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে পথ ভুল হলো। অবশেষে বেশ খানিকটা অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি করে পৌঁছালাম বিশারীদেবীতে। দেখলাম সম্রাট অশোকের অক্ষয় কীর্তি অশোকস্তম্ভগুলোর কাছেই কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী রোদ পোহাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ হলো, নাম পুষ্কর গিরি। পুষ্কর গিরি আমাকে নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির মতো আপ্যায়ন জানালেন। যাই হোক মুখ হাত ধুয়ে অশোক স্তূপ অধিকারিণী অজ্ঞাতনাম্নী বিশারীদেবীকে দর্শন করলাম। পুষ্কর গিরি আমার জন্য কিছু খাবার-দাবারের জোগাড়ে গেলেন, আমিও সংকিসগড় রওনা হলাম। সংকিসগড় মহাভারতের প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্যের মহানগর সাংকাশ্যের আধুনিক নাম। প্রাচীন যুগের বিরাট সব ধ্বংসাবশেষ এখনও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এ সব অঞ্চলে এখনও নাকি গভীর করে কূয়া খুঁড়তে গেলে মাটির নিচে কাঠের তক্তার হদিশ পাওয়া যায়। অসম্ভব নয়, কারণ আগেকার যুগে প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি সবই প্রায় কাঠের তৈরি হতো। সংকিসা দেখে আবার গিরি মহাশয়ের আশ্রয়ে ফিরে এলাম এবং আহার্যও জুটল। এরপর আবার মোটাতে প্রত্যাবর্তন। মোটায় ফিরে আসার উদ্দেশ্য ওখান থেকে দেখতে যাব বৎসরাজ উদয়নের বিখ্যাত কৌশাম্বী নগরী। তাই শেকোহাবাদের ট্রেনে চাপলাম, সেখানে গাড়ী বদলে ভোরে ভরবারী পৌঁছালাম (এলাহবাদ থেকে ২৪ মাইল পশ্চিমে একটি রেলষ্টেশন)। গাড়ী থেকে নেমেই হাত মুখ ধুয়ে জলযোগের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললাম। ভাবলাম পভোসা হয়ে কৌশাম্বী যাব। শুনলাম কিছু দূর পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যেতে পারে তারপর অবশ্য হাঁটতে হবে। ঘোড়ার গাড়ী একখানা যোগাড়ও হলো, ভাবলাম কাঁচা রাস্তা হলেও ন'মাইল যেতে আর কতই বা সময় লাগবে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। আমি দুটি বাচ্চা ছেলেকে পথ প্রদর্শক হতে রাজী করালুম, অবশ্য এ জন্য তাদের কয়েকটি পেয়ারা কিনে দিতে হলো। গ্রাম থেকে বেরোবার মুখে মাঝবয়েসী সৌম্য-চেহারার এক ভদ্রলোকের

সঙ্গে দেখা। প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকটির চেহারা যে কোনো মানুষের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করবে। আমাকে দেখে বললেন—শাহ্ সাহেব এত বেলায় কোথায় যাচ্ছেন? আসুন আজকের দিনটা অধীনের গরীবখানায় কাটিয়ে যান।

—ভাই সাহেব, আজকে আমার পভোসা যাওয়া যে খুবই জরুরী। যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম।

ভদ্রলোক এতেও নিরস্ত না হয়ে বললেন—ফকিরের কাছে তো আজ আর কালের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সৌভাগ্যবশত আমার মতো হতভাগ্যের জীবনে আপনার মতো লোকের সেবা করার একটা সুযোগ যখন এসেছে তখন তা থেকে এই অভাগাকে বঞ্চিত করছেন কেন? এ রকম ভালোবাসার আহ্বান উপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর তবু সময়ের দিকে তাকিয়ে উপেক্ষা করতেই হলো। অনেক কষ্টে ভদ্রলোককে নিরস্ত করলাম। ইতিমধ্যে দেখি আমার পথ প্রদর্শকদ্বয়ের মধ্যে ইতস্তত ভাব। অতঃপর কিছু পয়সা দিয়ে তাদের ছেড়ে দিলাম। তারা মহানন্দে ফিরে গেলো। গ্রামে ফিরে গিয়ে খুবই উচ্চকণ্ঠে এই ফকিরের গুণকীর্তন যে করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঘোড়ার গাড়ীর মালিকও এ বার অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকায় তাকেও অব্যাহতি দিলাম।

করারী থেকে পভোসার দূরত্ব পাঁচ ক্রোশ, এ রকমই শোনা ছিল। শীতের দিন, বেলা ছোট। তাই দিনমানেই পভোসা পৌঁছাবার বাসনা। চারদিকের সবুজ মাঠ যেন আরও বেশী সবুজ মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়ে যাবার ফল। কাছেই রাখাল বালকের দল ছাগল-ভেড়া চরাচ্ছে, কণ্ঠে তাদের প্রাচীন কোনো লোকগাথা। এইসব দেখতে দেখতে আবার পথ হারিয়ে ফেললাম। উপায় স্বরূপ পথ চলতি একজনকে পাকড়াও করলাম। লোকটির বাড়ি গঙ্গা থেকে যে সেচখাল বেরিয়েছে, তারই পাশের কোনো এক বড় গ্রামে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমায় পভোসা পৌঁছে দিতে পারে কিনা, বিনিময়ে তাকে কিছু পারিশ্রমিক দেবো এও জানালাম। সব শুনে সে বলল যে, সে তার মনিবের বিনানুমতিতে কিছুই করতে অপারগ। বর্তমানে সে মনিবের জন্য গাঁজা কিনে নিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরে মনিবের অনুমতি নিয়ে, সে আমাকে সঙ্গে করে পভোসা পৌঁছে দেবে। আমি তথাস্তু বলে গ্রামের পাশের খালের ধারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরেও যখন সে ফিরল না তখন অনুমান করতে পারলাম যে লোকটি তার গঞ্জিকাসেবী মনিবের অনুমতি পায়নি। যাই হোক আর একজনের কাছ থেকে পথের মোটামুটি হদিস এবং পথিমধ্যে কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি পড়তে পারে কিনা জেনে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। খালের ধার ঘেঁসে চলতে চলতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ির খোঁজ পেলাম। বেলা প্রায় শেষ, তবুও পভোসা পৌঁছাবার ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে তখনও সজীব। তাড়াতাড়ি পণ্ডিতজীর বাড়ি পৌঁছালাম, কিন্তু এই অভাবের দেশে অবেলায় দ্বারে অতিথি এসে

দাঁড়ালে কেউই প্রসন্ন হয় না। আরও আগে গেলে ভালো আশ্রয় জুটবে এটুকু আশ্বাস অন্তত পাওয়া গেলো। সুতরাং আবার চলো। রাস্তা এখানে খালের ধার ছেড়ে মাঠে ঢুকেছে। পথ হারিয়েছি কিনা সেটা পথ চলতি মানুষজনকে মাঝে-মাঝেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হচ্ছিল। রাস্তা এখানে অসমতল। মনে মনে ভাবছিলাম এই গঙ্গাযমুনাবিধৌত বংসভূমি কবে চেদী-রাজ্যের মতো বন্ধুর হয়ে গেলো। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, চারদিকে অন্ধকার। পভোসা পৌছাবার ক্ষীণ আশাটুকুও এখন মন থেকে বিলুপ্ত। এমন সময় সামনে একটা পুকুর দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি পুকুরের একপাশে একটা বিরাট বটগাছ আর তার কাছেই ভগ্নপ্রায় এক মন্দির। মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই। রাত্রিবেলা অপরিচিত কোনো গ্রামের ভেতরে ঢোকার চেয়ে এই মন্দির চত্বর অনেক ভালো বলে মনে হলো। টর্চের আলোতে মন্দির চত্বরটি ভালো করে দেখে নিয়ে রাত্রি যাপনের উদ্যোগ করছি এমন সময় মানুষের কণ্ঠস্বর কানে এল। এগিয়ে গিয়ে দেখি কাছেই একটা গাছের নীচে দু'খানা গোরুর গাড়ী। গাড়ীর গাড়োয়ানদের কাছে শুনলাম যে, কয়েকটি জৈন পরিবার এই গাড়ী করে পভোসায় তীর্থদর্শনে এসেছে এবং রাত্রি কাটাবার জন্য ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছে। পভোসা পৌছেছি জেনে মন আনন্দে নেচে উঠল, যাক কষ্ট সার্থক হয়েছে। গাড়োয়ানরা আগুন জেলেছিল, আমিও আমার ঝোলাঝুলি নিয়ে তাদের পাশেই রাত কাটালাম। ভোরে উঠে যমুনায় স্নান সারলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে যমুনায় যাবার পথ। সে পথে কয়েকটি হিন্দু মন্দির দেখতে পেলাম। ফেরবার পথে মনে হলো, যে জন্য এত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে পভোসা পৌছেছি সেই পাহাড়টি দেখা শেষ করে ফেলতে হবে। পালি-সূত্রের গ্রন্থে বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দের তৎকালীন কৌশাম্বীর বিখ্যাত বিহার ঘোষিতারাম থেকে দেবকট-সোভব নামক জায়গায় একটা ছোট পাহাড়ে যাত্রার বিবরণ পেয়েছিলাম। তখন মনে হতো যমুনার কাছে সে পাহাড়টি কোথায় ? কিন্তু সিংহলে আমার আচার্য এবং বন্ধু আয়ুষ্মান আনন্দ যখন ভারতবর্ষের সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করে সিংহলে ফিরেছিলেন তখন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে থেকে পাহাড়টির অবস্থিতি রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল। গ্রামের প্রান্তদেশে অবস্থিত এই ছোট পাহাড়টি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। উত্তর দিকের অংশটি বড় পাহাড় নামে পরিচিত। এই পাহাড়ের নীচে পদ্মপ্রভুর মন্দির আছে। গত রাত্রিতে যে জৈন পরিবারগুলি তীর্থদর্শন মানসে এখানে এসেছেন তাঁদের একজন বললেন, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা দরজা খুলিয়ে দর্শনের ব্যবস্থা করে দেবো।

আমি সম্মত হলাম এবং পা চালিয়ে তাঁদের আগেই মন্দিরের কাছে পৌছে গেলাম।

এখানে পাহাড়ের গা বেশ মসৃণ, সমতল। এই মসৃন পাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল অজন্তা-মূর্তি। মূর্তিগুলিকে দেখে মনে হলো এগুলো

সম্ভবত জৈন ধর্মের। কৌশাম্বীর সেই সমৃদ্ধির কালে এখানে বহু জৈন সন্ন্যাসী এবং শ্রমণেরা বাস করতেন। সে সময় কত ধনী, জ্ঞানী-গুণী মানুষের পদধূলি পড়েছে। জৈন তীর্থযাত্রীর দলটিও ইতিমধ্যে এসে পড়লেন। মন্দিরের দ্বার খুলিয়ে তাঁরা নিজেরা দর্শন করলেন এবং আমাকেও তাঁরা সেই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, মন্দিরের বাঁধানো প্রাঙ্গণে হলদে হলদে বিন্দুর মতো কি যেন ফুটে বেরোচ্ছিল। আমার সহযাত্রীরা বললেন আগে এখানে কেশর-বর্ষণ হতো। তখন মানুষ ধর্মপরায়ণ, সরল প্রকৃতির ছিল। এখন মানুষ মূলত অসৎ এবং ধর্ম ও সত্য থেকে ভ্রষ্ট হবার ফলে আর ও রকম বর্ষণ হয় না, তবে এখনও মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। ভাবছিলাম, অতীতের স্মৃতিচারণ সব সময়ই মধুর। এই জৈনদের ধর্মই ভারতে প্রচলিত ধর্মমতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। কতযুগ ধরে স্রোতধারার মতো জৈনধর্মের ধারাও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বৌদ্ধধর্ম এ দেশে লুপ্তপ্রায়, না হলে তাও এর সমসাময়িক। কিন্তু শঙ্করাচার্য বা রামানুজের মতবাদ তো এদের তুলনায় নেহাতই হাল আমলের। আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, সে দিনের সমৃদ্ধিশালী জনপদ কৌশাম্বী আজ লুপ্ত, জনশূন্য এক প্রায়-বন্ধুর প্রান্তর মাত্র। কতবার এ অঞ্চলের শাসনকর্তা পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন কালের সেই কেশর বর্ষণের কাহিনী এইসব তীর্থযাত্রীদের কাছে সে দিনের মতোই সত্য বলে বিশ্বাস পেয়ে আসছে আজও।

এ বার আমি পাহাড় পরিক্রমা করব মনস্থ করলাম। সঙ্গী তীর্থযাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে আহারের আমন্ত্রণ জানালেন, বলা বাহুল্য সে আমন্ত্রণ সানন্দেই স্বীকার করলাম। পাহাড়ের ওপরে পুরানো স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আর তার কাছেই অপেক্ষাকৃত নতুন আর একটি স্তূপ। পাহাড়ের ওপর থেকে যমুনার নীল ধারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যমুনার ওপারেই মহাভারতের বিখ্যাত শিশুপালের চেদী রাজ্য। ওখানেই কোনো এক গহন অরণ্যে হস্তীপ্রিয় বৎসরাজ উদয়ন হাতী ধরতে গিয়ে উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের হাতে বন্দী হন। তারপর বন্দী রাজার সঙ্গে রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রেম এবং কারাগার থেকে রাজার পলায়নের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত কাব্য। কিন্তু আজকের কৌশাম্বীকে দেখে কারও মনে বিন্দুমাত্র আশাও জাগবে না। শুধু তাই নয়, বোধহয় কৌশাম্বীর সন্তানদের অন্তর থেকেও পূর্বগৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু লুপ্ত হয়ে গেছে। বড় পাহাড় থেকে ডান দিকের চূড়াটিতে উঠলাম। এখানে উপরিভাগ সমতল। সেখানে ইটের তৈরি স্তূপের ভগ্নাবশেষ ছড়ানো রয়েছে। যমুনা নদী পাহাড়ের গা ঘেঁসে প্রবাহিত কিন্তু পাহাড় নীরস শুক্‌নো। অথচ আড়াই হাজার বছর আগে এখানেই এক বিরাট প্রাকৃতিক জলাশয় ছিল যার নাম ছিল দেবকট-সোবভ।

ফিরে এসেও শুনলাম আহার্য তৈরি হতে কিছু দেরী আছে। তাই গতরাত্রির

আশ্রয়স্থল সেই ভগ্নপ্রায় দেবালয়টির কাছে গেলাম। এখানে জানলাম, প্রভাস ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা পুকুরকে দেবকুণ্ড এবং তার চারপাশের দেবালয়গুলিকে আনন্দী মহারাণী এই সুন্দর নামে ভূষিত করেছে। শরীরের অনুপাতে বৃহৎ মস্তক, মাঝখানে কোনো জৈনধর্মের ধ্যানী মূর্তি আর নীচের দিকটা সম্পূর্ণ আলাদা কোনো মূর্তির খণ্ডাংশ এই ত্রয়ীর সহযোগে সম্পূর্ণ মূর্তিটি আনন্দীমাঈ নামে আবির্ভূতা। মন্দিরের তরুণ ব্রাহ্মণ পূজারীর পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানলাম সেও মলইয়া পাঁড়ে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম মলইয়া পাঁড়ে? (রাহুলজী নিজেও এই মলাইয়া পাঁড়ে বংশোদ্ভূত —অনুঃ)। পূজারী আমার কৌতূহলের নিরসন ঘটিয়ে জানাল যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে কৌলীন্যের উচ্চ মর্যাদালাভের আশায় সে কোনো ব্রাহ্মণ ঘটকের প্রলোভনে ভুলে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চিরকালের মতো এখানেই বাসা বেঁধেছে। যুবক পূজারীটি পথে চলতে চলতে আমার জৈন মন্দির দর্শন এবং জৈন তীর্থযাত্রীদের তৈরি রুটি খাওয়া নিয়ে একটু মন্তব্যও করল। তবে রক্ষা এই যে, সংকিসার মতো এখানে সরৌকা অর্থাৎ শ্রাবক উপাসক জৈনদের জল অচল ভাবা হয় না।

আন্তরিকতার সঙ্গে দেওয়া খাবার, তদুপরি চব্বিশ ঘণ্টার শ্রান্তি, এ সময় এই খাবার অমৃতের মতোই মনে হলো। খাবার পর কৌশাম্বীর পথে রওনা হলাম। সঙ্গী অতিথিবৎসল জৈন পরিবারটিও আমারই পথের যাত্রী, তবে তাঁরা জলপথে নৌকায় যাবেন। তাঁদের সঙ্গে ক'জন মহিলাও আছেন তবে তাঁরা পর্দানশীন। অপরিচিত পুরুষের সামনে বের হন না।

মাইল দুই চলার পর সিংহবল গ্রাম, তারপর পালি। পালিতে এখনও পুরানো ইটের ঘরবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, পালির কিছু আগেই কোসম্। কোসম্ নামটি স্পষ্টই মনে করিয়ে দেয় যে এটি কৌশাম্বী শব্দেরই অপভ্রংশ। ঘরবাড়ি অধিকাংশই মুসলিম আমলের ইটে তৈরি। এ থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, মুসলিম অধিকারে আসা মাত্রই কৌশাম্বী ধ্বংস হয়নি। কারণ সে রকম হলে সেই ধ্বংস স্তূপের ইট-কাঠ দিয়ে নতুন নগরী গড়ে উঠত। কোসম্ থেকে মাইল খানেক দূরে যমুনার তীরে প্রাচীন কৌশাম্বীর দুর্গ বা গড়ের অবশিষ্ট কিছু অংশ যা এখন গড়বা নামে পরিচিত। দূর থেকে দুর্গ প্রাকারকে এখনও ছোট-খাট পাহাড় বলে ভুল হয়। কাছেই একটি জৈনমন্দির। তার পাশে পদ্মপ্রভুর সুন্দর অথচ ভগ্ন একটি মূর্তি। জৈনমন্দিরের উত্তর দিকে একটু দূরে বিরাট এক অশোকস্তম্ভ। স্তম্ভটি কোন জায়গার খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য স্থাপিত হয়েছিল তা আজ বলা সম্ভব নয়। কারণ ঘোষিতারাম, বদরিকারাম (আরাম অর্থে উদ্যান —অনুঃ) প্রভৃতি বৌদ্ধসঙ্ঘ থেকে প্রতিষ্ঠিত তিনটি আরামই ছিল নগর থেকে দূরে। তবে মনে হয় এই স্তম্ভ সেই জায়গার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত যেখানে বুদ্ধ উপাসিকা, উদয়নমহিষী রাণী শ্যামাবতী তাঁর সপত্নী মাগন্দীর চক্রান্তে নিজ সখীজন পরিবৃতা হয়ে আগুনে

আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। রাণী শ্যামাবতী ছিলেন ভগবান বুদ্ধের আশি জন প্রধান শিষ্য-শিষ্যাদের অন্যতমা। আগুনে পোড়ার সময়ও রাণীর মুখে এতটুকু যন্ত্রণা বা ঘৃণার চিহ্ন ছিল না। রাণী শ্যামাবতী প্রাসাদেই অগ্নিপ্রবেশ করেছিলেন, অতএব অনুমান করা যায় স্তম্ভের আশপাশেই কোথাও রাজা উদয়নের প্রাসাদের অবস্থান ছিল।

কনৌজের মতো এখানেও জনৈক ভদ্রলোক আমাকে শাহ্ সাহেব সম্বোধন করলেন। সন্ধ্যেবেলা সরাইখানাতেও সেই অবস্থা। এখানে আবার সালাম আলেকুম-এর পালা চলল। অবশেষে সরাইখানা ছেড়ে মন্দির দালানেই শোবার ব্যবস্থা করলাম। কারণ এ জায়গাটা পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সরাইখানার চেয়ে বহুগুণে ভালো। আরতির পর মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করে শুয়ে পড়তে দেখে, মন্দিরের সেবায়েত পূজারী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখলাম। তাই নানাবিধ কটু বাক্যের সঙ্গে আমাকে নাস্তিকও বলে ফেললেন। আমার অবশ্য এতে কোনো কিছু যায় আসে না। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ রাতটি এমনি করেই আকিলের সরাইয়ে কেটে গেলো।

১লা জানুয়ারী ১৯২৯, ভোর বেলাতেই বাসে মনৌরী গিয়ে সেখান থেকে এলাহাবাদ রওনা হলাম। বাসে সহযাত্রী এক সরকারী কর্মচারী, যিনি নিজে হিন্দু, আমাকে মুসলমান ভেবে সেভাবেই কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য দেখা দিলো যে, অনেকেই আমাকে মুসলমান ভেবে নিচ্ছে। একমাত্র চুল খানিকটা লম্বা হয়েছে। কুড়ি পঁচিশ দিনে যতটা হয় আর কি। অবশ্য এই ভদ্রলোকেরা তো আর জানেন না যে, আমি ঈশ্বর এবং খোদা এই দুইয়ের থেকেই সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করছি।

সারনাথ

এলাহবাদে আমার নির্দিষ্ট কোনো কাজ ছিল না। বন্ধুবান্ধব কেউ থাকলেও না হয় ডাল-রুটির ব্যবস্থা হতো। তবে হোটেলের যুগে ওটা কোনো সমস্যাই নয়। সুতরাং এলাহাবাদ থেকে বারাণসীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ছোট লাইনের গাড়ীতে বারাণসী পৌঁছে তখনই আবার সারনাথের পথে বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছে শুনি, ভিক্ষু শ্রীনিবাস ঘুমোচ্ছেন। আমার আসার খবর তাঁকে ঘুম ভাঙ্গিয়েই দেওয়া হলো, বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ আমার আহার ও বিশ্রামের যথোচিত ব্যবস্থাও হয়ে গেলো।

কাশীতে আমার টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত অভিধর্মকোষ ছাপাবার এবং তার বিনিময়ে তিব্বত যাত্রার পাথেয় জোগাড়ের পরিকল্পনা ছিল। (অভিধর্মকোষ পেশোয়ার তথা পুরুষপুরের কুষান বংশের রাজত্বের আমলে বিখ্যাত বৌদ্ধ

দার্শনিক বসুবন্ধুর প্রাচীন রচনা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এটিকে সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে পুনঃ প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন —অনুঃ)। দুর্ভাগ্যবশত পাণ্ডুলিপি এখন সঙ্গে নেই। আপাতত এ ব্যাপারে কোনো চেষ্টা নিরর্থক জেনে, ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান ঋষিপতন দেখতে গেলাম। সারনাথ বারাণসীই বৌদ্ধসাহিত্যে ঋষিপতন নামে পরিচিত। এই দুই স্থানই বৌদ্ধ ধর্মের জয়যাত্রার শুভারম্ভের সাক্ষী। এখন আর কিই বা আছে? তবু মনে হলো বর্তমানে এই দুই জায়গার কিঞ্চিৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

১৮ই মার্চ এ বারের শিবরাত্রি পড়েছে। অর্থাৎ হাতে এখনও দু'মাস সময়। কয়েক দিন ছাপরায় বিশ্রাম নিয়ে তারপর পাটনা-বক্তিয়ারপুর শাখা লাইনে রাজগিরিতে গিয়ে পৌছালাম। ওখানকার বাবা কৌণ্ডিন্যের ধর্মশালা তো আমার প্রায় ঘরবাড়ি বললেই হয়, অতএব ভাবনার কিছুই নেই। সে দিনই বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত বেণুবন, সপ্তপর্ণী গুহা, পিপ্পলী গুহা, বৈভার পাহাড় ইত্যাদি জায়গাগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। তখনও অবশ্য ভাবতে পারিনি যে, ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সমূহের এমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। যে বেণুবন বুদ্ধদেবের সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য পাওয়া সর্বপ্রথম আরাম ('আরাম' অর্থ: সংঘ স্থাপনের জন্য বড় বড় নগরে এ রকম উদ্যান দান স্বরূপ দেওয়া হতো) যেখানে বুদ্ধদেব স্বয়ং বহুবার এসে বাস করেছেন, জনসাধারণের কাছে তাঁর অমৃতবাণী বিতরণ করেছেন আজ তাকে খুঁজে পাওয়াই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বেণুবনের পাশেই নদী, নদীতীরের আশ্রমের মোহন্তজীর সঙ্গে আগেই কিছু পরিচয় ছিল, ভাবলাম এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য নেব, কিন্তু আশ্রমে খোঁজ নিয়ে শুনলাম, তিনি আর এই পৃথিবীতে নেই। একাই বৈভার পাহাড়ের চারদিকে সপ্তপর্ণী গুহার খোঁজ করলাম। নামবার পথে পিপ্পলী গুহা চোখে পড়ল। কোনো রকম কিছু মসলা ব্যবহার না করে, শুধুমাত্র পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে এই গুহা তৈরি হয়েছে। বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ এখানে অনেক দিন কাটিয়েছেন। আরও নীচে তপোদা, সপ্তঋষির তপ্তকুণ্ড দেখে আশ্রয়ে ফিরলাম। গৃধকূট পাহাড় দেখা পরের দিনের জন্য স্থগিত রইল।

পরদিন সৌভাগ্যবশত স্বামী প্রেমানন্দজীকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেলাম। সঙ্গে স্বামীজীর তৈরি পরটা তরকারী আছে, অতএব আহার্যের ব্যাপারে কোনো ভাবনা নেই উপরন্তু কৌণ্ডিন্য দেবের আশ্রমের একজনকে পথ প্রদর্শক হিসেবেও পেয়ে গেলাম। গৃধকূটের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। এই পথের পাশেই ছিল পুরানো রাজগৃহ। চলতে চলতে গিয়ে পৌছালাম সুমাগধা নদীর শুষ্কপ্রায় ঘাটে। অথচ এই সুমাগধা নদীই রাজধানী রাজগৃহ এবং তার চারপাশের অঞ্চলকে পরিতৃপ্ত রাখত। একদিন যে অঞ্চল লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল আজ তা গভীর অরণ্যে নির্বাসিত। তবু যে পথে রাজা বিম্বিসার

প্রতিদিন বুদ্ধদেবকে দর্শন করতে যেতেন, সে পথের কিছু নিদর্শন এখনও বর্তমান। গৃধকূটে স্মৃতিচিহ্ন বলতে বিশেষ কিছুই আর নেই কেবলমাত্র পাথরে বাঁধানো চত্বরটি আজও অটুট রয়েছে। এই চত্বরে বসে বুদ্ধদেব বিশ্রাম নিতেন। রাজগৃহের রাজপ্রাসাদ থেকে এ জায়গাটিকে দেখা যেত। শেষ জীবনে নিজ পুত্রের হাতে বন্দী রাজা বিম্বিসার, বন্দীত্বের যন্ত্রণা ভুলে চেয়ে থাকতেন এই চত্বরের দিকে, পীতবসন পরিহিত ভগবান বুদ্ধকে দেখতে পাওয়াটাই ছিল তখন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো সবই যেন সে দিনের ঘটনা, হাজার বছর যেন কয়েক নিমেষ মাত্র। এই চত্বরে বসেই আমরা আমাদের আহার্যের সদ্ব্যবহার করলাম। দুপুরে আবার কৌণ্ডিন্য বাবার আশ্রমে ফিরে বিশ্রাম।

ঐ দিনই বিকেলে অর্থাৎ ১৩ই জানুয়ারী চলে গেলাম সিলাব গ্রামে। যার সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়ে গিয়েছিলাম তার দেখা পেলাম না। তবে মৌখারিদের গন্ধশালী ধানের চিড়ে দিয়ে তৈরি খাজাকে অবহেলা করতে পারলাম না। (মধ্যদেশে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর মৌখারী বংশের প্রসার ঘটে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বিবাহ এই মৌখারী বংশেই হয়েছিল। এদেরই এক শাখা অধুনা বিহারে রাজত্ব করত। সিলাব গ্রামে এখনও কয়েকটি পরিবার আছে যারা 'মোহরী' নামে পরিচিত। মোহরী শব্দটি এসেছে মৌখারী শব্দ থেকে)। সিলাব গ্রাম ব্রহ্মজাল সূত্রের উপদেশ স্থান অথবা বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপের প্রব্রজ্যা স্থান। এখানে বাবু ভগবানদাস মোহরীর বাড়ির সীমানার মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর একটা শিলালিপি দেখলাম। পরের দিন ওটির নকল করতে প্রায় দুটো বেজে গেলো। ঐ দিন বিকেলে নালন্দা রওনা হলাম।

দু'বছর বাদে আবার এলাম নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। নালন্দা আমার স্বপ্ন, আমার প্রেরণা। এখানকার কৃতবিদ্য মনীষী পণ্ডিতদের চরণ-স্পর্শে পবিত্র হয়েছিল যে পথ, আমাকেও সেই পথেই তিব্বত যাত্রা করতে হবে। ইচ্ছে আছে, ভবিষ্যতে যদি কখনও সময় এবং সুযোগ আসে এখানে একটি আশ্রম তৈরি করব। সে জন্য এখনই কিছু জমির বন্দোবস্ত করে রাখব এমনও একবার ভেবেছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে সে চিন্তা বাদ দিতে হলো। তাই এ বারের মতো ভেতরে এবং বাইরে ঘোরা শেষ করে, স্তূপ থেকে পাওয়া মূর্তি, মুদ্রা, তৈজসপত্রাদি, বিহারের ভেতরের কুঠরি সমূহ, কূয়া ইত্যাদি দেখেই মনকে তৃপ্ত করলাম।

ইতিমধ্যে আমার অভিধর্মকোষের পার্সেলটি পৌঁছানোর খবর পেলাম। আমার তিব্বত যাবার পাথেয় সংগ্রহের প্রধান ভরসাই এটি। অতএব ১৩ তারিখে পাটনা হয়ে বারাণসী পৌঁছালাম। উঠলাম গিয়ে ওখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রকাশক মহাশয় স্বয়ং পাণ্ডুলিপি দেখলেন তারপর অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে গেলেন। তাঁরা আবার এটিকে মূল ফরাসী বইয়ের সঙ্গে

মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। (ল্যুই দ্য বালী পুসীং নামে একজন বেলজিয়ান পণ্ডিত ফরাসী ভাষায় অভিধর্মকোষের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সেটিরই নাগরী অনুবাদ এবং সম্পাদনা করেছিলেন—অনুঃ)। ১৮ তারিখে সারনাথ গিয়ে চীনা বৌদ্ধভিক্ষু বোধিধর্মের চিঠি পেলাম। দু'বছর আগে রাজগৃহের জঙ্গলে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিংহলের বিদ্যালঙ্কার বিহার যেখানে আমার আস্তানা ছিল, উনি সেখানেও কিছুদিন বাস করেছিলেন। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির জন্য কেউ কেউ তাঁকে পাগলও বলত। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে কেউ ভাবতেই পারত না যে ওই শীর্ণ, মলিন পোশাকের নতশির মানুষটি কতটা জ্ঞান ও সংস্কৃতির অধিকারী। সিংহল থেকে ফিরে উনি আমার অনুরোধে নেপাল যাত্রার বিষয়ে বিশদ লিখে জানিয়েছিলেন। উনি শুধু বৌদ্ধ দর্শনে পণ্ডিতই ছিলেন না, নিজের জীবনে সেই দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োগেও সচেষ্ট থাকতেন। আমার দুর্ভাগ্য যে এটিই ছিল তাঁর শেষ পত্র।

২০শে জানুয়ারী পণ্ডিতবর্গের রায় বের হলো। রায় আমার অনুকূলেই গেছে। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল। পরদিন প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে, তিনি বর্তমানে আমাকে পাঁচ-দশ টাকার বেশী দিতে পারবেন না। এ দিকে আমার তিব্বত যাত্রার জন্য অর্থের আশু প্রয়োজন, তাই প্রকাশকের কথায় রাজী হতে পারলাম না। এভাবে আট-ন' দিনের কাশী বাস প্রায় নিষ্ফল হতো যদি না পাণ্ডুলিপিটি আচার্য নরেন্দ্রদেবের দেখা থাকত। উনি কাশী বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে ওটিকে প্রকাশ করতে চাইলেন। ২২ তারিখে বিদ্যাপীঠের অনুমতিও পাওয়া গেলো, সেই সঙ্গে একশো টাকা আগাম পাবার প্রতিশ্রুতি পেলাম।

বৈশালী-লুম্বিনী

কাশী বিদ্যাপীঠ আমায় পাথেয় যোগাড় করার ভাবনা থেকে ছুটি দিলো, অতএব নিশ্চিন্ত মনে পাটনা ফিরে গেলাম। সেখান থেকে বুদ্ধগয়া। ওখানে মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধভিক্ষু লোব-সঙ-শের-রবের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি ভোটীয়া (তিব্বতী) ভাষার দু'একটি বই পড়েছিলাম, তাই কয়েকটি শব্দ বলতেও পারতাম। পরিচয় হবার পর উনি পরম সমাদরে নিজে হাতে তৈরি করে চা খাওয়ালেন। উনি আমাকে ওঁর লাসার ডে-পুঙ মঠে বাস করার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কথায় কথায় জানলাম বুদ্ধগয়াতে ওঁর আরও কয়েকমাস থাকার বাসনা আছে, কারণ মহাবোধিকে লক্ষ বার দণ্ডবতের সংকল্প করেছেন। বুদ্ধগয়া থেকে লিচ্ছবীদের রাজধানী বৈশালী যাবার ইচ্ছে ছিল। (প্রাচীন মিথিলাতে লিচ্ছবী নামে এক প্রসিদ্ধ জাতি বাস করত, তাদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল

এর রাজধানী বৈশালী বর্তমান মুজফ্ফরপুরের কাছাকাছি কোথাও ছিল)। মুজফ্ফরপুরে নেমে শুনলাম বাসে বখরা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। সেখান থেকে বৈশালীর দূরত্ব সামান্য। জনকবাবু (মুজফ্ফরপুরের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা বাবু জনকধারী প্রসাদ) বৌদ্ধধর্মের ওপর এক আলোচনা সভায় ভাষণ দেবার অনুরোধ করে দিন ঠিক করে রেখেছিলেন। পথে বখরার অশোকস্তম্ভটিকে দেখা হয়ে গেলো। এখানেই একদা মহাবলের কূটাগার ছিল। তথাগত এখানে বহুবার এসেছেন। বৌদ্ধধর্মের নানা সূত্রের রচনাস্থানও এই জায়গা। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের একশো বছর পর ভিক্ষু আনন্দের শিষ্য স্থবির সর্বকামীর নেতৃত্বে এখানে বৌদ্ধধর্মের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজ এ জায়গার এমনই দুরবস্থা যে নির্দিষ্ট করে কোনো স্থানই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বখরা থেকে এলাম বানিয়া। বৈশালী আজকাল বানিয়া-বসাঢ় নামেই বেশী পরিচিত। বসাঢ়ই আসল বৈশালী যা একদা বজ্জিদের রাজধানী ছিল। বজ্জি লিচ্ছবীদেরই আর এক নাম। বানিয়া ছিল বৈশালীর বাণিজ্যিক এলাকা। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের একজন গৃহী-শিষ্য আনন্দ এখানে বাস করতেন। ভগবান বুদ্ধের এগার জন প্রধান গৃহী-শিষ্যের একজন, উগ্রগৃহপতিও ছিলেন এ অঞ্চলের অধিবাসী। বজ্জিদের শক্তিশালী গণপ্রজাতন্ত্রের রাজধানীর এই বাণিজ্যিক এলাকাটি সেকালে সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈনদের বহু গ্রন্থে এর অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও আজ এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা হয়ে গিয়েছিল অতএব স্থানীয় এক গৃহস্থের কাছ থেকে আতিথেয়তার আহ্বান পেয়ে বেঁচে গেলাম বলা যায়।

বানিয়া-বসাঢ়ের আশপাশে এখনও মাটি খুঁড়লে হঠাৎ ছোট ছোট মাটি-বাঁধানো কুয়ার পাড় বেরিয়ে পড়ে জায়গার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়। বানিয়া-বসাঢ় ছেড়ে বসাঢ়ে এলাম। পুকুরের ধারে মন্দির। মন্দিরে অধিষ্ঠিত বৌদ্ধ ও জৈনদের নানা মূর্তি এখন হিন্দুধর্মের দেবদেবী রূপে দিব্যি পুজো পাচ্ছে। গড়, গ্রাম সবই দেখা হলো। এখানেই বজ্জিদের সংস্থাগার ভবন (সংসদ ভবন) ছিল। এই সংসদ ভবনে সে সময় ৭৭০৭ জন রাজা উপাধিধারী লিচ্ছবী প্রধান একত্রে বসে মগধ এবং কোশলের সম্রাটদের হৃদয় প্রকম্পিতকারী সাতটি অপরিহানি নিয়মে বাঁধা বিশাল লিচ্ছবী গণপ্রজাতন্ত্রকে পরিচালনা করতেন। (মগধ সম্রাট অজাতশত্রু একবার লিচ্ছবী দেশ জয় করার বাসনায় বুদ্ধদেবের পরামর্শ চাইলেন। উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন (১) লিচ্ছবীরা যতদিন নিজেদের সংসদে বারবার জমায়েৎ হয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে (২) যতদিন প্রতিটি কাজই একতাবদ্ধ হয়ে করবে (৩) যতদিন তারা বিনা নিয়মে কোনো কিছুই করবে না, এবং নিজেদের তৈরি নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে (৪) যতদিন তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবে, তাদের অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে, তাদের উচিত কথা মেনে চলবে

(৫) যতদিন তারা নিজেদের কুলবধূ ও কুমারীদের ওপর কোনো বিষয়ে জোর জবরদস্তি করবে না (৬) যতদিন এরা বজ্জি চৈত্যকে (রাষ্ট্রীয় মন্দির) সম্মান করবে এবং (৭) যতদিন তারা পণ্ডিতদের সেবা ও সম্মান করবে—ততদিন তারা থাকবে অপরাজেয়, তাদের বিপক্ষে শত্রু-সেনা যতই বেশী হোক না কেন। বুদ্ধদেবের এই অপরিহানি নিয়মই ছিল লিচ্ছবী গণতন্ত্রের ভিত্তি)। বসাঢ় এবং তার আশপাশে জথরিয়া (ভূমিহার) সম্প্রদায়ের বাসই বেশী। আজকাল অবশ্য এরা সকলেই নিজেদের ষোল আনা ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। যদিও ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষুকের জাতি এবং এই জাতির সৃষ্টি না হওয়াই ছিল মঙ্গলের, এমন মত পোষণ করতেন জৈনধর্মের স্রষ্টা বর্দ্ধমান মহাবীর। তাঁর জন্মও হয়েছিল জথরিয়া বংশে। (জথরিয়া শব্দের উদ্ভব জগতি [জ্ঞাতি পুত্র] থেকে। এরা ছিল লিচ্ছবীদের জগতি। এখনকার জথরিয়াদের উচিত ছিল বীর লিচ্ছবী বংশের বংশধর বলে গর্ব বোধ করা)। আমি বসাঢ়ের এক বৃদ্ধ জথরিয়াকে যখন বললাম—'আপনারা তো ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয়।' বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিমসার থেকে আসা এবং ছাপরা জেলায় জোথরভিংহ গ্রামে বাস করা নিজ ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষদের কাহিনী শুনিয়ে দিলেন। আমার অবাক লাগল এই দেখে যে বর্তমানের জথরিয়ারা প্রাচীন সমৃদ্ধশালী স্বাধীন বীর জাতির উত্তরাধিকার বহন করাটাকে অগৌরবের মনে করে বরং তার চেয়ে তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে এক ধনসম্পদহীন কূপমণ্ডুক আত্মাভিমানী সম্প্রদায়ের একজন হওয়াকে বেশী সমাদরের মনে করে, এ জন্যই বোধ হয় প্রচলিত প্রবাদ আছে:

সব জাতসে বুর্বক জথরিয়া
মারে লাঠি ছিনে চাদরিয়া

আর কার কথাই বা বলব। এই যে সুশিক্ষিত এবং প্রচণ্ড দেশভক্ত মৌলানা শফীউল্লা তিনিই কি তাঁর জথরিয়া বংশের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা জানেন। (শহীদ ক্ষুদিরামের বোমার মামলায় মৌলানা শফী দাউদি বৃটিশ পক্ষের উকিল ছিলেন। পরে ১৯২৭ সালে তিনি ওকালতি ছেড়ে দেশপ্রেমিক সাজেন, বর্তমানে আবার মুসলমানদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে খুবই সোচ্চার। ইনিও আদতে কিন্তু জথরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত)

বৈশালী থেকে মুজফ্‌ফরপুর ফিরে এলাম এবং জনকবাবুর সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতির দায় থেকে মুক্ত হলাম। তারপর দেবরিয়ার টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বসলাম। ১৪ই ফেব্রুয়ারী আবার তিন বছর পর কুশীনারায় এলাম। দশ বছর আগেও একবার এ সব অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। তখন একবার একজন সরল গ্রাম্য-গৃহস্থ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কিহে, বর্মা দেশের দেবতার সুবাস পেয়ে এসেছ! আমাদের দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিক অথচ বিস্মৃত জায়গাগুলোর মতো কুশীনারারও অবস্থা শোচনীয়। অথচ এই স্থান বুদ্ধদেবের পবিত্র স্পর্শে ধন্য। এখনও এখানে সে যুগের মহাপরিনির্বাণ স্তূপ দেখতে পেলাম। সিপাহী যুদ্ধের কিংবদন্তী

পুরুষ বাবু কুয়ঁর সিংহের সম্বন্ধী স্থবির মহাবীর একটা উপকার অবশ্য করেছেন। তিনি বুদ্ধদেবের অন্তিম লীলার সাক্ষী এই জায়গাতে আশ্রম এবং মন্দির স্থাপন করেছেন যেখানে স্থানীয় জনসাধারণ না জেনেও রোজ শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তত ফুলমালা চড়ায়। (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বাবু কুয়ঁর সিংহের নাম সর্বজনবিদিত। তাঁরই এক সম্বন্ধী ইংরেজের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বর্মা চলে যান। ওখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে কুশীনারায় এসে বাস করতে থাকেন। এ সময় তাঁর পূর্বপরিচয় খুব কম লোকেরই জানা ছিল। তবে এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না)।

এখানে বসে বসে মনে হচ্ছিল যে, আজ থেকে ২৪১২ বছর আগে এই জায়গাতেই যুগল শালবৃক্ষের মাঝখানে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রত্যূষে উত্তরে শির, পশ্চিমে মুখ রেখে শায়িত অবস্থায় হাজার হাজার অশ্রুসজল মুখের সামনে 'যা কিছু সৃষ্টি হয় সবই নশ্বর' এই অমোঘ উক্তির মধ্য দিয়ে ভগবান তথাগত চিরদিনের জন্য অস্তগামী হয়েছিলেন।

কুশীনারায় দু'চার দিন বিশ্রাম করলাম। তারপর ওখান থেকে বিহার-নেপাল সীমান্তের কাছে গোরখপুরে এলাম। সেখান থেকে সন্ধ্যার গাড়ীতে নৌতনবা এলাম। এখান থেকে লুম্বিনী (কপিলাবস্তুর কাছে এক উদ্যান যেখানে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল) মাইল দশেক দূর মাত্র। টাট্টুতে চেপে যাওয়া যায়। কিন্তু আমার মতো যাকে আর কয়েকদিন পরেই কয়েকশো মাইল পথ হাঁটতে হবে, ভাঙতে হবে হিমালয়ের দুর্গমতম চড়াই-উৎরাই তার কাছে সামান্য পাঁচ-ক্রোশ পথ হাঁটা এমন আর কি। ভোর হতেই দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে পথের হদিশ জিজ্ঞেস করতে করতে চলতে শুরু করলাম। পথে শাক্য এবং কোলীয়দের সীমানার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত রোহিনী নদী-সহ আরও কয়েকটি নদী-নালা পার হয়ে পৌঁছালাম সিদ্ধার্থের জন্মস্থান। (সিদ্ধার্থ ছিলেন শাক্য-বংশীয় কিন্তু তাঁর মা মায়া দেবী ছিলেন প্রতিবেশী কোলীয় বংশের মেয়ে)। দশ বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখনকার সময় থেকে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। এখন এখানে একটা ছোট-খাট ধর্মশালা তৈরি হয়েছে। কুয়া এবং মন্দিরের সংস্কারের কাজ চলছে। কাঁকরহবা পর্যন্ত পরিকল্পিত রাস্তার অধিকাংশই সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজার (নেপালের রাজা) ইচ্ছে ছিল রুম্মিনদেই গ্রামটিকে আবার তার স্বকীয় মহিমায় ফিরিয়ে আনার অর্থাৎ লুম্বিনী উদ্যানের পুনরুদ্ধার করবেন, কিন্তু ওই সদিচ্ছা মনের মধ্যে নিয়েই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তবে তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে মনে হলো।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের মনোবাসনা হলো এই পুণ্যস্থান দর্শন। ২৪৯১ বছর আগে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে কুমার সিদ্ধার্থ পৃথিবীতে

আবির্ভূত হয়েছিলেন। ২১৮২ বছর আগে সম্রাট অশোক এখানে এসে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। যেখানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে একটা ছোট, নীচু ঘরে জননী মহামায়ার প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া মূর্তি আজও বর্তমান। মূর্তির ডান হাতে শালগাছের ডাল এবং দণ্ডায়মান ভঙ্গিমা। কুশীনারায় মহাস্থবিরের অনুরোধ মতো তাঁরই দেওয়া ধূপকাঠি এবং মোমবাতি জ্বেলে দিলাম ওই মূর্তির সামনে, ওই কুঠরিতেই রাতটা কাটিয়ে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু পুরোহিত বারন করলেন। বললেন আজকাল এ সব অঞ্চলে বড় বেশী চোরের উপদ্রব। সামান্য সংস্থান, তাও পাছে খোয়া যায় এই ভয়ে পুরোহিতের কথাই মেনে নেওয়া স্থির করলাম। বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছি, এমন সময় খুনগাঁই গ্রামের চৌধুরীদের ছেলে এসে আমাকে তাদের বাড়িতে আহার ও বিশ্রাম নেবার আহ্বান জানাল। পরে অবশ্য জেনেছি যে, লুম্বিনী যাত্রীদের জন্য চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ির দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। এমন কি যারা অহিন্দু তাদের জন্যও চীনামাটির বাসনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। রাত্রিতে আহারের প্রয়োজন ছিল না —প্রয়োজন ছিল শুধু বিশ্রামের। তাই চৌধুরী বাড়ির চীনামাটির বাসনপত্র আমার দ্বারা অব্যবহৃতই থেকে গেলো। পরদিন চৌধুরী মশাই গাড়ী করে নৌগড় রোড ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন। তাঁর সহৃদয়তার কথা ভোলা অসম্ভব। খুনগাঁই থেকে কঁকরহবা তিন-চার মাইল মাত্র এবং এখান থেকে নেপাল সীমান্ত খুব কাছে। এখন নৌগড় রোড থেকে এ পর্যন্ত মোটর অথবা গোরুর গাড়ীতেও আসা যায়। তবে কিছু দিনের মধ্যেই লুম্বিনী পর্যন্ত রাস্তা পাকা হয়ে গেলে যাত্রীদের আর কোনো ভাবনা থাকবে না। নৌগড় রোড থেকে সরাসরি মোটর গাড়ীতেই লুম্বিনী চলে আসা যাবে। রাত্রিতে ষ্টেশনে পৌঁছালাম। এ বার যেতে হবে প্রাচীন কালের কোশল রাজ্যের রাজধানী ঐতিহাসিক শ্রাবস্তীতে। সেখানে জেতবন দেখবার বাসনা আছে। ষ্টেশনে এসে শুনলাম রাত্রিতে আর কোনো গাড়ী নেই। কাছেই একটা হালুইকরের দোকানে খাবারের খোঁজে গেলাম, হালুইকর একজন খরিদ্দার পেয়ে পুরী তৈরির যোগাড় করতে লাগল। এ সময় রমজানের মাস চলছে। খানিক পরেই একজন মুসলমান ভদ্রলোক, বোধহয় হালুইকরের প্রতিবেশীই হবে, দোকানের বেঞ্চে এসে বসল। হালুইকর হাতের কাজ বন্ধ রেখে তাকে পান খাইয়ে জিজ্ঞেস করল —খাঁ-সাহেব, রোজায় খুব কষ্ট হচ্ছে না?

—না ভাই, তেমন কিছু নয়। এ বারের রোজা শীতকালে থাকায় অনেকটা বাঁচোয়া। একেই তো দিন ছোট তার ওপর রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া ভালোই হয়। কিন্তু গরমের দিনে রমজানের মাস হলে ভারি কষ্ট।

এরপর তাদের মধ্যে নানা আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। হালুইকর তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল। আমি এদের

কথোপকথন শুনছিলাম আর ভাবছিলাম যে, কোন শত্রু, এদের দু'জনের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেয়? এই বিশাল দেশে এই দুই সম্প্রদায় তাদের নিজেদের আচার-আচরণ বজায় রেখে, হাত পা ছড়িয়ে সুপ্রতিবেশী হয়ে বাস করতে পারে। এখানে বাধা যে কোথায় তা আমি বুঝতে অপারগ। এর উত্তরে কেউ যদি বলেন ধর্ম, তবে আমি বলি ধিক্ সেই ধর্মকে যা বন্ধুকে পরিণত করে শত্রুতে।

ভারত থেকে বিদায়

১৯শে ফেব্রুয়ারী নৌগড় থেকে বলরাম গিয়ে পৌঁছালাম। ভিক্ষু আসয়ার ধর্মশালা উন্মুক্তই ছিল। ভিক্ষু আসয়া বর্মার এক ধনী পরিবারের সন্তান। বছর দশেক আগে যখন এখানে এসেছিলাম, তখন বর-সম্বোধি নামে অন্য একজন ভিক্ষুর উদ্যোগে এই ধর্মশালা তৈরি হচ্ছিল। এখন এখানে বিশ্রাম ও আহারের জায়গা ছাড়াও কূয়া, মন্দির এবং ছোট একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী আয়ুষ্মান আনন্দকে চিঠি লিখলাম। বিষয় এখানকার জেতবন দর্শন। লিখলাম —"গতকাল সকালে আড়াই ঘণ্টা পায়ে হেঁটে এখানে পৌঁছেছি। আশ্রয় নিয়েছি মহিন্দবাবার কুঠিতে। উনি অবশ্য এখন এখানে নেই, শুনলাম বিশেষ প্রয়োজনে বর্মা গিয়েছেন। আসবার সময় ধম্মস্কোডিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যাই হোক আমাকে হাঁটার অভ্যাস আরও বাড়াতে হবে, কারণ আসন্ন যাত্রাপথের অধিকাংশটাই, এমন কি সারা পথটাই হাঁটতে হতে পারে। গতকালই বেলা থাকতে থাকতে জেতবন, গন্ধকুঠি, কোসম্বকুঠি, কাবেরীকুঠি, সললাগার ইত্যাদি দেখা শেষ করেছি। এগুলোর প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল, সে বিষয়ে এখন আমার বিশেষ আর কোনো সন্দেহ নেই। এখানে গন্ধকুঠির সামনের নীচু জায়গাটাই যে জেতবন-পোকখরণী (জেতবন-পুষ্করিণী) সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মহিন্দবাবার কুঠিটির অবস্থান, ফাহিয়েনের বর্ণিত তৈর্থির মন্দিরের ভিত্তির ওপর।

"বিকেলে শ্রাবস্তী গেলাম। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরেও সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলোকে শেষ করা সম্ভব হয়নি। শ্রাবস্তীর পূর্ব দিকের দ্বারটি বর্তমান গঙ্গাপুর দরওয়াজা বা বড়কা দরওয়াজার জায়গাটিতেই ছিল বলে অনুমান, কিন্তু কাছাকাছি পূর্বারামের কোনো চিহ্নই পেলাম না। তাই মনে হচ্ছে বর্তমান হনুমানবাঁই হয়ত পূর্বারামের ধ্বংসাবশেষ।

"এ বার গোড়া-বাহরাইচ অঞ্চল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে, পুকুরগুলো শুকিয়ে মাঠ হয়ে গিয়েছে, বর্ষাকালীন ফসল কিছুই বলতে গেলে হয়নি। রবিশস্যের চাষও জলের অভাবে মার খেয়েছে। আগামী বর্ষা পর্যন্ত খুব কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে এখানকার অধিবাসীদের চলতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ

মানুষ এখন অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। যদিও সরকারী খয়রাতি সাহায্যে রাস্তা ইত্যাদি তৈরি শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। রিলীফের কাজে পুরুষদের মজুরী দৈনিক দশ পয়সা এবং স্ত্রীলোক ও অন্যান্যদের দু'আনা। আর তার জন্যেও দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসছে নিরুপায় হয়ে। এ দিকে এখন এক সের ভুট্টার দানার দাম চার আনা। লুম্বিনী কিম্বা তার আশপাশের অঞ্চলে কিন্তু এ রকম কষ্টকর জীবনযাত্রা দেখতে পাইনি।

"এরপর চম্পারণ থেকে চিঠি লিখব। নেপাল পর্যন্ত যাত্রাপথে দু'একজন সঙ্গী সাথী জোটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তাদের মারফৎ চিঠিও পাঠাতে পারব। তাতেই আমার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির মোটামুটি একটা ছক থাকবে আশা করি। নেপাল পর্যন্ত যাবার পর আমার হাতে যা টাকা পয়সা থাকবে তার পরিমাণ দেড়শোর বেশী হবে না। যাত্রার জন্যে সঙ্গে নিয়েছি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের চল্লিশটি পাতা এবং কুশীনারার কুশ। আজ অন্ধবন দেখাটা শেষ করব।"

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে চম্পারণ রওনা হলাম। গোরখপুরে গাড়ী বদলে ছিবৌণী ঘাট পৌছালাম বেলা দশটায়। গণ্ডক নদীর সেতু ভেঙে যাবার ফলে বালির চড়ায় অনেকটা হাঁটতে হলো। পশুপতিনাথের যাত্রীদের অনেককে দেখলাম নৌকা করে যেতে। হিসেব মতো শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথ যাত্রার এখনও আট-দশ দিন বাকী। নরকাটিয়াগঞ্জের কাছে বিপিনবাবু নামে এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাস। গেলাম তাঁর কাছে। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না তবে তাঁর ছোট ভাই ছিলেন, তাই আশ্রয় পেতে অসুবিধা হলো না। কত সহজেই একজন গৃহছাড়া মানুষ গৃহের আশ্রয় পেয়ে গেলো। এখন ভাবনায় পড়লাম যে, যাত্রা শুরু করতে তো আরও আট দিন বাকী কিন্তু এই ক'টা দিন কাটাই কিভাবে। অবশেষে যেভাবে দিন ক'টা কাটালাম, তার বিবরণ আনন্দকে লেখা চিঠির মধ্যে দিলাম।

"বলরামপুর থেকে আগের চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এখানে আসা উচিত ছিল ৩রা মার্চ কিন্তু এসে পড়েছি ২৩শে ফেব্রুয়ারী। অতএব সময় যে কিভাবে কাটছে তা সহজেই অনুমেয়। পিপরিয়া গ্রামের কাছে রামপুরায় গিয়েছিলাম। সেখানে কাছেই দুটো অশোকস্তম্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে যার একটিতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে একটি বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে, অনুমান করা হয় ওটি ওই স্তম্ভ দুটির একটির ওপরে ছিল। আর একটির ওপরে যে কি ছিল তা এখনও জানা যায়নি। তবে স্থানীয় লোকের বক্তব্য যে, তারা বংশ পরম্পরায় শুনে আসছে আর একটির ওপরে ময়ূর ছিল। ময়ূর ছিল মৌর্যদের রাজচিহ্ন, কাছের গ্রামটির নাম পিপরিয়া গ্রাম। তবে কি মৌর্য প্রজাতন্ত্রের পিপ্পলীবনই এই পিপরিয়া গ্রাম? এখানকার অধিবাসীরা তখন বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। কুশীনারায় বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর

পিপ্পলীবনের মৌর্যরা তাঁর চিতাভস্ম পেয়েছিলেন। তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনেক পরে পৌছানোর ফলে অস্থি বা পুষ্প পাননি। এখানে এক জায়গায় দুটি অশোকস্তম্ভের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বোধহয় নিজের বুদ্ধভক্ত পূর্বপুরুষদের আদি বাসভূমিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখার মানসে সম্রাট অশোক স্তম্ভ দুটি স্থাপন করেছিলেন।

"পিপ্পলীবনের মতো ছোট একটা গণরাজ্যের রাজধানী নিশ্চয়ই কোনো বড় জায়গাতে ছিল না। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে এ অঞ্চল মনে হয় মগধ রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি ছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এক ছোট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজ খুঁজে না পাবারই কথা, বিশেষত সেই যুগের যখন অধিকাংশ বাড়ি ঘরই নির্মিত হতো কাঠ দিয়ে। মনে হয় সমস্ত কিছুই এখন বিশ-বাইশ ফুট মাটির নীচে জলের স্তরের সমতলে রয়েছে। রামপুরা থেকে সাত-আট মাইল দূরে ঠোরীতে একদিন গিয়েছিলাম। ঠোরীর অবস্থান নেপালের মধ্যে। এখান থেকেও অন্য আর একটি পথে তিব্বত যাওয়া যায়। ঠোরীর কাছেও একটা প্রাক্‌মুসলিম যুগের দুর্গ আছে, অন্তত ইট দেখে সে রকমই মনে হলো। গড়টির নাম মহাযোগিনীর গড়। বর্তমানে এখানে একটি মন্দিরও আছে তবে এটি দেড়শো বছর আগের তৈরি। আরও প্রাচীন মন্দিরটি মুসলিম অভিযানে ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানের মন্দিরটিও অবশ্য সাধারণের যাতায়াতের পথে অবস্থিত নয়। এটির অবস্থান তরাই-এর গভীর অরণ্যে।

"এখানে এক বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো। এরা থারু নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতেরা এদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। এদের বৈশিষ্ট্য—এরা আকৃতিতে মঙ্গোলীয় কিন্তু এদের ভাষার সঙ্গে বিহারের গয়া অঞ্চলের মগহী ভাষার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। দক্ষিণ দেশের অ-থারু জাতিগোষ্ঠীকে এরা বাজি (বৃজি-লিচ্ছবী) এবং নিজেদের দেশকে বাজিয়ান বলে থাকে। এরা মুরগী এবং শুয়োর দুইই আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে; যদিও স্থানীয় হিন্দুদের কাছে মুরগী খাওয়াটা একটা গর্হিত কাজ। এদের মধ্যে আবার একটা সম্প্রদায় আছে তাদের নাম চিতবনিয়া থারু। এরা বলে এদের পূর্বপুরুষেরা রাজস্থানের চিতোর থেকে এসেছিলেন। আর লুম্বিনীর কাছাকাছি বাস করা থারুরা নিজেদের অযোধ্যার বনবাসী রাজার বংশধর বলে পরিচয় দেয়।

"আগামীকাল চাণক্য গড় দেখতে যাব, সেখানে মৌর্য কিম্বা তারও আগের যুগের একটা গড় আছে। পরশু রাতের গাড়ীতে এখান থেকে নরকাটিয়াগঞ্জ হয়ে রক্সৌল যাব। ওখান থেকে চিঠিপত্র দিতে পারব কিনা ঠিক বলতে পারছি না। প্রিয় আনন্দ, আমার নমস্কার জেন। জীবন বড়ই মূল্যবান—সময় মূল্যহীন।"

মার্চ মাসের তিন তারিখে শিকারপুর থেকে রক্সৌল এবং সেই দিনই নেপালের রাজসরকারের পরিচালনাধীন রেলগাড়ীতে বীরগঞ্জ পৌছালাম।

দ্বিতীয় পর্ব

নেপাল

নেপাল প্রবেশ

রক্সৌলে পৌঁছে সূর্যোদয় দেখতে পেলাম। এখানেও বছর ছ'য়েক আগে একদফা ঘোরা হয়ে গেছে। সে তুলনায় রক্সৌলের অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। পশুপতিনাথের তীর্থযাত্রীদের তখন পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে বীরগঞ্জে যেতে হতো। সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সকলকেই এক ডাক্তারী পরীক্ষার বেড়া পার হতে হতো এবং তারপর ছিল সীমান্তের রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে নেপাল প্রবেশের অনুমতিপত্র যোগাড় করা। এখন ও. টি. রেলের রক্সৌল ষ্টেশনের পাশেই নেপালের সরকারী-পরিচালনাধীন রেলষ্টেশন। যাত্রীদের শুধু উঠলেই হলো। ছাড়পত্র দেবার জন্যও বেশ কিছু কর্মচারী মোতায়েন আছে, অনাবশ্যক কোনো ঝামেলা নেই অধিকন্তু আগেকার সেই বিরক্তিকর ডাক্তারী পরীক্ষাটিও বাতিল করা হয়েছে। তবে ডাক্তারী পরীক্ষা এখানে না হলেও চীমাপানি-চন্দাগড়ীর চড়াই অতিক্রম করার সময় সবাইকে যে পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয় তাতে অতি বড় সুস্থ সবল লোকেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

আমার এখানে পৌঁছাবার আনুমানিক সময় বন্ধুদের মধ্যে কারও কারও জানা ছিল। প্রথমে এটাই ঠিক ছিল যে, আমার তিব্বত বাসের মেয়াদ হয়ত আট-দশ বছরও হতে পারে। পনের মাসের মধ্যেই যে ফিরে আসতে হবে, যাত্রাকালে এটা ভাবার কোনো অবকাশই ছিল না। তাই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সীমান্তে এসে বিদায় জানাবার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। রক্সৌলে নেমেই তেমন একজনের সঙ্গে দেখা। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশের নেপাল রেলওয়ের ষ্টেশনে গেলাম। তীর্থযাত্রী হিসেবে ছাড়পত্র আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। ট্রেন নেপালের ভেতরে অমলেখগঞ্জ পর্যন্ত যায়। কিন্তু নেপালের সীমান্ত-শহর বীরগঞ্জেও আমার কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধব আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে জানতাম, তা'ছাড়া বীরগঞ্জ থেকে কিছু সঙ্গী জোটাবার একটা পরিকল্পনাও ছিল। ট্রেনে যাত্রীবাহী বগীর অভাবে মাল চলাচলের ওয়াগন জুড়েই কাজ চালানো হচ্ছিল। অতি কষ্টে তারই একটিতে ঢুকলাম। বস্তুতঃপক্ষে প্রচণ্ড ভিড়

রেল যাত্রায় সমস্ত আনন্দই নষ্ট করে দেয়। গাড়ী ভারত সীমান্তে একটা ছোট নদীর কাছে এসে দাঁড়াল। এখানে ইঞ্জিন জল নেবে। নদীর ধারে রাস্তার ওপরে ছোট একটা কুটির দেখতে পাচ্ছিলাম। এর আগের বার যখন এসেছিলাম তখন বৈধ ছাড়পত্রের অভাবে নেপাল প্রবেশের অনুমতি পাইনি, তাই বাধ্য হয়ে ঐ কুটিরে কয়েকদিন কাটাতে হয়েছিল। সে সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে শিবরাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে বীরগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়াই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তখন এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি রুশিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সেখানে জ্বালামুখী তীর্থ দর্শন করেছিলেন। রুশ দেশেও হিন্দুধর্মের জ্বালামাঈ তীর্থ থাকতে পারে কথাটা তখন বিশ্বাস হয়নি। পরে কিন্তু জেনেছি যে রুশিয়ার বাকু অঞ্চলে বাস্তবিকই ও রকম জায়গা আছে। রক্সৌল থেকে বীরগঞ্জের দূরত্ব তিন-চার মাইল। রেলগাড়ী বীরগঞ্জ বাজারের সরু গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ষ্টেশনে নেমে পাশেই ধর্মশালা দেখতে পেলাম। আগেকার আমল হলে এ সময় ধর্মশালায় জায়গা পাওয়া দায় হয়ে উঠত। কিন্তু এখন রেলগাড়ী চালু হওয়ার ফলে তীর্থ-যাত্রীদের কাছে বীরগঞ্জের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। অবশ্য তীর্থযাত্রীদের মরশুমী ভিড় শুরু হতে আরও কটা দিন বাকী আছে। এইসব কারণে আমিও ধর্মশালার দোতলায় ভালো একখানা ঘর পেয়ে গেলাম। আজ ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী ৬ই মার্চ ১৯২৯, সুতরাং এখনও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ধর্মশালাটি ভালোই, বোধ হয় কোনো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পুণ্যার্জনের চেষ্টার ফল। পাকা ঘর, কুয়া, রান্না করার জায়গা সবই আছে। তা'ছাড়া কাছেই হালুইকরের ও চাল-ডালের একটা দোকানও দেখতে পেলাম। সুতরাং মনে হলো যদি এখানেই দু'একদিন থেকে যাই কোনো অসুবিধা হবে না। হাতমুখ ধুয়ে নীচে হালুইকরের দোকানে গরম গরম পুরীর সদ্ব্যবহার করতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি একদল বরযাত্রী আমার ঘরটি দখল করে নিয়েছে। অগত্যা সেই সুন্দর ঘরটির মায়া ত্যাগ করে আমাকে অন্য একটি ঘর দেখে নিতে হলো। নতুন ঘরটিতে আলো-বাতাস দুটোই অপ্রতুল কিন্তু মানিয়ে নিতেই হবে। কিন্তু এখানেও একা থাকা গেলো না। বরযাত্রী দলের ভৃত্য গোছের দু'একজন এখানেও আমার অংশীদার হলো, তবে তারা লোক ভালো, আমার সুবিধার দিকেও তাদের দৃষ্টি ছিল। এখন সমস্যা সময় কাটানো। সঙ্গে ভালো বই-টইও নেই, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়নি এখনও। তবে সময় তো তার নিজের গতিতেই চলে যায়। যে বন্ধুটির আসার কথা ছিল তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি। নিদ্রাহীন রাত কাটালাম নানা পারম্পর্যহীন ভাবনার মধ্য দিয়ে। ভোরে পাশের কামরা থেকে এক উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কণ্ঠস্বর আমার খুবই পরিচিত। মথুরাবাবু, যাঁর প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, তিনি গত রাত্রিতে

এসে আমারই পাশের কামরাতে ঠাঁই নিয়েছেন। অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করা গেলো। গতকাল আমার একটু জ্বরমতো হয়েছিল, আহারে রুচি নেই। এখানে কাছাকাছি কোনো ব্যবস্থা না থাকায় মথুরাবাবু তাঁর এক পরিচিত বাড়ি থেকে আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। দশটা নাগাদ মথুরাবাবু ফিরে গেলেন। এখন আমার প্রতীক্ষা আর এক বন্ধুর জন্য যাঁর নেপালে আমার সঙ্গী হবার কথা আছে। দুপুরে তাঁকেও পেয়ে গেলাম। তবে একা, তাঁর সঙ্গে আর যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা কেউই আসেননি। শুনলাম একজন অসুস্থ আর একজন যাত্রা স্থগিত রেখেছেন কোনো কারণে। এমন কি আমার বন্ধুটিরও বিশেষ কারণে যাওয়া অসুবিধে এবং সেটা জানাবার জন্যই এতদূরে আসা। যার একলা পথ চলার অভ্যাস আছে সে কখনও এ সমস্ত ব্যাপারে হতাশ হবে না। আমি বন্ধুটিকে ধন্যবাদ দিলাম, কারণ উনি ছাপরা থেকে এতদূর পর্যন্ত এসেছেন। ধন্যবাদ দেবার প্রধান কারণ —আমার যাত্রার পাথেয় এবং কিছু জিনিসপত্র তাঁরই জিম্মায় ছিল।

দুপুরের পরের গাড়ীতেই বন্ধুটির ফিরে যাবার কথা। এখন আমারও আর কোনো কিছুর অপেক্ষায় থাকার প্রশ্ন নেই। বন্ধুটির সঙ্গে আবার ভারতসীমার রক্সৌলে চলে গেলাম। রক্সৌল থেকে যে সব ট্রেন এখানে আসে তা এমনভাবে বোঝাই থাকে যে এখানকার ষ্টেশন থেকে তাতে ওঠা অসম্ভব। তার চেয়ে যেখান থেকে ট্রেন ছাডছে সেখান থেকে যদি ট্রেনে উঠি তবে অন্তত খানিকটা স্বস্তির ব্যাপার হবে নিঃসন্দেহে। তাই বন্ধুটির সঙ্গে রক্সৌলে এসে ফিরতি গাড়ীতে অমলেখগঞ্জের উদ্দেশে চড়ে বসলাম। রেল ভ্রমণ এ বার মোটামুটি আনন্দদায়ক ছিল কারণ ভিড় কম। তবে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে যত আনন্দ এর আগে পেয়েছি সে তুলনায় কিছুই না। সন্ধ্যে হতে হতে গাড়ী তরাই-এর গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল, একটু বেশী রাত্রিতে আমরা অমলেখগঞ্জ পৌছালাম।

কাঠমাণ্ডুর পথে

অমলেখগঞ্জ শহরটি নতুন। রেলগাড়ীর কৃপায় প্রতিনিয়ত শহরের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই শহরই রেলপথের শেষ ষ্টেশন। মনে হচ্ছে এরপরে আরও এগিয়ে রেললাইন হয়ত ভীমফেদী পর্যন্ত যাবে। এখান থেকে মালপত্র লরীতে করে ভীমফেদীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশনে নেমে মনে হলো রাত্রিতেই কোনো লরীচালকের সঙ্গে কথা বলে রাখি যাতে ভোরে উঠেই রওনা হয়ে পড়তে পারি। ভোরে বেরোতে পারলে বেলা বাড়বার আগেই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চীমাপানির চড়াই পেরিয়ে যেতে পারব। একজন বাসচালক প্রতিশ্রুতি দিলো যে, তার বাস ভোরবেলাতেই ছাড়বে। তার কথামতো আর কোনো লরীচালকের সঙ্গে কথা না বলে, রাত্রিতে বাসেই শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলা

দেখি একের পর এক লরী বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার বাসটি ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল —প্যাসেঞ্জার না পেলে ছাড়ি কি করে?

এমন অবস্থায় তাকে গত রাত্রির প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করানো বৃথা। বাধ্য হয়ে বাস ছেড়ে একটা মালপরিবহণের লরীচালকের শরণাপন্ন হলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, লরীচালক রাজি হলো, ভাড়াও অল্প, মাত্র এক টাকা। ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তাড়াতাড়িই আরও কিছু যাত্রী জুটে গেলো। লরী ছেড়ে দিলো। আমার ধারণা ছিল দূরত্ব অনুপাতে ভাড়া কম, তাই অধিকাংশ যাত্রীই বোধহয় এ পথটুক বাস বা লরীতে অতিক্রম করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে লোক চলেছে পায়ে হেঁটে। ওরা যে সকলেই বেশী পুণ্যের লোভে হেঁটে যাচ্ছে তা নয়, এক টাকা ভাড়া হয়ত খুবই সস্তা, কিন্তু এই সস্তার সুযোগটুকু নেবার ক্ষমতাও অধিকাংশ লোকের নেই। দূর থেকে যারা পশুপতিনাথ দর্শনে আসে তাদের মোটামুটি সামর্থ্য আছে। কিন্তু নেপাল সীমান্তের চম্পারণ ইত্যাদি জেলার তীর্থযাত্রীরা পুঁটলীতে ছাতু বেঁধে নিয়ে চলতে শুরু করে। কেউ কেউ হয়ত অতিকষ্টে আট আনা কি একটা টাকা যোগাড় করতে পারে, অধিকাংশ আবার তাও পারে না। ওদের কাছে ছাদখোলা লরীতে চড়াটাও বিলাসিতারই নামান্তর। চুরিয়াঘাটির চড়াই ভাঙতে হবে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লরী একটা সুড়ঙ্গ পথের মুখে এসে দাঁড়াল। বুঝলাম শুধু মানুষেরই নয় গাড়ী ঘোড়ারও চড়াই ভাঙার প্রয়োজন হচ্ছে না এই নতুন তৈরি সুড়ঙ্গ পথটির জন্য। এরপর আমরা তরাই-এর গহন অরণ্য পিছনে ফেলে, পাহাড়ের রাজ্যে প্রবেশ করছিলাম। রাস্তার দু'পাশে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি, কোথাও জঙ্গল কেটে দু'চার ঘর বসতি স্থাপিত হয়েছে। এদিক-ওদিক দু'চারটি পাহাড়ী গোরু চরছে। চলমান যাত্রীরা থেকে থেকেই "জয় বাবা পশুপতি নাথ কি জয়," "গুহ্যেশ্বরী মাঈকি জয়" ধ্বনি দিচ্ছে। তাদের দেখাদেখি এই জয়ধ্বনি করার রোগটি আমাদের লরীর যাত্রীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে পড়ল। এর মধ্যে এক সময় কখন যে ভীমফেদী পৌঁছে গেলাম তা বুঝতেই পারলাম না। ভীমফেদী বাজারের কাছেই রজ্জুপথের (রোপওয়ে) ষ্টেশন। লরীতে অমলেখগঞ্জ থেকে মালপত্র আসে, আবার এখান থেকে রজ্জুপথে তা কাঠমাণ্ডু চলে যায়। ভীমফেদীতে ঢোকার মুখেই সরকারী বাহিনী হাজির। শুনলাম আর এক দফা চেকিং হবে। ভাগ্য ভালো, হাঁটা পথের যাত্রীরা এখনও এসে না পৌঁছানোর জন্য ভিড় খুব বেশী নেই। চেকিংয়ের ঝামেলা তাড়াতাড়িই মিটে গেলো। যদিও আমার সঙ্গে জিনিসপত্র খুব বেশী নেই, তবুও অন্তত পথে সঙ্গী হিসেবে কাজে লাগবে মনে করে একজন ভারিয়াকে (পার্বত্যপথে বোঝা বহনকারী) ঠিক করলাম। কথা

হলো, পথে সে রান্নাও করবে। দেড় টাকায় রফা হলো। যদিও লোকটির জাতি, গোত্র ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই লাগবে না, তবুও নিছক কৌতূহল-বশত জিজ্ঞেস করে জানলাম লোকটি জাতিতে লামা। আমাদের দেশে যেমন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী, কোনো এক সময়ে গৃহী হয়ে গেলেও নামের পেছনে ওই পদবী থেকেই যায়, তেমনি এই পাহাড় অঞ্চলে কোনো বৌদ্ধভিক্ষু গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে এলে তাদের বংশধরেরাও লামা থেকে যায়। লামা, গুরুং, তমং এই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা নেপাল-দেরাদুন সীমান্ত অঞ্চলে বেশী সংখ্যক বাস করে। এদের ভাষা তিব্বতী ভাষারই একটা প্রশাখা। কিন্তু যেহেতু গোর্খাগোষ্ঠীর ভাষাই নেপালের রাষ্ট্রভাষা অতএব সকলে গোর্খা ভাষাই ব্যবহার করে।

ভীমফেদীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এগোলাম। চীমা-পাণির চড়াই আর একটু আগে থেকে শুরু হয়েছে। চড়াইয়ের মুখে সরকারী লোক কুলীদের নাম ঠিকানা লিখে নিল। চীমাপাণির পথ দেখলাম আগের মতো আর দুর্গম নেই। পুরানো পথ বাতিল করে নেপাল রাজ-সরকার নতুন পথ তৈরি করেছে, যার ফলে চড়াই আর আগের মতো খাড়াই মনে হয় না। মনে হলো চীমাপাণির দুর্গমতার গর্ব অর্ধেক এই নতুন রাস্তা চূর্ণ করে দিয়েছে। বাকী অর্ধেকও শেষ হয়ে যাবে যে দিন এ পথে মোটর গাড়ী চলাচল করবে। পথে কোথাও কোথাও মাথার ওপর দিয়ে রজ্জুপথ চলে গেছে। দুপুরবেলা চীমাপাণি পৌঁছালাম। এখানে শুল্ক বিভাগের লোকেরা কোনো বে-আইনী জিনিস আছে কিনা দেখবার জন্য যাত্রীদের সমস্ত জিনিসপত্র ঘেঁটে তচ্‌নচ করে দিচ্ছে। আমার কাছে সামান্য জিনিস থাকায় আমি রেহাই পেয়ে গেলাম। বৌদ্ধভিক্ষুর হলুদ একটা পোশাক আমার সঙ্গে আছে তবে ওটিকে গাঁটরিতে রেখে ভুল করেছি। এ যাত্রায় ওটি কোনো কাজেই লাগবে না, অথচ পশুপতিনাথের যাত্রী দলে বৌদ্ধভিক্ষুর পোশাক যে কোনো লোকেরই সন্দেহের উদ্রেক করবে। ভারিয়া এবং আমি দু'জনেই ঠিক করলাম, যে করেই হোক আজ চন্দাগদী পেরিয়ে যাব। এর আগের বার ভীমফেদী থেকে মহিষদহ পর্যন্ত আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, আর এ বার বেলা দুটো নাগাদ সে জায়গা পেরিয়ে গেলাম। চীমাপাণির এদিকটাতে লোকবসতি একটু বেশী তাই অরণ্যের শ্যামলতার পরিমাণটা কম। বেলা চারটের মধ্যে চন্দাগদী পার হব, এই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে প্রাণ যায় আর কি। তবুও মনের জোরে চলেছি, থামছি না। এ সমস্ত পার্বত্য পথে চলতে শুরু করে থামলে, কষ্ট তো কমেই না উপরন্তু বেড়েই যায়। তা'ছাড়া আমার সঙ্গী ভারিয়া বহুদূর এগিয়ে গেছে তাকে ধরতে হলে থামলে চলবে না। রাস্তায় সারণ জেলার কয়েকজন পূর্বপরিচিত যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা তো আমার চেয়েও খারাপ। যাই হোক কোনোমতে শরীরের বোঝা টেনে টেনে চিত্লাঙ পৌঁছালাম। এ সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে দিন থাকতে

থাকতে চটীতে পৌছানো উচিত। আমাদের পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় স্থান পাওয়া দায় হয়ে উঠল, বহু কষ্টে ছোট একটা ঘর যোগাড় হলো। আমরা পাঁচজন সেই ঘরে আশ্রয় নিলাম। পথ চলার অপরিসীম কষ্টের পর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়াটাই সবচেয়ে আরামদায়ক এবং কাম্যও ছিল, কিন্তু কিছু না খেলে আগামী কাল পাহাড়ের চড়াই ভাঙা অসম্ভব ব্যাপার হবে। সুতরাং সঙ্গী পাণ্ডেজী ভাত রাঁধলেন, আমরা খেয়ে-দেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর হতেই আবার যাত্রা শুরু। আমাকে এ বার আমার সারণ জেলার সঙ্গীদের সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। তারা আমার পরিচিত তবুও তারা এ কথাই জানে যে তাদের মতোই পশুপতিনাথ দর্শনে চলেছি। যাই হোক চন্দাগদীর চড়াইয়ের পথে তারা আপনা থেকেই পিছিয়ে পড়ল। আমি নিশ্চিন্ত মনে এগোতে থাকলাম। এ বার চন্দাগদীর কঠিন উৎরাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু হা হতোস্মি, পথ পাল্টে গেছে, সেইসঙ্গে কমে গেছে উৎরাই-পথের ভীষণতা। নীচে তীর্থযাত্রীদের জন্য অস্থায়ী সদাব্রত খোলা হয়েছে এবং সেখানে নিখরচায় যাত্রীদের মালপোয়া ভোজন করানো হচ্ছে। আমিও ডাক পেলাম এবং আমার ভারিয়া সঙ্গীটির এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখতে পেলাম। নিজের প্রয়োজনে না হলেও তার আগ্রহে যেতেই হলো। গিয়ে দেখি চারদিকে সাধু মহাত্মাদের ভিড়। গাঁজার ছিলিম চলছে। একজন আমাকে তার প্রসাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। কোনো রকমে তাঁকে এড়িয়ে মালপোয়া নিয়ে ফিরলাম। থানকোটে পৌছে কলা এবং দুধ পাওয়া গেলো। এখানে ভীমফেদী থেকে রজ্জুপথে আসা মালপত্র নামিয়ে আবার লরীতে তোলা হচ্ছে। আমার সঙ্গী ভারিয়াটি দুঃখ করছিল যে, আগে ওরা ভীমফেদী থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত মাল বয়ে নিয়ে যেত। বহু পরিবার এই পেশায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এখন এই রজ্জুপথে মণ প্রতি মালে ছ'আনা ভাড়া লাগে, তাই কে আর আট গুণ বেশী ভাড়া দিয়ে এদের মাল বইতে নিয়োগ করবে। বস্তুত এই বেচারাদের বিকল্প কোনো কাজের ব্যবস্থা না করেই এ ধরনের রোপওয়ে চালু করা খুবই খারাপ কাজ হয়েছে। দশটা নাগাদ কাঠমাণ্ডুর উপকণ্ঠে বৈরাগীপেটে পৌছালাম। যদিও এর আগে মোহন্তজীর এইখানে সাতদিন ছিলাম, পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, তা'ছাড়া উনি ছাপরা জেলার লোক, কিন্তু এই ভিড়ে সে পরিচয় কোনো কাজেই এল না, তবে থাকার একটা জায়গা জুটল।

ডুক্‌পা লামার সাক্ষাৎ

৬ই মার্চ নেপাল পৌছেছি। ঐ দিন বের হওয়া সম্ভব হয়নি কারণ পথের ক্লান্তি। শিবরাত্রি উপলক্ষে থাপাথলির সমস্ত মঠে সন্ন্যাসীদের জন্য বিনা মূল্যে খাবার, গাঁজা, তামাক এমন কি ধুনী জ্বালাবার কাঠ পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা আছে। তবে এই মঠে শিবরাত্রি ছাড়া অন্য সময়ও বিনামূল্যে আহার্য পাওয়া

যায়। এই দৈনিক এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে বার্ষিক ভোজ ইত্যাদির খরচ-খরচা থেকে টাকা-পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মোহন্তরা এখন বেশ ধনী কিন্তু তাদের দেখলে সেটা একেবারেই বোঝা যায় না। এরা থাকে অত্যন্ত দরিদ্রভাবে। অবশ্য নেপালে মোহন্ত কেন, একমাত্র রাজ পরিবার ছাড়া সকলেই নিজেদের ধনসম্পত্তি যথাসম্ভব গোপনে রাখার চেষ্টা করে। রাজা কিম্বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা হয়ত সর্বজ্ঞ নন, তবে কানভাঙানী দেবার লোক কোনো কালেই কম থাকে না, সে জন্য যে যার ঐশ্বর্য যতটা পারে গোপনে রাখে। নেপালে যে ব্যবসায়ীটিকে আমি অত্যন্ত সাধারণ লোক বলে মনে করেছি, পরে লাসাতে গিয়ে দেখেছি তার বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি বহু লক্ষ টাকার দ্রব্যে সাজানো। আর মোহন্ত বেচারাদের হাল তো খুবই খারাপ, তারা যেন সর্বদাই বারুদের স্তূপে বসে আছে—কখন কার কথায় সর্বনাশ হয়। যাদের ভয়ের কারণ ভাবে তাদের মোটা রকম ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হয় এবং যে-টাকা আত্মসাৎ করে তা গোপনে নেপালের বাইরে কোথাও পাচার করতে হয়, যাতে এখানকার পাট যদি কোনো দিন কোনো কারণে ওঠাতেও হয় তখন যাতে নিঃসম্বল না হয়ে পড়ে। শিবরাত্রির ব্যবস্থাদি দেখার জন্য রাজকর্মচারীরা উপস্থিত থাকে, কারণ রাজসরকারই এই ভরতুকীটা দিয়ে থাকেন। অবশ্য তাতে ব্যবস্থাদির বিশেষ কিছু হেরফের হয় না তবে তাদের আদায় উশুলটা এ সময় ভালোই হয় বলে মনে হলো।* বস্তুতপক্ষে এই দোষ সে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেই আছে, যেখানে জনমতের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই এবং পুরো ব্যাপারটা আমলাতন্ত্রের করতলগত।

দ্বিতীয় দিন মনে হলো যে শুধু বসে থেকে কোনো লাভ নেই। বরং আমার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সতর্কতার সঙ্গে খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে। নেপাল থেকে হাঁটা-পথে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে মুক্তিনাথ এবং গোঁসাইকুণ্ড খুব বড় তীর্থস্থান। শুনলাম আবেদন করলে সেখানে যাবার অনুমতিও যোগাড় হতে পারে। কিন্তু সে পথে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়। রাজসরকারের অর্থে অনেকেই ঐ দিকে তীর্থদর্শন সেরে আসতে চায়। আমার প্রয়োজন এমন নির্জনতা যেখানে সরকারী প্রশাসনের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ নয়, সীমান্তের এমন একটা জায়গা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি একজন ভোটীয় (তিব্বতী) সঙ্গীর খোঁজে পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে গেলাম। এ জায়গাটাকে নেপালের অভ্যন্তরে তিব্বতের ছোট্ট টুকরো বললেও চলে। বেনারসে যেমন বাঙ্গালীটোলা এখানে তেমন তিব্বতী-মহল্লা। এ জায়গাটার নাম বোধা। মনে হলো এখানে তেমন কোনো সঙ্গী পাওয়া যেতে পারে। ৭ই মার্চ পশুপতিনাথ এবং গুহ্যেশ্বরী দর্শন সেরে নদী পার হয়ে বোধা গেলাম। বোধাকে ভোটীয়ারা ছোর্তন-খ্রিম্পোছে (চৈত্যরত্ন) বা ব-উন-ছোর্তন (নেপাল-চৈত্য) বলে। কথিত আছে এই স্তূপটি নাকি সম্রাট অশোক নির্মাণ করেন। স্তূপের মাঝখানে সোনালী

রঙের চূড়া, তাকে বেষ্টন করে চারদিকে ঘর বসে গেছে। ঘরের বাসিন্দারা অধিকাংশই তিব্বতী। এর আগের বার যখন এসেছিলাম, তখন এখানে একজন চীনা লামার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভাবলাম এ সময় তাঁর সাহায্য হয়ত আমার তিব্বত যাত্রায় কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তাঁর খোঁজ করে হতাশ হতে হলো, কারণ তিনি আর এই পৃথিবীতে নেই। স্তূপটিকে ভেতর থেকে প্রদক্ষিণ করার সময় লক্ষ্য করলাম অনেক ভিক্ষু হাতে তৈরি পাতলা কাগজ বসে বসে দু'ভাঁজ করছে। আমি আমার জানা ভাঙা ভাঙা ভোটীয় ভাষায় তাদের দেশ কোথায় জানতে চাইলাম। শুনলাম ওদের মধ্যে তিব্বত, ভূটান আর কুলু (কাংড়া উপত্যকা) অঞ্চলের লোক আছে। আমার খুব আনন্দ হলো যখন কুলু অঞ্চলের দু'জন ভিক্ষু আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বললেন। ওঁরা এক নামকরা লামার শিষ্য। ওঁদের গুরুদেব প্রায় ছ'মাস যাবৎ এখানে অধিষ্ঠান করছেন এবং আরও এক মাস করবেন। ইনি অত্যন্ত সিদ্ধপুরুষ ও অবতার বিশেষ। এঁর জন্মস্থান ডুক্‌পা, অর্থাৎ ভূটানে, সে জন্য শিষ্যরা এঁকে ডুক্‌পা লামা বলে। নেপাল-তিব্বত সীমান্তে তিব্বতের অভ্যন্তরে কোরং ইত্যাদি আরও বহু জায়গায় ইনি মঠ স্থাপন করেছেন। ইনি দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন থাকেন। বর্তমানে ওঁর সঙ্গে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আছেন। উনি বজ্রছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকটি ধর্মার্থে বিতরণের জন্য ছাপছেন। সেইজন্য কাগজ তৈরি এবং ছাপার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে।

আগে যখন লাদাখে গিয়েছিলাম তখনকার কিছু এবং পরবর্তী কালে বড় বড় লাদাখী লামার লেখা সুপারিশ পত্রগুলি আমার কাছে ছিল। সুপারিশ পত্রে আমার অনেক প্রশংসা ছিল এবং আমার যাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণিত ছিল। সবশেষে এ রকম অনুরোধও ছিল যে সম্ভব হলে যেন আমাকে সাহায্য করা হয়। আমি ওই সমস্ত চিঠিপত্র কুলুবাসী ভিক্ষুকে দেখলাম। উনি আমাকে ডুক্‌পা লামার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডুক্‌পা লামা চিঠিগুলি পড়লেন। পত্র-লেখকদের একজন আবার ডুক্‌পা লামার সম্প্রদায়ের বড় লামা। এটা আমার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হলো।

আমি তাঁকে বললাম —বৌদ্ধধর্ম তার আপন জন্মভূমিতে প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে এ সম্পর্কে বইপত্রও আর পাওয়া যায় না। আমি বইপত্রের খোঁজে সিংহলে গিয়েছি, কিন্তু সেখানেও সব পাইনি। অথচ বৌদ্ধধর্মের প্রচুর মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সমূহ তিব্বতে রয়েছে। তাই আমার ইচ্ছা তিব্বতে গিয়ে কোনো ভালো গুম্ফায় (বিহার) থেকে তিব্বতী শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করা এবং সম্ভব হলে কিছু গ্রন্থাদি দেশে নিয়ে এসে সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে বই-পত্রের অভাব মোচনের চেষ্টা করা। এর ফলে ভারতবর্ষে আবার বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ব্যাপক প্রচার হবে। আমার দেশবাসী আবার সেই মহান্‌ ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবে। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে তিব্বত নিয়ে চলুন।

আমার কথায় ডুক্‌পা লামা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তাঁকে অত তাড়াতাড়ি রাজী হতে দেখে আমার মনে হলো উনি বোধ হয় আমার তিব্বত যাওয়াটাকে আর পাঁচজন তিব্বতী যেভাবে দেশে যায় সে রকম একটা সহজ ব্যাপার ভেবেছেন। তবে এ ব্যাপারে আমি এই মুহূর্তে আর কিছু না ভেঙে, শিবরাত্রির দিনে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসব বলে আমার থাপাথলির আশ্রয়ে ফিরে এলাম। ডুক্‌পা লামার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাবার পর আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছি।

৮ই মার্চ পাটন গেলাম। আমার এক পূর্ব পরিচিত বৌদ্ধ বৈদ্যের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। এর-পর ইচ্ছে ছিল পাটনের কিছু সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। দু'চার-জনের সঙ্গে দেখাও হলো। প্রত্যেকেই আমার তিব্বত যাত্রার উদ্দেশ্য জেনে খুব খুশী। কোনো ব্রাহ্মণ এ যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এটা তাঁদের কাছে অবাক হবার বিষয়। তিব্বতে ঢোকার ব্যাপারে ওঁরাও কিন্তু ডুক্‌পা লামার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা বলতে পারলেন না। সে দিন পাটনের এক বৌদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সারলাম। পাটনকে ললিত-পট্টন এবং অশোক-পট্টনও বলে। পাটন নেপালের পুরানো রাজধানী। অধিবাসীদের অধিকাংশ বৌদ্ধ এবং নেওয়ার। শহরের মধ্যিখানে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ এখনও দর্শনীয় বস্তু। সারা শহরে ছড়িয়ে আছে অজস্র চৈত্য এবং মন্দির। গলিপথে বিছানো ইটের নমুনা দেখে মনে হয় এক সময়ে ভালো শহরই ছিল। এখন গলিগুলো অত্যন্ত নোংরা, আবর্জনায় ভর্তি। যেখানে সেখানে শুয়োর চরছে এবং বিষ্ঠা পড়ে আছে। সম্প্রতি শহরে কলের জলের প্রচলন হয়েছে। পাটনের পুরানো ভিক্ষু-বিহার এখনও তার স্বকীয় নামেই বর্তমান এবং কিছু লোক সেখানে বাস করে। ওখানকার কিছু বাসিন্দা নিজেদের এখনও ভিক্ষু বলে। তবে গৃহস্থ ভিক্ষু। এদের মধ্যে লেখাপড়ার চল প্রায় নেই বললেই হয়। এর আগের বার যখন এসেছিলাম, তখন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আমাকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে সময় আমার তিব্বত যাবার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আর এ বার যখন আমি নিজে তিব্বত যেতে ইচ্ছুক, তখন কোনো দিক থেকেই কোনো আশার আলো দেখতে পেলাম না। এক ডুক্‌পা লামাই যা ব্যতিক্রম।

পাটনের কাজ সেরে ফিরে এলাম। থাপাথলির আশ্রয় ছেড়ে দেবো ভাবছিলাম কিন্তু অসুবিধে ঘটাল সেই বৌদ্ধভিক্ষুর পোশাকটি। ওটা সঙ্গে না থাকলে আমি ঝাড়া হাত পা, কিন্তু ওটা আবার কারও নজরে পড়ুক সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। এই চীবরটি সঙ্গে আনায় জন্য যথেষ্ট অনুতাপ হচ্ছিল। আমার পরবর্তী যাত্রীদের কাছে আমার নিবেদন তাঁরা যেন এই দিকগুলো ভালো করে

ভেবে নিয়ে তারপর যেন এ পথে পা বাড়ান। আমি একজন নেওয়ারী ভদ্রলোককে ঠিক করলাম যার কাছে জিনিসটি গচ্ছিত রেখে দেবো। তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পোশাকটি আনতে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার থাকবার জায়গাটির আশপাশে অনেক লোকের জটলা। এমন অবস্থায় পোশাকটিকে বের করলেই পাঁচ জনের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে পড়তে বাধ্য। এখন হাত কামড়ানো ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়ে সে রাতটিও ওখানেই কাটাতে হলো। পরের দিন ৯ই মার্চ শনিবার মহাশিবরাত্রি। সে দিন খুব ভোরে উঠে আমার কম্বল, চীবর ইত্যাদির গাঁটরি খুব সাবধানে বেঁধে, কেউ টের পাবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। বাগমতীর ধার দিয়ে গিয়ে সেতুর কাছাকাছি যখন পৌঁছালাম তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। কাছেই পশুপতিনাথের মন্দির। একে শীতের শেষ তার ওপর নেপালের তীব্র ঠাণ্ডা, তবুও হাজার হাজার পুণ্যার্থী স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। স্নানার্থীদের অধিকাংশই বিহারের উত্তরাঞ্চলের লোক, অপেক্ষাকৃত অল্পাংশ সংযুক্ত প্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ —অনুঃ)। এ ছাড়াও ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেরই কিছু না কিছু প্রতিনিধি এদের মধ্যে আছে। আমার আজ স্নান বা দর্শন কোনোটারই ফুরসৎ নেই। সেতু পার হয়ে, ছোট পাহাড়ী টিলা অতিক্রম করে গুহ্যেশ্বরী। সেখান থেকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আবার নদী পার হয়ে বোধা।

বোধায় যখন পৌঁছালাম তখন সকাল। কুলুর সেই পূর্বপরিচিত ভিক্ষু রিন্‌চেন আমাকে ডুক্‌পা লামার কাছে নিয়ে গেলেন। আমার যত বিপত্তির কারণ সিংহলী ভিক্ষুর চীবরটি উনি দেখলেন। ওটি কিভাবে পরে তাও দেখালাম। পরে রিন্‌চেনের সঙ্গী ছবং-এর বাড়িতে ভাত খেয়ে প্রাতরাশ পর্ব শেষ করলাম। পরে বললাম —এখানকার সবাই যা খায় আমিও তাই খাব, কারণ এ সমস্ত এখন থেকেই অভ্যাস করে নিতে হবে। এখনও আমার পরনে সেই আলখাল্লা যা এই পরিবেশের সঙ্গে বে-মানান এবং আমার পক্ষে বিপদজনকও। আমি রিন্‌চেনকে বললাম —যে কোনো জায়গা থেকে একটা ভোটীয় ছুপা (তিব্বতী লম্বা কোট) এবং অনুরূপ জুতো যোগাড় করে দিতে। শীতের মরশুমে এগুলো যোগাড় করা কঠিন ব্যাপার নয়। তিব্বতীরাও অনেক সময় টাকা-পয়সার প্রয়োজনে এগুলো বিক্রি করে দেয়। বোধায় কারবার করে এমন নেপালী ব্যবসায়ীরা তখন সস্তায় ওগুলো কিনে রাখে, পরে সুযোগ মতো বেচার জন্য। সাত-আট টাকায় একটা ছুপা পাওয়া গেলো কিন্তু জুতো তৎক্ষণাৎ আমার পায়ের মাপে পাওয়া গেলো না। তবে জুতো না হলেও শুধু ছুপা পরতেই আমাকে আর মধেসিয়া (মধ্যদেশের লোক) বলে চেনবার উপায় রইল না। রিন্‌চেন এবং ছবং ডুক্‌পা লামার বই ছাপার কাজে ব্যস্ত আছে তবুও ওরা যখনই সময় পাচ্ছিল আমার খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছিল।

পরদিন ছুপা পরে ডুক্‌পা লামার সন্দর্শনে গেলাম। ডুক্‌পা লামার প্রকৃত নাম হলো গেশো শোব্‌র-দোর্জে (অধ্যাপক প্রজ্ঞাবজ্র)। বিদ্বান ভিক্ষুদের তিব্বতীরা গেশো অর্থাৎ অধ্যাপক সম্বোধন করে। লামার বর্তমান বয়স প্রায় ষাট বছর। খাম ও তিব্বতে ইনি দীর্ঘকাল তিব্বতী শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছেন এবং তিব্বতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক লামা শাক্যশ্রীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রও শিখেছেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তাঁর নিজের দেশ ভূটান ফিরে যান। ভূটানের রাজা খুবই আগ্রহী ছিলেন যাতে তিনি দেশেই থাকেন। কিন্তু সেখানে শান্তি না পাওয়ায় তিনি কাঠমাণ্ডুর উত্তরে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে কোরং অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর পূজাপাঠ এবং তন্ত্রমন্ত্রের ফলাও চর্চা চলছিল। তিব্বতে এবং নেপালে যত বড লামাই হোক না কেন তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ না হলে খাতির পাওয়া ভার। গেশো শোব্‌র-দোর্জে লেখাপডা জানতেন, বুদ্ধিমানও ছিলেন, তদুপরি তন্ত্রমন্ত্রের ভেল্‌কী, রুমাল-ঝাডা, ভূত-প্রেত তাডানো ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁকে কেন্দ্র করে একদল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর সমাবেশ হলো। এরপর তিনি কোরং-এর পুরানো অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরটির সংস্কার করান এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের থাকবার জন্য একটি মঠও তৈরি হলো। এর ফলে তাঁর খ্যাতি কোরং ছাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পডল। কোরং যদিও তিব্বতে তবু সেখানকার মন্দিরের সংস্কারের ব্যাপারে নেপালের বৌদ্ধরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। যাই হোক এই খ্যাতিই তাঁকে গেশো শোব্‌র-দোর্জে থেকে ডুক্‌পা লামাতে পরিণত করেছে।

ডুক্‌পা লামার নানাবিধ অলৌকিক শক্তির কথা তাঁর কুলুনিবাসী শিষ্যরা আমাকে হামেশা শোনাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম তখন দেখি, তিনি কথা বলতে বলতে চোখ বুজে স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্যদের প্রচার আমার মাথায় তখনও ঘুরছিল। তাই ভাবলাম, লামা ধ্যানমগ্ন হয়ে এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করছেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই ভাবে আমি বেশ অভিভূত হয়ে পডলাম। আমার এই মোহ দু'তিন দিন ছিল। মনে মনে ভাবতাম এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য পেয়ে আমি ধন্য। এ যেন জঞ্জালের স্তূপে ছেঁডা কাগজ খুঁজতে গিয়ে অমূল্য এক রত্নের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার মতো শুক্‌নো কাঠখোট্টা তর্কবাগীশের এই ভাব বেশী দিন রইল না। দু'এক দিনের মধ্যেই বুঝে ফেললাম, এ সব ধ্যান-ট্যান কিছু নয়, বিশুদ্ধ নিদ্রা মাত্র। এঁরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকেন, ঘুমোবার জন্য খুবই কম সময় পান তাই দিনের বেলা এভাবেই খানিক ঘুমিয়ে নেন। হ্যাঁ অলৌকিকত্ব যদি কিছু থাকে তা এই বসে বসে ঘুমোবার মধ্যেই আছে কারণ এটা তো সকলে পারে না। মনে মনে ভাবলাম, এই সামান্য ব্যাপারটা যদি আমার মতো মানুষকেও কিছুদিন প্রভাবিত করে রাখতে পারে, তা'হলে

সাধারণ, সরল অশিক্ষিত ভক্তদের ওপর যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে তাতে আর সন্দেহ কি। ডুক্‌পা লামার এখানে স্থানীয় ভক্তদের ভিড় লেগেই আছে। ভক্তরা দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম জানায়, তারপর মিছরী-মেওয়া এবং সাধ্যমতো টাকা-পয়সা প্রণামী দেয়। কখনও কেউ নিজের বা পরিবার-পরিজনের সুখ-দুঃখের কথা বলে বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। লামাও পাশা নিক্ষেপ করে, নানা রকম মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সে সবের জবাব দেন। কখনও বা কোনো বাধা বা ফাঁড়া আছে বলেন এবং সেই বাধা অপসারণের জন্য একটা মন্ত্র জপ করতে দেন কিম্বা কখনও ছোট-খাট পূজার বিধান দেন।

ভোট ভাষাটা আয়ত্ত করা সহজ হবে ভেবে অন্য শিষ্যদের সঙ্গে এক জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম ততটা হলো না, কারণ অধিকাংশ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সূর্যোদয়ের আগেই বই ছাপার জায়গায় চলে যায়। বই ছাপার কাজ কোনো প্রেসে হচ্ছিল না। এক টুক্‌রো কাঠের তক্তার দু'পাশে বইয়ের পৃষ্ঠা খোদাই করা আছে। তক্তাটিকে মেঝেতে রেখে কাপড়ে কালি ঢেলে ওটিতে মাখান হয় তারপর তক্তার ওপর কাগজ রেখে ছোট বেলনা জাতীয় একটা দণ্ড চালিয়ে চাপ দেওয়া হয়। ব্যস হয়ে গেলো ছাপা। ইতিপূর্বেও ডুক্‌পা লামা কয়েক সহস্র বজ্রছেদিকা ছাপিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিলি করেছেন। এ বারও হাজার দশেক বজ্রছেদিকা ছাপাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যদিও এখন আমার পরনে ভোটীয় পোশাক কিন্তু কিছুতেই যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছি না। সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় এই বুঝি কেউ চিনে ফেলল। জুন মাস পযন্ত এই মানসিক উদ্বেগটা কিছুতেই কাটল না। যদিও পরবর্তী কালে ভেবে দেখেছি, যে ও রকম ভয় পাওয়াটা নিতান্তই অমূলক ছিল। আমার সঙ্গী কুলুর বাসিন্দা রিন্‌চেনের মুখও তিব্বতী-সদৃশ ছিল না, কিন্তু এটা দেখেও আমার ভয় কাটত না। এর কারণ ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে নেপাল রাজসরকারের ব্যবহার সম্পর্কে অতিশয়োক্তি এবং আমার মতো লোকের এ রকম পরিস্থিতিতে পড়ার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা। বস্তুত তিব্বতী বেশভূষা ধারণ করা এবং কথাবার্তায় ওদের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করবার পর থেকেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। কারণ, পৃথিবীতে মানুষের আরও বহু কাজ আছে, সে সব ছেড়ে কোথায় কোন ভারতীয় ভোটীয় পোশাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের নেই।

পুরো মার্চ মাসটা আমি প্রায় জেলের কয়েদীর মতো কাটালাম। দিনের বেলা বাইরে বের হবার সাহস হতো না, রাত্রিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া শুধু মাত্র একবার বোধা চৈত্য পরিক্রমা করতে বের হতাম। এই সময়ের মধ্যে রস হেণ্ডারসনের তিব্বতী ভাষায় লেখা টিবেট্যান ম্যানুয়াল বইখানা পড়ে তিব্বতী

ভাষা শেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু উচ্চারণ শিক্ষায় টের পেলাম ঐ বইটিতে চাং অঞ্চলের (টশীলুম্পোর নিকটবর্তী প্রদেশ) উচ্চারণবিধিই ব্যবহৃত হয়েছে বেশী। এ জন্য আমার ধারণা ভাষা শিক্ষার পক্ষে চার্লস বেলের বইটিই অধিকতর উপযোগী। কারণ ওই বইয়ে লাসা অঞ্চলের উচ্চারণ বিধি ব্যবহার করা হয়েছে।

ডুক্‌পা লামা তাঁর আলোচনাতে কিম্বা উপদেশ বিতরণের সময়, ধর্মতত্ত্ব, যোগ-সমাধি ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে গিয়ে কেবল তন্ত্রমন্ত্র নিয়েই আলোচনা করতেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞানের সীমা যে কতদূর তা বুঝে ফেলতে অসুবিধা হলো না। কিন্তু আমাকে তিব্বতের সীমানার মধ্যে যেতে হলে তাঁর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে ডুক্‌পা লামার চেয়ে উপযুক্ত কারও খোঁজ এখনও আমি পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর ঐ সমস্ত বাগাড়ম্বর আমাকে সয়ে যেতে হতো। কিন্তু এভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পর যখন কাশীর পণ্ডিতের খোঁজ করে অনেক নেপালী আমার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করল, তখন আমি মহা চিন্তায় পড়লাম। তাদের এই যাতায়াত থেকে আমার আসল উদ্দেশ্য যদি কোনো ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা'হলে সর্বনাশ। অতএব একমাত্র পথ এখান থেকে সরে পড়া। কিন্তু ডুক্‌পা লামার বই ছাপার কাজ তখনও চলছে, তা'ছাড়া গরমও তেমন পড়েনি, ফলে এখানকার পাট গোটাবার কোনো ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে দেখলাম না। উপরন্তু ডুক্‌পা লামা আমার ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে করুণাময়ের পূজার নিয়ম ইত্যাদি শেখাবেন বললেন। তাই শুনে রিন্‌চেন বলল —আপনি খুব ভাগ্যবান তাই অতি সহজেই গুরুদেবের কাছ থেকে এই রহস্যের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বেচারা রিন্‌চেন তো আর জানে না যে স্বয়ং করুণাময় (অবলোকিতেশ্বর) আমার কাছে এক কল্পিত বস্তু। অতএব তাঁর পূজাবিধি শেখার কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই।

অবশেষে ২৭শে মার্চ বই ছাপার কাজ শেষ হলো। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কাঠমাণ্ডু এবং পাটন থেকে কিছু লোক আমার কাছে আসত, কিছু উপদেশ শোনার আগ্রহে। আমি এমন একটা কেউকেটা লোক নই যে সকলকে উপদেশ দিয়ে বেড়াব, তাই স্বাভাবিক কারণেই তাদের অনুরোধে সঙ্কোচ বোধ হতো। এইসব উপদেশ প্রার্থীরা আবার বুদ্ধের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী, আর আমি জানি সেই পুরুষোত্তম বুদ্ধকে। যেদিন থেকে বোধায় এসেছি সে দিন থেকে আর স্নানের ধারেকাছে যাইনি। চেষ্টা করছিলাম সর্ব বিষয়ে একজন পাকা তিব্বতী হতে। প্রথম প্রথম উকুন, ডাঁস ইত্যাদিরা ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। কিন্তু কয়েকদিনের অভ্যাসে সহাবস্থান মঞ্জুর হয়ে গেছে।

বই ছাপার কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব পাকাপাকি যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না দেখে, নিজেই রিন্‌চেনকে জিজ্ঞেস করলাম। রিন্‌চেন জানাল গুরুদেব কয়েকদিনের মধ্যেই বোধার পাট ওঠাবেন।

কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভূতে (কাঠমাণ্ডুর কাছে আর একটি বৌদ্ধস্তূপ) কয়েকদিন অধিষ্ঠান করবেন। তারপর যাত্রাপথে য়ল্মোতেও বেশ কিছুদিনের জন্ম অবস্থান করবেন। সব শেষে যাবজ্জীবন অধিষ্ঠানের জন্ম যাবেন লবচীকি গুহাতে। আমি অন্তত এটুকু সান্ত্বনা পেলাম যে, ভুক্পা লামার সাহায্যে নেপাল সীমান্তে তিব্বতী জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল য়ল্মোতে যেতে পারব। সেখান থেকে আবার নিশ্চয় কোনো উপায় হয়ে যাবে। বোধা চৈত্যে এখন বেশ গরম অনুভূত হতে শুরু করেছে। এই গরমে আমাদের দু'একজন ভোটীয় সঙ্গী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই কারণে ৩১শে মার্চ আমরা বোধা ত্যাগ করলাম। কতদিন পর আবার বাইরে বেরিয়েছি। বোধা থেকে কাঠমাণ্ডু পৌছাতে পৌছাতে ভোটীয় জুতো তার কেরামতী দেখাতে শুরু করল। দুই পা কেটে রক্তারক্তি। তবুও পাছে আমার ভোটীয় বেশে কোনো খুঁত থেকে যায়, এই আশঙ্কায় হিংস্র জুতো-জোড়াকে কিছুতেই পা-ছাড়া করলাম না। যদিও আমার ভোটীয় সঙ্গীরা কিন্তু অনেকে নগ্নপদেই পথ চলছিল। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় ভয়ে কোনো দিকে মুখ তুলে চাইবার সাহস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি কোনো পথচারী আমাকে মধেসিয়া বলে সনাক্ত করে ফেলে। যদিও কাঠমাণ্ডুর অধিবাসীরা সব সময় তিব্বতী লোকজন দেখতে এতই অভ্যস্ত যে তারা এ দিকে হয়ত কেউ নজরও করছিল না। নেপালের একজন পরিচিত গৃহস্থ ইতিপূর্বে অনেকবার আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আজ পায়ের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে সেই ভদ্রলোকের শরণ নিলাম। এপ্রিল মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনটি তাঁরই আশ্রয়ে কাটালাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালোমানুষ। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে, আমি ছদ্মবেশী ভারতীয় এবং আমার উদ্দেশ্য, এ দেশের সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিব্বত সীমান্ত অতিক্রম করা। আমার এই যাত্রার পেছনে যত মহৎ উদ্দেশ্যই থাক না কেন, আমার মতো একজনকে আশ্রয় দিলে তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারত। জানাজানি হয়ে গেলে গুরুতর দণ্ড অনিবার্য জেনেও তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই সহৃদতার কথা চিরকাল স্মরণ থাকবে। চতুর্থ দিন রাত্রিবেলা কাঠমাণ্ডু ছেড়ে স্বয়ম্ভূতে এসে ভুক্পা লামার সঙ্গে আবার মিলিত হলাম।

নেপাল রাজ্য

হিমালয়ের বুকে এক বিশাল উপত্যকার নাম নেপাল। কাঠমাণ্ডব বা কাঠমাণ্ডু, পাটন এবং ভাতগাঁও এই তিনটি শহর ছাড়া বহু ছোট ছোট গ্রাম এবং উর্বর জমি বিসারিত এই উপত্যকা। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই দেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। যে পাটনকে অশোক-পট্টন বা ললিত-পট্টনও বলা হয় তা নাকি সম্রাট

অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সে সময় এই অঞ্চলও ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত। নেপালের আধা-ঐতিহাসিক গ্রন্থ স্বয়ম্ভূপুরাণে সম্রাট অশোকের নেপাল যাত্রার বিবরণ আছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারত থেকে এ দেশে আসার জন্য বীরগঞ্জের পথটি চালু হয়। তার আগে লোকে যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ —অনুঃ) ভিখনা-টোরী থেকে পোখরা হয়ে নেপালে আসত। ভারতের সঙ্গে এ দেশের যোগসূত্র প্রাচীন হলেও এদের ভাষা আর্য ভাষা থেকে পৃথক। যদিও নেওয়ারী ভাষা (নেওয়ারী = নেবারী = নেপালী) সংস্কৃত এবং তার উপভাষা সমূহ থেকে প্রভূত শব্দ নিয়েছে তবুও প্রকৃত পক্ষে এ ভাষা তিব্বতী এবং বর্মী ভাষার এক বিবর্তিত রূপ। যদিও ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু লোক এ দেশে এসেছেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বিপুল না হওয়ায় এবং দীর্ঘদিন এ দেশে বসবাস স্থাপন করার ফলে এদের ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন। সংখ্যাধিক্য থাকলে হয়ত পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হতো। যদিও বর্তমানে নেপালের অধিবাসীদের মুখমণ্ডলে মঙ্গোলীয় ছাপ কম তবু ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে চিরকাল তাদের দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তরের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল গভীরতর। সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকালে নেপাল তিব্বতের শাসক সোং-চন-গোম্বাকে তাদের সম্রাট বলে স্বীকার করে নেয়। মুসলমান আমলে উত্তর ভারতের পলাতক রাজবংশের কেউ কেউ কখনও নেপালে রাজত্ব করেছেন।

নেপাল এমনিতেই ছোট দেশ, তার ওপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা যক্ষমল্ল তাঁর সমস্ত রাজ্যকে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, এ দেশকে আরও দুর্বল করে ফেলেন। তখন থেকেই পাটন, কাঠমাণ্ডব এবং ভাতগাঁওতে তিনটি পৃথক রাজত্ব চলতে থাকে। এ দিকে নেপাল উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তের গোর্খা জাতির সিসোদীয় বংশীয়রা ধীরে ধীরে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। ক্রমে তাঁরা নিজেদের সীমানাকে বিস্তৃত করে নেপাল উপত্যকাতেও মাঝে মধ্যে হানা দিতে থাকেন। গোর্খাদের দশম রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ছিলেন দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি নেপালের এই বিভক্তি জনিত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তিনি এক অতর্কিত আক্রমণে অতি সহজেই কাঠমাণ্ডব দখল করে নিলেন। আর তখন থেকেই গোর্খা-বংশীয় শাসন চালু হয়। এর আগে নেপালের যাঁরা শাসক ছিলেন, তাঁরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু এ বার তার পরিবর্তন ঘটল। গোর্খা-বংশীয় শাসক সম্প্রদায় ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তবে শাসক-গোষ্ঠীর ধর্মমত পরিবর্তিত হলেও প্রজাদের ওপর তার প্রভাব বিশেষ পড়েনি। ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যেমন পরমত অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা গেছে, নেপালে কিন্তু তেমনটি কখনও ঘটেনি।

মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ থেকে মহারাজ রাজেন্দ্রবিক্রমশাহ পর্যন্ত নেপালের শাসনভার গোর্খাদের ঠাকুরী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের

১৭ই ডিসেম্বর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নেপালের শাসন পদ্ধতি আবার পাল্টায় এবং সেই পদ্ধতি আজও বহাল রয়েছে (বর্তমানে সেই পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে গেছে —অনুঃ)। এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর ক্ষমতা দখল করেন। অবশ্য জঙ্গবাহাদুর ক্ষমতা দখল করে, রাজসিংহাসনে আরোহণ করেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীই থেকে গেলেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের সমস্ত ক্ষমতাই চলে এল তাঁর হাতে। রাজা পৃথ্বীনারায়ণের বংশ শুধু নামকা-ওয়াস্তে রাজা রইলেন। বাকী যা কিছু ক্ষমতা সবই বংশানুক্রমে জঙ্গবাহাদুরের রাণা বংশের লোকেরাই ভোগ করতে লাগলেন। জঙ্গবাহাদুর রাজসিংহাসনে না বসলেও লোকে তাঁকে মহারাজা জঙ্গবাহাদুর বলেই সম্ভাষণ জানাতেন।

রাণা জঙ্গবাহাদুর রাজবংশের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার লড়াইয়ে তাঁর ভাইদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন। তাই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার সময় তাঁকে ভাইদের কথাও মনে রাখতে হয়েছিল। তিনি নিয়ম চালু করলেন যে, প্রধানমন্ত্রী যাকে লোকে সাধারণভাবে 'তিন সরকার' (শ্রী-৩) এবং মহারাজ সম্বোধন করে, সেই পদ শূন্য হলে তাঁর জীবিত ভাইদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই ঐ পদে আসীন হবেন। ভাইদের পালা শেষ হলে তারপর আসবে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রদের পালা। তাঁদের বেলাও বয়সের দাবিই আগে। রাণা জঙ্গবাহাদুরের পর তাঁর ভাই উদীপসিংহ (১৮৭৭-৮৪ খৃঃ.) 'তিন সরকার' পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর শাসনকালেই কিছু 'প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র' ঘটে যায়, যার ফলে রাণা উদীপসিংহকে নেপালের 'তিন সরকার' পদ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। ওই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য-নায়কেরা ছিলেন জঙ্গবাহাদুরের পুত্রেরা। অতঃপর ক্ষমতায় এলেন উদীপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরসামশের (১৮৮৪-১৯০১খৃঃ.)। তিনি তাঁর পিতৃব্যকে গুলি করে ক্ষমতা দখল করেন। তারপর দেবসামশের মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করে ভারতে পলায়ন করতে বাধ্য হন এবং চন্দ্রসামশের ক্ষমতায় আসেন। তাঁর 'তিন সরকার'-এর মেয়াদ ছিল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত।

নেপালের শাসন-ক্ষমতা নিয়ে এত টানাপোড়েনের মধ্যে কিন্তু রাজা পৃথ্বীনারায়ণের বংশধরদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। যদিও কাগজে কলমে তাঁরাই ছিলেন নেপালের রাজা। আগেই বলেছি যে রাজারা ছিলেন নামে রাজা, প্রকৃত ক্ষমতা যা কিছু, তা সবই প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী ধাপে যাঁর স্থান তিনি হলেন চীফ সাহেব বা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ। এর পরের স্থান লাটসাহেব বা ফৌজী লাটের, তারপর চার জেনারেলের স্থান। মোটামুটি এরাই দেশের শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। রাণা জঙ্গবাহাদুর কিম্বা তাঁর ভাইদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন প্রতিটি শিশুই একদিন প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করবে, এমন আশা পোষণ করতে পারে। তবে বর্তমানে এই পদাভিলাষীদের

সংখ্যা শতাধিক হয়ে যাবার ফলে, আশা পূরণে কিঞ্চিৎ বিপত্তি দেখা দিয়েছে, এবং এই বিপত্তি থেকেই একদিন এই ব্যবস্থার বিনাশও ঘটবে। (লেখকের এই ভবিষ্যৎ-বাণী যে কতদূর সঠিক ছিল পরবর্তী কালে নেপালের রাণাশাহীর পতন এবং রাজবংশের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে —অনুঃ)।

নেপালের শাসন-ব্যবস্থাকে এক ধরনের সামরিক শাসন বলা চলে। এখানে রাণা বংশের পুত্রেরা জন্মেই জেনারেল হয়। যদিও মহারাজা চন্দ্রসামশের এই ব্যবস্থা বজায় রাখাতে খুব উৎসাহী নন, তবুও এই নিয়ম একেবারে রদ করার সাহস তাঁরও হয়নি। এই পরিবারের শিশুরা একটু বড় হলেই বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। যোগ্যতা তো ওই একটা, রাণা জঙ্গবাহাদুরের বংশে জন্ম। ছিটেফোঁটা সামরিক জ্ঞান ছাড়াই অনায়াসে কেউ হাজারি মনসবদার (জেনারেল) হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবারের বিশাল ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্র। অথচ বিনিময়ে এদের অধিকাংশের কাছ থেকে রাষ্ট্র কিছুই পায় না। বহুবিবাহ প্রথার ফলে এই বংশের সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছেই এবং এভাবেই যদি এরা বাড়তে থাকে তবে সে দিন আর বেশী দূরে নেই, যে দিন এদের সংখ্যা সহস্রাধিক হয়ে যাবে। যদিও মহারাজ চন্দ্রসামশের তাঁর নিজের সন্তানদের লেখাপড়ার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কিছু কিছু ভাই সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিজ সন্তানদের মতোই। কিন্তু যতই হোক না কেন, তাঁর পক্ষেও এই শতাধিক জেনারেলের সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এদের ভাবগতিক দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই ব্যবস্থা এ দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

নেপালের এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর সম্যক জানা না থাকায় অনেক হিন্দু এই দেশ সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা হয়ত এ কথা জানেন না যে, নেপালের প্রজাদের সেটুকু অধিকারও নেই, যেটুকু অধিকার ভারতের সবচেয়ে কুশাসিত দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আছে। রাষ্ট্রের শক্তির উৎস তার জনগণ, নেপালে সেই উৎস একেবারেই শুষ্ক বললে ভুল হয় না। কারণ জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামান্যতম প্রতিফলনও এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় না। যে 'তিন সরকার' শাসন-ব্যবস্থার ওপর নেপালের জনগণের ভাগ্য নির্ভরশীল, তার অধিকাংশ পদাধিকারীই হলো অশিক্ষিত এবং তারা বে-পরোয়া অমিতব্যয়িতার স্রোতে গা ভাসিয়ে, বর্তমানে দেশকে চরম আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। দু'একজন ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তারা তো আর উদাহরণ হতে পারে না। রাণা বংশের শতাধিক জীবিত বংশধরের অধিকাংশেরই ওই একই হাল। এ রকম অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার জন্যই এখানকার শাসকদের প্রাণ সতত শঙ্কিত। এখানকার জনসাধারণের মধ্যে একটা কথা খুব প্রচলিত, যে নেপালের 'তিন সরকার' পদের প্রকৃত মূল্য একটি বুলেট। মহারাজ জঙ্গবাহাদুর ওই মূল্য দিয়েই প্রথম এই পদটি কেনেন, পরবর্তী কালে তাঁর

বংশধরেরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। যদিও কেউ দৈবানুগ্রহে বুলেটের হাত থেকে বাঁচলেন, কিন্তু অবিরাম চারপাশের কুটিল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাবেন কি করে? এই ষড়যন্ত্র রাণা উদীপসিংহকে দেশ-ছাড়া করেছে। রাণা দেবসামশেরকে মাত্র কয়েকমাস 'তিন সরকার' পদে টিঁকতে দিয়েছে। তাই ক্ষমতায় এসে প্রত্যেকেই নিজ পরিবার পরিজনের জন্য যতটা সম্ভব ধনসম্পদ মজুত করে সাবধানে নেপাল রাজ্যের বাইরে পাচার করেন। দেশে রাখলে তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধনসম্পদও বেদখল হয়ে যাবার ভয় থাকে।

পারিবারিক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 'তিন সরকার' পদপ্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। তার ফলে সুদিনের আসা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। যদি রাণা বংশের ছেলেদের দেশ-বিদেশে পাঠিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হতো, যদি নেপাল সরকার বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রে এদের রাষ্ট্রদূত করে পাঠাতে পারতেন, তা'হলে এই বেকার বসে থাকা রাণা সন্তানেরা করবার মতো কিছু কাজ পেত, আর তাতে এ দেশে 'প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র' কিছু কম হতো বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা, ভোগ বিলাসের প্রতি রাণা সন্তানদের প্রচুর আগ্রহ থাকলেও, লেখাপড়া শিখবার জন্য বিদেশ যেতে এদের প্রচণ্ড অনীহা। সব কিছু ছেড়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতেই যেন এদের বেশী আগ্রহ। এরপর যখন এদের হুঁস হবে তখন হয়ত আর করার কিছু থাকবে না।

নেপালের এই ডামাডোল অবস্থায় যদি কেউ খুশী হয়ে থাকে তো সে ইংরেজ। তারা জানে যে এ দেশের প্রজারা রাজশক্তির দ্বারা স্বীকৃত নয়। অধিরাজা নামে মাত্র রাজা, নিছক লোক দেখানো। প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী 'তিন সরকার', আপন আত্মীয়দের চালা দাবার কূট চাল থেকে আত্মরক্ষায় সদাই ব্যস্ত। তার ফলে গোটা দেশটা সামরিক-ছাঁচের জাতি অধ্যুষিত হয়েও শক্তিহীন। যদিও কাঠমাণ্ডুর পথে-ঘাটে কর্নেল, জর্নেলদের ছড়াছড়ি, তাদের অধিকাংশই তো এই খেতাব লাভ করেছে শৈশবে দোলনায় শুয়ে শুয়ে। তাই দেশ রক্ষার ব্যাপারে এইসব স্বয়ম্ভু সমরবিশারদদের দাম এক কানা কড়িও নয়। ইংরেজরা এটা খুব ভালো করেই জানে তাই এই দেশ এখনও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে কোনো ক্রমে টিঁকে আছে। অন্যথায় তারা এ দেশকেও তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে ফেলত, যেমনটি তারা করেছে কাশ্মীরকে, তার রাজতন্ত্র বজায় রেখে। এ রকম একটা সমরপটু স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হতো। সে কারণেই ইংরেজরা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নেপালকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত বৃটিশ রেসিডেন্টের নাম পরিবর্তন করে এনভয় (রাষ্ট্রদূত) করে দিয়েছে।

য়ল্মোর পথে

কিন্দু জায়গাটি স্বয়ম্ভূর খুবই কাছাকাছি। হাল আমলে এখানে একটা বিহার তৈরি করা হয়েছে। ডুক্পা লামার এখানেই কয়েকদিন অবস্থান করার কথা। ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে আমি কিন্দুতে উপস্থিত হলাম। ডুক্পা লামা আমাকে তাঁর নিজের কাছেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমে তো এ হেন সৌভাগ্যে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু একদিন পরেই মনে হলো, আস্তানাটা পাণ্টানো প্রয়োজন। লামার কাছে দিনরাত হরেক রকম লোকের আনাগোনা। তা'ছাড়া শুনতে পেলাম আরও একজন তিব্বতযাত্রী সন্ন্যাসী এখানে এসেছিলেন এবং ডুক্পা লামার শিষ্যরা তাঁর কাছে সাড়ম্বরে আমার সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছে। আস্তানা পাণ্টাবার পরও সেই সন্ন্যাসী একদিন আমার খোঁজ করতে এলেন। ওঁর আর কি, উনি যাচ্ছেন রাজ সরকারের অনুমতি নিয়ে বৈধ পথে, ওঁর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতার ফলে যদি কোনো রাজকর্মচারীর দৃষ্টিতে পড়ে যাই তবে তো আমার সব আশা নির্মূল হবে। পত্রপাঠ এখান থেকে বিদায় করে রক্সৌল পাঠিয়ে দেবে।

খোঁজ-খবর করে এমন একজনকে পেয়ে গেলাম, যে আমাকে এখান থেকে স্বল্প দূরে আলাদা একটা বাসার বন্দোবস্ত করে দেবে বলে কথা দিলো। এখন সারাদিন কুঠরিতে একা একা কাটাই। আর রাত হলে নিত্যকর্মাদি সারার জন্যে বাইরে যাই। এ রকম একা একটা ঘরে দিন কাটানোর অভ্যেসটা হাজারীবাগ জেলে দু'বছর থেকে আগেই করে নিয়েছিলাম। মনের মধ্যে একটাই চিন্তা, এত দূরে এসে যেন তরী না ডোবে। কোনো ক্রমেই যেন পরিচয় ফাঁস না হয়। আমার এ রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে এল আর এক দুঃসংবাদ। ডুক্পা লামা এখানে তাঁর অবস্থানের সময়সীমা আরও বাড়িয়েছেন। সময় বাড়াবার কারণ এখানকার লোকের ভক্তিভাব বেশ প্রবল। আশাতিরিক্ত পূজা পড়ছে। এত ভক্তিমান লোকের আনাগোণাতে আমি তো প্রমাদ গুণছি। ডুক্পা লামার কাছে যা আনন্দের, আমার কাছে সেটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে আমি একাই এগিয়ে যাব। এগিয়ে য়ল্মোতে গিয়ে থাকব। ডুক্পা লামার ওখানে যাবার কথা আছে, তখন ওঁর সঙ্গে মিলিত হতে কোনোই অসুবিধা হবে না।

আমার বন্ধুটি অনেক চেষ্টা করেও আমার পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করার জন্য কোনো য়ল্মোবাসীকে যোগাড় করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি নিজেই আমাকে য়ল্মো পর্যন্ত পৌছে দিতে প্রস্তুত হলেন। এপ্রিলের ৮ তারিখে, রাত থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেলো। এর আগের বার নেপালে এসে স্বয়ম্ভূ দর্শন

করেছিলাম বলে, এ বার ওটা বাদ দিলাম। স্বয়ম্ভু নেপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধমন্দির। কাঠমাণ্ডু আসার পথে চন্দ্রাগদী থেকে এর চূড়া দেখা যায়। বর্তমান মন্দির দুটিকে যত প্রাচীন বলে স্বয়ম্ভূপুরাণে বর্ণিত আছে, দুটি মন্দিরের কোনোটিই অত প্রাচীন নয়। তা'হলেও স্থানটি খুবই মনোরম। কয়েক বছর আগে এর একদফা সংস্কার করা হয়েছে। স্বয়ম্ভুকে পরিক্রমা করে, শহরের বাইরের পথ ধরে রওনা হলাম য়ল্মোর উদ্দেশে। কিছু দূর পর্যন্ত রজ্জুপথের খুঁটি ধরে ধরে চললাম। এই খুঁটিগুলো হাজার হাজার বেকার হয়ে যাওয়া মালবাহী কুলি পরিবারের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। আমাদের পথটি গেছে বৃটিশ রেসিডেন্সীর পাশ ঘেঁসে। জায়গাটা শহরের বাইরে একটা টিলার ওপরে অবস্থিত। রেসিডেন্সীর বিরাট বাগানে অনেক যত্নে লাগানো সুন্দর সব গাছগাছালির মেলা। কিছু দূর এগিয়ে একজন পথচারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তাকে আমাদের সঙ্গে অন্তত সুন্দরীজল পর্যন্ত যেতে অনুরোধ জানালাম এবং এর জন্য মজুরীও কবুল করলাম। লোকটি ঘরে বলে আসার ছুতোয় সেই যে গেলো আর ফিরল না। অনর্থক ঠাণ্ডার মধ্যে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম।

আমার পোশাকের বর্ণনাটা এই ফাঁকে একটু দিয়ে নিই। য়ল্মো পর্যন্ত যাবার জন্য ভোটীয় পোশাকের বদলে নেপালী পোশাক পরাই আমার পক্ষে ঠিক হবে মনে করে, নেপালী বগলবন্দী তার ওপর কালো কোট, নীচে পাজামা, মাথায় সাবেকী আমলের নেপালী টুপী। গায়ে এ দেশের ফলাহারী জুতো (কাপড় এবং রবারের সংমিশ্রণে তৈরি, অনেকটা কেড্‌স্ জাতীয়)। এর ওপর আবার চোখে কালো চশমা চড়িয়ে নিয়েছি। তবে বাইরে যতই নেপালী সাজি না কেন, মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা লেগেই রইল। বস্তুত রাস্তায় বেরিয়ে আমার মনে হলো এ দেশে ছদ্মবেশের পক্ষে নেপালী পোশাকের চেয়ে ভোটীয় পোশাকই বেশী ভালো। পথে এক জায়গায় একটা পুলিশ চৌকী পড়ল। তবে ভাগ্য ভালো থাকায় কোনো জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হলো না। কাঠমাণ্ডুতে ঘোড়দৌড় থাকায়, চৌকীর সব পুলিশই গেছে ঘোড়দৌড় দেখতে।

একে তো নতুন জুতোর কল্যাণে পা জখম হয়ে আছে, তার ওপর মাসখানেক বেকার বসে কাটানোর ফলে হাঁটার শক্তি অনেক কমে গেছে। যা হাঁটছি তা শুধু মনের জোরেই। কাঠমাণ্ডু থেকে সুন্দরীজল পর্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে, তবে বর্তমানে এ পথে একটা ছোট সেতু ভেঙে যাবার ফলে বাস চলাচল বন্ধ আছে। পথের পাশে এক জায়গায় পাথুরে কয়লার সাহায্যে ইটের পাঁজা পোড়ানো হচ্ছে দেখলাম। এ সেই কয়লা, ছ'বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আমি নিজের হাতে এই কয়লা জ্বালিয়ে জনৈক রাজকর্মচারীকে অবাক করে দিয়েছিলাম। তখন লোকে কয়লাকে ঈশ্বরের দেওয়া সার এই বলেই জানত, জ্বালানী হিসেবে এর ব্যবহার ছিল অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে নেপালের

ভূমি রত্নগর্ভা, নানা প্রকার ধাতু ও খনিজে পরিপূর্ণ এবং জমিও উৎকৃষ্ট শস্য, ফুল, ফলের উপযুক্ত, কিন্তু সে দিকে নজর দেয় কে ?

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা সুন্দরীজল পৌঁছালাম। এখান থেকে পাইপে করে কাঠমাণ্ডুতে জল সরবরাহ করা হয়। এই জলের পাইপ লাইন আমরা সুন্দরীজলের খানিক আগে জেনারেল মোহনসামশেরের প্রাসাদের কাছেই প্রথম দেখতে পাই। মহারাজ চন্দ্রসামশের তাঁর প্রত্যেক ছেলের জন্য আলাদা আলাদা মহল তৈরি করে দিয়েছেন। বাড়ি তৈরি করা তাঁর একটা সখ ছিল। নিজের মহলটিকেও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেই তৈরি করিয়েছিলেন। লোকে বলে এটি তৈরি করতে নাকি এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী কালে মহলটিকে তিনি রাজসরকারে দান করেছেন। তাঁর ছটি পুত্র সন্তান এবং প্রত্যেকেরই আলাদা বাড়ি আছে। ভাবলাম এ রকমটি যদি চলতে থাকে তা'হলে আগামী দিনে কোনো এক সময়ে সারা নেপালে চাষ আবাদ ইত্যাদির জন্য আর কোনো জমি থাকবে না। সমস্ত উপত্যকাই 'তিন সরকারে'র বংশধরদের মহল তৈরির জন্য লেগে যাবে। আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিল্প নৈপুণ্যহীন, বিদেশী ঢঙে কতকগুলো ইট-পাথরের স্তূপ তৈরি হবে।

সুন্দরীজলের পর থেকেই চড়াই শুরু। এতক্ষণ তো সমতল মাঠের পথ ধরে এসেছি, এ বার চড়াই ভাঙতে গিয়ে কাজটা যে কত কঠিন তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করলাম। তবে ভাগ্য ভালো, পথেই বেশ তাগড়া যোয়ান গোছের একজন তমং সম্প্রদায়ের মজুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। চার দিনের জন্য তাকে নেপালী আট মোহরে (তিন টাকার সামান্য কিছু বেশী) কাজে নিযুক্ত করলাম। কথা হলো যে প্রয়োজন হলে পরে সে আমাকেও বহন করবে। লোকটি খুব বলিষ্ঠ এবং সাধারণ গোর্খাদের চেয়ে বেশ লম্বা। আবার আমাদের চলা শুরু হলো। নীচের পথ ছেড়ে ওপরের পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। যদিও নীচের রাস্তাটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম কষ্টের, কিন্তু সে পথে গুটিকয় পুলিশ চৌকী পড়ে জেনে অধিক কষ্টের পথই বেছে নিলাম। চারদিকে ঘন সবুজ অরণ্যানী, তার মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে পাকদণ্ডী ধরে চলা। নিরাপত্তার আশাতেই এ পথে চলা, তাই কষ্ট হলেও মেনে নিতেই হবে। লাগাতার চড়াই ভেঙে সন্ধ্যাবেলা একটা গ্রামে পৌঁছালাম। উচ্চতার জন্য এ অঞ্চলে এখনও বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করছিলাম। নেপালের পাহাড়ী পথে, সর্বত্রই ছোট-খাট দোকান-পাট দেখা যায়, যেখানে খাবার অথবা খাবার তৈরির জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়।

আমার অবশ্য সারাদিনের হাঁটার ক্লান্তিতে, ঘুমকেই সব চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের কাছে এ কিছুই না। তারা এতটা পথ হেঁটে এসেও দিব্যি খাবার তৈরি করল।

ভোরে উঠে আবার রওনা হলাম। এখনও বহু চড়াইয়ের পথ সামনে

পড়ে আছে। পাহাড়ের এই উচ্চতম অঞ্চলেও কোনো কোনো জায়গায় চাষ আবাদের কাজ চলছে, দেখা যাচ্ছে। কোথাও জঙ্গল কেটে নতুন বসতি গড়ার উদ্যোগ চলছে। নেপালে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দার্জিলিং এবং আসাম অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ নেপালীর পুনর্বাসন হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমানে যে বাসযোগ্য জমি এ দেশে আছে তা এ দেশের জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই নতুন নতুন জমি উদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং সেই কারণেই নির্মম-ভাবে জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে। অথচ এর পরিণাম ভয়াবহ। অরণ্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, তা'ছাড়া বৃষ্টিপাতের সঙ্গেও এর গভীর সম্পর্ক আছে। এটা এ অঞ্চলে প্রায়শঃই দেখা গিয়েছে যে নির্বিচারে জঙ্গল কাটার পর সে অঞ্চলের বা তার আশপাশের প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার স্রোত আগের তুলনায় অনেক ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। পাহাড়গুলোও বৃষ্টির অভাবে গাছপালাশূন্য ন্যাড়া পাহাড়ে পরিণত হচ্ছে।

দুপুর নাগাদ আমরা পাহাড়ের পাকদণ্ডীর ফাঁকে প্রায় লুকিয়ে থাকা ছোট একটা গ্রামে বিশ্রামের জন্য থামলাম। সুন্দরীজলের ওপর দিকে তমংদের দেশের শুরু। বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর গোর্খা রেজিমেণ্টে তমং সিপাহীদের ভালো চাহিদা আছে। তমংদের চেহারার সঙ্গে তিব্বতীদের চেহারার একটা মিল আছে। তা'ছাড়া উভয়ের ভাষার মধ্যে মিলও লক্ষণীয়। তমংরা ধর্মে বৌদ্ধ, তবে অবস্থা দেখে মনে হয় আর বেশী দিন বোধ হয় এরা বৌদ্ধধর্মে আস্থা রাখবে না। আমাদের সঙ্গী তমংটির কথায় জানলাম যে, ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটলে তার ক্রিয়া কর্মাদির জন্য ওরা লামা ডাকে, আবার বিজয়া দশমীতে পান-ভোজনে ওরা পুরোপুরি শাক্ত। যাই হোক এই ছোট গ্রামেও একটা টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি চোখে পড়ল। শুনলাম বৌদ্ধ তমংদের ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য এক সন্ন্যাসী নাকি কিছুদিন ঐ বাড়িটিতে বাস করেছিলেন। বিশ্রামের পর আমরা আবার চলা শুরু করলাম। দেখতে দেখতে পাহাড়ের প্রথম স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে পৌছালাম। এখানে রাস্তার ধারে ধারে অনেকগুলো মাণী চোখে পড়ল (পাথরে মন্ত্র উৎকীর্ণ করে, সেই পাথরের দ্বারা নির্মিত স্তূপ। বজ্রযান অর্থাৎ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের তিব্বতী ভাষায় শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হলো "ওঁ মনিপদ্মে হুঁ"। এই মন্ত্র যেখানে লেখা বা উৎকীর্ণ থাকে তাকেই মাণী বলা হয়। এর অনেক রকম রূপ আছে)। মাণীগুলোকে দেখে মনে হলো, নির্মাণের পর থেকে এগুলো এক রকম উপেক্ষিত হয়েই পড়ে আছে।

রাত কাটল ছোট একটা ঝুপড়িতে। এর পরের পথ উৎরাইয়ের পথ। এমনিতেই কয়েকদিন ক্রমাগত হাঁটার ফলে পায়ের এবং মনের জোর ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। তা'ছাড়া পথও উৎরাইয়ের, তাই সকলের সঙ্গে হাঁটছিলাম। নীচে নদীর পারে এসে যখন পৌছালাম, তখন সকাল আটটা। নদী পার হয়ে

এই নদীর তীর ঘেঁসেই চলতে থাকলাম। কিছু দূর চলার পর যেখানে থামলাম, সেখানে আর একটি নদী এসে এই নদীটির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কয়েকটি দোকান দেখতে পেয়ে সেখান থেকে আহার্য সংগ্রহ করা হলো। দুপুরবেলা একটা গ্রামে উপস্থিত হলাম। গ্রামটির প্রবেশ-মুখেই বিরাট বিরাট বট এবং অশ্বত্থ গাছের সারি। কিন্তু শীতের প্রকোপে সেগুলো প্রায় পত্রহীন। তবে এগুলোও যে বিভিন্ন সময়ে পূজিত হয়েছে তা গাছগুলোর গোড়া দেখেই বুঝলাম। খানিকটা চড়াই ভেঙে এগোলেই য়ল্মো অঞ্চল। নীচের ভাগ অপেক্ষাকৃত গরম এবং অরণ্যহীন হওয়ায় য়ল্মোবাসীরা ওপরের ভাগকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ তাদের চমরী গাই এবং ভেড়া চরাবার জন্য অরণ্যের প্রয়োজন অপরিহার্য।

যে ঘরে বসে আমরা আমাদের খাবার তৈরি করলাম, সে ঘরটির মালিক একজন ক্ষেত্রী। নেপালে এখনও মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত। ক্ষত্রিয়রা তাদের চেয়ে নীচু জাতির কন্যা বিবাহ করতে পারে, সে ক্ষেত্রে ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানেরা হবে ক্ষেত্রী। এভাবে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মিলনসঞ্জাত সন্তান হবে যোশী। অবশ্য তারপর কয়েক পর্যায় অতিক্রম করে আবার তারা ব্রাহ্মণত্ব ফিরে পায়।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা আসল য়ল্মো ভূমিতে পদার্পণ করলাম। চেহারা, কথাবার্তায় এরা প্রায় তিব্বতী বললেই চলে। এদের গায়ের রঙ গোলাপী এবং দেখতেও খুবই সুন্দর। এই কারণে এদের ঘরের মেয়েদের নেপালের রাজ-পরিবারে রক্ষিতা হিসাবে খুব চাহিদা। এখানেই রাত্রিটা কোনো ক্রমে কাটল। ডাঁশের আক্রমণে ঘুমোবার কথা ভাবারও অবসর পেলাম না। তবে আগামী কাল আপাতঅভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাব এই আনন্দে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়তে হলো, কারণ আজ আবার চড়াই ভাঙতে হবে। ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পর গভীর অরণ্য পেলাম। এখানে জঙ্গলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় চাষের জমি। জমিতে গম বোনা হয়েছে, তবে তাতে এখনও দানা আসেনি। দুপুর বেলার খাবারে আলুর দেখা পাওয়া গেলো। খাওয়ার পর আবার চলা শুরু করে যেই মাত্র পাহাড়ের বাঁক অতিক্রম করলাম অমনি যেন নিমেষে আমার চোখের সামনের সমস্ত দৃশ্যপট পাল্টে গেলো। চার-দিকে আকাশছোঁয়া সরল, সবুজ দেবদারু গাছের মেলা। নীচের উপত্যকায় আবাদী জমির শ্যামল শোভা, সর্বত্র যেন প্রকৃতি তার অবদান উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। এখানকার আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ১১ই এপ্রিল বেলা তিনটের সময় আমার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত য়ল্মো ভূমির একটি গ্রামে এসে পৌছালাম। গ্রামের প্রবেশ-পথের মুখে জলস্রোতে চালিত মাণী ঘুরছে দেখতে পেলাম। (এ ধরনের মাণী হচ্ছে একটি কাঠের ফাঁপা নল যার মধ্যে মন্ত্রপূত কাগজ ভরে

দেওয়া হয়। তার পর নলটিকে জলস্রোতে এমনভাবে রাখা হয় যাতে ওটি সহজেই স্রোতের শক্তিতে ঘুরতে পারে। প্রতিটি ঘূর্ণনই নাকি পুণ্য পয়দা করে)।

পুনরায় ডুক্‌পা লামার খোঁজে

য়ল্মো নদীর তীরে পাহাড়ের ওপরিভাগে য়ল্মোদের বাস। এদের পুরুষেরা নেপালী পোশাক পরে কিন্তু মেয়েরা পরে তিব্বতী পোশাক। বস্তুত এদের ভাষা, বেশ-ভূষা, আহার, ব্যবহার সবই যত না নেপালী তার চেয়ে অনেক বেশী তিব্বতী। অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে এরা তিব্বতীদের তুলনায় অনেক বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এরা হাত-মুখ ধোয়ার ব্যাপারে আমাদের মতোই।

যে গ্রামটিতে আমাদের আশ্রয়, সেটি বেশ বড়। প্রায় একশো ঘর বাসিন্দা রয়েছে এখানে। সমস্ত বাড়িরই ছাদ কাঠের তৈরি। পাশেই দেবদারু গাছের প্রচুর সঞ্চয় থাকায় এ গ্রামে কাঠের অভাব নেই। বাড়িগুলো অধিকাংশই দোতলা কিম্বা তিনতলা। একতলার ঘরে থাকে কাঠের গাদা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। এক কথায় গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয় একতলাকে। গৃহপালিত পশুদের থাকার জায়গাও এই একতলা। শীতকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে বিচরণ করে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েও এখানে এসে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। পাহাড়ের ওপরের দিকে এখনও বরফ জমে থাকতে দেখলাম। শুনলাম, বৈশাখ মাসেও ওখানে বরফ জমে থাকে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মভাব বেশ প্রবল। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনেই দেখলাম নানা রকমের মন্ত্রতন্ত্র ছাপানো সাদা কাপড়ের পতাকা দেবদারু গাছের খুঁটিতে আটকানো। চারদিকের বাড়ি ঘর, লোকজন, ক্ষেত-খামার, পশুপালন ইত্যাদি দেখলে মনে হয় য়ল্মোবাসীরা অন্যান্য নেপালীদের চেয়ে সুখে আছে। তবে চাষ-আবাদের চেয়ে এরা ছাগল, ভেড়া আর চমরী পালনটাই বেশী পছন্দ করে। শীতকালে সমস্ত পশুরা গ্রামে থাকে। শীত কমে গেলে যেখানে পছন্দ মতো চারণক্ষেত্র দেখতে পায় সেখানেই অস্থায়ী আস্তানা পাতে। গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে একজন করে লোক গিয়ে সেই আস্তানায় বাস করে। সঙ্গে থাকে গ্রামের সমস্ত পশু আর পাহারার জন্য পাহাড়ী কুকুর। মাখন মেশানো চা এবং সত্তু (ছাতু) এদের প্রধান খাদ্য।

এখানে এসেই আমি আমার সেই ভোটীয় ছুপা এবং জুতো আবার পরে নিয়েছি। আশ্রয় নিয়েছি একজন য়ল্মোবাসী তিব্বতীর বাড়িতে। আমার সঙ্গী নেপালী বন্ধুটি পরের দিন ফিরে গেলেন। শুনলাম এখান থেকে চার দিনের পথ হাঁটলে কুতীতে পৌছানো যায়। সেখান থেকে কোরোং আবার চার দিনের পথ। দুটো জায়গাই ভোট (তিব্বত) দেশের মধ্যে। কাঠমাণ্ডুর মতো এখানে ঘোরা-ফেরায় বাধা নেই। সময় কাটাবার জন্য তিব্বতী বইপত্র পড়ি। এরি

মধ্যে দেখি কেউ কেউ হাত দেখতে কিম্বা ভবিষ্যৎ জানতে আমার কাছে আসতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য এদের সবাইকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো। এখানে দেখলাম ওষুধ দেওয়া, ভবিষ্যৎ গণনা করা এবং মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করা এই ত্রিবিধ বিদ্যার খুব সমাদর। এ সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শীদের সম্মান প্রায় রাজকীয়।

আমি এখানে পৌঁছাবার তিন দিন পর ডুক্‌পা লামার শিষ্য-শিষ্যার দল এসে পড়ল। এখনও তাদের নাকি কয়েক হাজার বই ছাপা বাকী আছে। তাদের কাছেই খবর পেলাম যে মহামান্য ডুক্‌পা লামাও কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে উপস্থিত হবেন। লামার শিষ্য-শিষ্যারা গ্রামের মধ্যে ঠাঁই না নিয়ে গ্রামের বাইরে একটু দূরে একটা বড় বিহারে আস্তানা নিল। আমিও আমার গ্রামের আশ্রয় ছেড়ে তাদের সঙ্গে বিহারে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। উদ্দেশ্য ওদের সঙ্গে থেকে তিব্বতী ভাষাটা যতটা পারা যায় রপ্ত করে নেওয়া। এখানে এসে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলেই কিনা জানি না, কয়েকদিন অল্প জ্বরে ভুগলাম। তার পর বিনা ওষুধেই আপনা থেকে সেরে উঠলাম। রোজ সকালে উঠেই লামার শিষ্যরা বই ছাপা কিম্বা কাগজ ভাঁজ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত, আর আমি বসতাম 'টিবেটান ম্যানুয়্যাল' নিয়ে। আটটা নাগাদ থুক্‌পা (লেই) তৈরি হয়ে যেত। আমরা প্রত্যেকেই তিন-চার পেয়ালা তা পান করতাম। এই থুক্‌পা সাধারণত মকাই, জোয়ার কিম্বা যবের সত্তু গরম জলে সেদ্ধ করে তৈরি হতো। কখনও কখনও এর মধ্যে স্থানীয় জঙ্গলের শাক-সব্জিও মেশানো হয়, আর তার সঙ্গে দেওয়া হয় সামান্য নুন। দুপুরের আহার ছিল সত্তু তবে একটু বেশী গাঢ় করে তৈরি। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আবার ঐ থুক্‌পা। এই ছিল আমাদের রোজকার আহার। সত্তুর মধ্যে মকাইয়ের ব্যবহারই ছিল বেশী। এরা মকাইয়ের সত্তুর নাম দিয়েছে গ্যগর-চম্পা অর্থাৎ ভারতীয় সত্তু। আমি এই নাম নিয়ে মাঝে মাঝে এদের ঠাট্টা করতাম।

এখানে এই অল্প কয়েকদিন থাকার মধ্যেই আমার একটি বন্ধু (রোক্‌পো) জুটে গেলো। বন্ধুটির বয়স বছর পাঁচেক হবে, নাম তিনজিন অর্থাৎ সমাধি। তিনজিনের কাছে আমি কথ্য ভাষা শিখতাম। অনেক সময় ও আমার ভুল শুধরে দিত। বিহারে থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই গ্যগর চম্পার ওপর ভক্তি উবে গেলো। তাই গ্রামে গিয়ে মাখন, চাল এবং যবের সত্তু যোগাড় করে আনলাম। খাবার সময় আমার বন্ধু এবং শিক্ষক তিনজিন অবশ্যই উপস্থিত থাকত। এ সময়টা জংলী স্ট্রবেরী পাকবার সময়। আমি রোজই এগুলো খানিক সংগ্রহ করে আনতাম। আমার বন্ধুটিও এতে বেশ খুশী হতো। তিনজিনের আর একটা পরিচয়, ও হলো ডুক্‌পা লামার খুড়তুত বোনের ছেলে। এক মাস ও আর আমি কাছাকাছি থাকার ফলে, আমি যেন এক মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। পরে যখন এখান থেকে চলে যাই তখন ওকে ছেড়ে যেতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

এখানে বড় বেশী কুকুরের উৎপাত। ওদের ভয়ে ইচ্ছেমতো গ্রামে যাওয়া বা পশুপালকদের ডেরায় যাওয়া প্রায় বন্ধ হবার মতো অবস্থা। গ্রামে পারতপক্ষে হয়ত এক-আধ বার যাই, তাও খুব সতর্ক হয়ে। তার বদলে পাহাড়ের নীচে কিম্বা ওপরে বহু দূর পর্যন্ত বেড়াতে যেতাম। দূরে সমতল ভূমিতে কিম্বা পাহাড়ের ধাপে ধাপে গমের ক্ষেত। গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে এবং বাতাসের স্পর্শে শীষ-গুলোতে যেন ঢেউ খেলছে। গম পাকতে এখনও মাসখানেক বাকী। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য এখানে ধান বা মকাইয়ের ফলন হয় না, আলু প্রচুর জন্মায় তবে সম্প্রতি বোনা হয়েছে বলে আমার কপালে জুটল না। কখনও কখনও পুরানো আলু বা গত বছরের রাখা মূলো তরকারী রাঁধার জন্য পেয়ে গেছি। ভুক্‌পা লামার শিষ্যরাও কয়েকদিনের মধ্যে আমারই মতো মকাইয়ের সত্তুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। একদিন খবর পাওয়া গেলো মাইল পাঁচেক দূরের কোনো এক গ্রামে নাকি একটা বলদ মারা গেছে। শুনেই তো ওদের দু'চার জন উৎসাহে লাফিয়ে উঠে চলে গেলো সেই গ্রামে। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর তারা শূন্য হাতেই ফিরে এল। শুনলাম মৃত বলদটির জন্য সাত টাকা দাম চেয়েছে তাও সেটা একটা রুগ্ন, চর্বিহীন বলদ। বেচারীদের অনেক দিন পর আশ মিটিয়ে মাংস খাওয়ার ইচ্ছা অপূর্ণই রইল। কিছুদিন পর দেখি ওরা মকাই ভেজে খাওয়া এবং চায়ে মাখনের বদলে সরষের তেল ব্যবহার করা শুরু করেছে। মাখনের দাম বেশী হওয়ায় ওরা এই বিকল্পটি আবিষ্কার করেছে। আমি সন্ধ্যার পর সাধারণত কিছু খাই না, তবু আমার অবস্থা ওদের মতো শোচনীয় নয়।

আমাদের বিহার থেকে প্রায় এক মাইল ওপরে, ঘন দেবদারু গাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা কুটির ছিল। এক লামা নাকি বহু দিন ধরে সেখানে বাস করছেন। এই সমস্ত লামারা সাধারণত লোকবসতির বাইরে বাস করেন। এঁদের এই একান্ত বাসের দিন, সময়, আগে থেকে নির্ধারিত থাকে। দূর থেকে ছোট্ট, সাদা কুটিরটিকে বেশ দেখতে লাগত। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকলে বেশ হতো। পরক্ষণেই মনে হতো এই তো বেশ আছি লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে, কি দরকার সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার সাধে। গ্রামের ওপরের দিকে একজন খাম্পা (খাম: চীনের সীমানার কাছাকাছি তিব্বতী অঞ্চল) লামা অনেক দিন ধরে আছেন। একদিন তিনি আমাদের বিহারে নিজেই এলেন আলাপ পরিচয় করতে। আমাকে তাঁর ওখানে যাবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। এখন আমাদের বিহার বা গুম্ফাটির একটু বর্ণনা দিই। আমার থাকবার জায়গা হচ্ছে নীচের তলার প্রধান দেবালয়ে। আমার সামনেই এক রক্তপায়ী, অস্ত্রচর্বণকারী, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো রক্তচক্ষু এক মাটির মূর্তি। এ ছাড়াও মন্দিরের মধ্যে আরও অনেক দেবতা ও লামাদের মূর্তি রয়েছে। প্রধান মূর্তিটি হচ্ছে লোবন রিম্‌পোছে বা গুরু

পদ্মসম্ভবের। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় সমস্ত মূর্তিরই গঠনশৈলী অত্যন্ত সুন্দর। মন্দিরের ছাদ থেকে অনেক চিত্রলিপি ঝুলানো। বিহারের ওপর তলায় রয়েছে শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার তিব্বতী ভাষায় হাতে-লেখা সুন্দর পুঁথি এবং কিছু মূর্তি। কোনো এক সময় এখানে এক ভিক্ষুর বাস ছিল, পরবর্তী কালে তার শিষ্যরা বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যায়। এখন সেই শিষ্যদের বংশধরেরা এই বিহারের মালিক। গুম্ফার লাগোয়া সামান্য কিছু চাষের জমির আয়েই বেচারাদের দিন গুজরান করতে হয়, কারণ এই বিহার বা গুম্ফায় কেউ পুজো-টুজো দেয় বলে তো মনে হলো না।

১১ই মে থাম্পা লামার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। যেতেই তিনি আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। তাঁর অনেক হৃদ্যতার সঙ্গে উচ্চারিত কটি শব্দ "তুমিও বুদ্ধের ভক্ত, আমিও তাই" চিরকাল আমার মনে থাকবে। তাঁর ওখানেই রাত্রিবাস করলাম। লামার এখন ন্যুমা অর্থাৎ উপবাসের সময় চলছে। একদিন অনিয়মিত আহার ও পূজা, পরদিন দুপুরের পর পর্যন্ত উপবাসে থেকে পূজা, আর তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ উপবাস এবং পূজা, এরই নাম ন্যুমা। এর ওপর আছে প্রত্যেক দিন এক হাজার দণ্ডবৎ। অবলোকিতেশ্বরের এই ব্রতের ওপর এখানকার লোকের খুব আস্থা। দেখলাম, লামার সঙ্গে আরও বেশ কিছু স্ত্রী-পুরুষ এই ব্রত পালন করছে। লামা আবার ব্রতের সঙ্গে কিছু কিছু ঝাড়ফুঁকও করেন তাই ভক্তমহলে তাঁর পোয়া বারো। আগেই বলেছি এখানে আসার পর থেকে রাত্রিতে আমি কিছুই খাই না, তবু লামার অনুরোধ এড়াতে না পেরে মাখন দিয়ে তৈরি চা এক পেয়ালা পান করলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে তিব্বত দেশ এবং সে দেশের ধর্মাচরণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলো। উনি ওঁর জন্মভূমি খাম দেশে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন বারবার।

পরদিন লামার সম্পূর্ণ উপবাসের দিন, তবুও তিনি উঠে আমার জন্য ভাত এবং আলুর তরকারী বানালেন। সারাদিন ওঁর ওখানেই কাটিয়ে বিকেলের দিকে ফিরে এলাম। ঐ দিনই সন্ধ্যেবেলা ডুক্‌পা লামার অবশিষ্ট শিষ্য-শিষ্যারাও কাঠমাণ্ডু থেকে এখানে চলে এল। ওদের কাছে খবর পেলাম, ডুক্‌পা লামা এ দিকে আসছেন না, কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা কুতীর দিকে রওনা হয়েছেন। তিনি এখন বাকী জীবনের জন্য তিব্বতী সিদ্ধপুরুষ এবং কবি জেস্থন-মিলা-রেবার সিদ্ধস্থান লপ্‌চীতে অবস্থান করতে যাচ্ছেন। এ কথা শোনা মাত্র শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে অনেকে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। আমারও প্রায় কান্না পাওয়ার মতো অবস্থা। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। আমি এ দিকে দু'তিন মাস ধরে ওঁর আশায় এখানে বসে আছি অথচ উনি এ দিকে এলেনই না।

প্রথম চোটে খবরটা পেয়ে খুব দমে গেলেও তারপর সামলে নিলাম, কারণ

এ কয় মাসে তিব্বতীদের স্বভাবের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়ে গিয়েছি। ঠিক করলাম আগামী কালই এখান থেকে রওনা হব এবং কুতীতে গিয়েই ডুক্‌পা লামাকে ধরব। এখন শুধু আমার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। শুনলাম আজকাল এখান থেকে অনেকেই কুতীতে নুন আনতে যায়। অতএব দু'চার দিনের মধ্যেই লোক পাওয়া যাবে এমন ভরসা মিলল। কিন্তু আমার তো দু'চার দিনের আশায় বসে থাকলে চলবে না। তার আগেই ডুক্‌পা লামাকে ধরতে হবে, আর তাঁর সাহায্য ছাড়া নেপাল সীমান্ত পার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। রাত্রি পর্যন্ত কোনো লোক যোগাড় করা সম্ভব হলো না। কপাল এমনই খারাপ যে, আমাদের বিহারেরই একজন তরুণ যুবকের কুতীতে নুন আনতে যাবার কথা, কিন্তু ফসল কাটার কাজ পড়ে যাওয়ায় সে যাত্রা স্থগিত রেখেছে। অতএব সঙ্গীর ব্যাপারে অনিশ্চিত, কিন্তু যাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সে রাত্রিতে শুয়ে পড়লাম।

তৃতীয় পর্ব

সীমান্ত অতিক্রম

তিব্বতে প্রবেশ

১৪ই মে, ভোরবেলাতেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলাম। সঙ্গীর জন্য গতকাল-এর যুবকটিকেই আর এক দফা অনুরোধ করলাম। ফসল কাটা বাকী থাকায় তার পক্ষে যাওয়া মুস্কিল; শেষে তাতপাণী পর্যন্ত যেতে বলায় সে কি ভেবে রাজী হয়ে গেলো। সকাল প্রায় আটটা বাজে, কিছু মাখন এবং সত্তুর প্রয়োজন ছিল পথের জন্য। সত্তু পেলাম কিন্তু মাখন পাওয়া গেলো না। যাই হোক তাই নিয়ে রওনা হলাম। পথ এ বার পাহাড়ের ওপরের দিকে চলেছে, চারদিকে ঘন জঙ্গল তার মধ্যে প্রশস্ত পথ। স্থানীয় লোকেরাই এ সমস্ত রাস্তার মেরামত ইত্যাদি করে থাকে।

দু'ঘণ্টা চলার পর এক পশুপালকের ডেড়া পাওয়া গেলো। মোটা শেকলে বাঁধা একদল কুকুরের সমবেত চিৎকারে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। তবে কষ্ট করে আমাদের আর ডাকতে হলো না, কুকুরের ডাক শুনেই এক মহিলা বেরিয়ে এসে কুকুর সামলালেন, আমরাও সাবধানে ঘরে ঢুকলাম। চাটাইয়ে ছাওয়া কুটির। তার মধ্যেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ঘরের কোণে রান্নার সরঞ্জাম জড়ো করা রয়েছে। কাছেই একটা জামোকে (চমরী আর গোরুর সঙ্কর) দোয়া চলছিল। বাড়ির কর্তা কাঠের ছোট ছোট পাত্রে দুধ ভরে রাখতে ব্যস্ত, আর গৃহিণী পশুটির খাবার যোগাড়ের ব্যবস্থা করায় ব্যস্ত। এখানে দেখলাম দুধ দোয়ার সময় পশুটির সামনে অবশ্যই কিছু খাবার সকলেই রাখে। ঘরের কোণে একটা বড় কাঠের পাত্র ভর্তি ঘোল। গৃহকর্তা আমাদের দুধ পান করতে অনুরোধ করলেন। আমি দুধের পরিবর্তে ঘোলের প্রতিই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলাম। ঘোল পানের পর আহারের অনুরোধও এল। আগে কোথায় যাব, আবার সেখানে কিছু পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, এইসব ভেবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ভাত এবং তরকারী তৈরি হলো। আমরা যখন আহারে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে গৃহকর্তা মাখন তৈরি করে দিলেন। এগারটা নাগাদ ঐ কুটির ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বড় বড় বনস্পতির সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। এখানে অসংখ্য নাম

না-জানা পাখীর কলতানে পরিবেশ ভরে রয়েছে। আমরা দু'জনে ভোটীয় ভাষায় কথাবার্তা বলতে বলতে, আর পথের পাশের জঙ্গল থেকে পাকা ষ্ট্রবেরী তুলতে তুলতে এগোচ্ছি। চলতে চলতে দু'একটি গ্রাম চোখে পড়ছিল। এ দিককার সমস্ত গ্রামেই য়ল্মোদের বাস। সারা গ্রামে সাদা পতাকার মেলা, আর গ্রামের মাঝখানে মাণী তো আছেই। মাণীর দু'পাশের রাস্তাটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বৌদ্ধ যাত্রীরা মাণীকে ডান-দিকে রেখে পথ চলে। যাবার সময় ডান-দিক এবং ফেরার সময় বাঁ-দিক। এর ফলে তাদের আর পরিক্রমার কষ্ট স্বীকার করতে হয় না, সেটা এমনিতেই হয়ে যায়। অথচ যাত্রীর লাভ হয় নিখরচায় প্রচুর পুণ্য। একটা গ্রামের মাণীর পাথরের গায়ের রঙ দেখলাম কাঁচা, বুঝলাম এটি একেবারে সদ্য প্রস্তুত হয়েছে। আগেই দেখেছি য়ল্মোদের মধ্যে লামা ধর্ম বেশ জোরদার, আর এদের সাংসারিক জীবনযাত্রাও বেশ সচ্ছল।

দুপুর একটার সময় আমরা পাহাড়ের প্রান্তদেশে পৌছালাম। এখান থেকে আমাদের অন্য পারে যেতে হবে। এ রকম গিরি-সঙ্কটের নাম হচ্ছে 'লা'। 'লা' অর্থে ভারতবর্ষে যাকে সাধারণত ঘাট বলা হয়। এখানে লা-এর মুখে বৃহৎ একটা মাণী। লা অতিক্রম করে উৎরাই শুরু। কিছুটা নামতেই সমস্ত অরণ্য নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। এখন সামনে শুধু গম আর যবের ক্ষেত। যত নীচে নামা যাচ্ছে ততই তাপমাত্রাও বাড়ছে। কোনো বাধা না মেনে জোর কদমে হাঁটা চলছিল। সঙ্গীটিরও ফিরে গিয়ে ফসল কাটতে হবে তাই পথটা দু'জনে খুব তাড়াতাড়িই অতিক্রম করলাম।

তমংদের গ্রাম ছেড়ে নীচের দিকে আবার গোর্খাদের গ্রাম। এ দিককার ক্ষেতে মকাই বোনা হয়েছে। গাছগুলো মাটির বুক থেকে আঙ্গুল দুয়েক মাত্র বড় হয়েছে। এ সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে বেলা চারটের সময় আমরা নদীর সাঁকোর কাছে পৌছালাম। এখানে একজন সরকারী সিপাহীর মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। কিন্তু একজন ভোটীয় লামার তার কাছে কি-ই বা প্রয়োজন থাকতে পারে? তাই নিশ্চিন্তেই সাঁকো পার হয়ে গেলাম। এ বার আবার চড়াইয়ের শুরু। উৎরাইয়ের পথে যতটা জোরে হাঁটতে পেরেছি চড়াইয়ের পথে তা কিন্তু পারা গেলো না। ঘণ্টাখানেক চলবার পরই ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে এল। অতএব বেলা থাকতে থাকতে একটা আশ্রয় খোঁজা দরকার। কাছেই এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ঘরে আশ্রয় পেয়ে গেলাম। সে রাত্রিতে আমার সঙ্গীটি ভাত রাঁধল। দু'জনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করে লম্বা ঘুম দিলাম। পরদিন রাত থাকতে উঠেই রওনা হলাম। অনেক গ্রাম, ছোট ছোট স্রোতধারা পার হয়ে আর একটা লা-এর মুখে এসে যখন পৌছেছি তখন বেলা প্রায় একটা। সামনে একটা ন্যাড়া পাহাড় দেখতে পেলাম। অবশেষে পাহাড়ের দ্বিতীয় ধাপটিকেও পার করে আমরা কাঠমাণ্ডু-কুতী সড়কে এসে

পড়লাম। এখান থেকে এখন দুটো রাস্তা ধরে কুতী পৌঁছানো যায়। একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে আর একটা নীচের দিক দিয়ে। নীচের রাস্তায় খুব গরম বোধ হয় বলে আমরা ওপরের রাস্তাতেই চলতে লাগলাম। ওপরের প্রথম চড়াইটি ভাঙবার পর আবার শুরু হলো জঙ্গল। এ পথে লোক চলাচল বেশ বেশী রকম। সকলেই কুতী থেকে নুন আনা-নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। কেউ ভুট্টা, চাল ইত্যাদি নিয়ে চলেছে, বিনিময়ে লবণ আনবে, আবার বিপরীত দিক থেকে কেউ নুনের বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরছে। বেলা দুটো নাগাদ চড়াই শেষ হলো এবার উৎরাইয়ের শুরু। এ অঞ্চলে শর্বোদের বাস। শর্বোরা য়ল্মোদেরই এক প্রজাতি। এই শর্বো ভোটীয়রা এখন দার্জিলিং এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শর্বো শব্দের অর্থ পূর্বাঞ্চলের লোক। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ডুক্‌পা লামা এখনও এ পথ অতিক্রম করে যাননি। ঘণ্টাখানেকের উৎরাই শেষ হবার পর খবর পেলাম ডুক্‌পা লামা আগের গ্রামটিতে অবস্থান করছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো, যাক চেষ্টা সার্থক। বেলা তিনটের সময় আমার অভীষ্ট সেই গ্রামে পৌঁছে তাড়াতাড়ি ডুক্‌পা লামার সঙ্গে দেখা করলাম। এমনিতে আমার সঙ্গে ওঁর কোনো মতান্তরই হয়নি, শুধু মাত্র তিব্বতী স্বভাব অনুযায়ী আমাকে একটু উপেক্ষাই করেছেন বলা যায়। দলের সবাই 'পণ্ডিত'-কে দেখে বেশ আনন্দিত। সে রাত্রি ঐ গ্রামেই কাটল। গ্রামটি লামা ধর্মের অনুসারী তমংদের। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস মনে হলো একটু শিথিল। কারণ ডুক্‌পা লামার মতো অমন একজন তাবড় অবতারী লামার প্রতিও শ্রদ্ধার কোনো চিহ্ন নেই। বরং একটু অসহযোগিতাই যেন দেখতে পাচ্ছি, কারণ দাম দিয়েও কোনো জিনিস কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক আমার মন এখন উদ্বেগমুক্ত। কুলুর রিন্‌চেনও এ দলেই রয়েছে। ডুক্‌পা লামার শরীর বেশ মোটা, খুব তাড়াতাড়ি পথ চলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে বহন করে নেবার জন্য লোকের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দলটিতে চার জন লামা এবং চার জন গৃহস্থ মিলে মোট আট জন।

ভোরে উৎরাই দিয়ে পথের শুরু। নদীর ওপর লোহার ঝুলানো সেতু পার হয়ে যে জায়গায় এলাম, সেখানে কিছু দোকান-পাট আছে। কিন্তু সেখানে খাবার-দাবার বলতে আগুনে ঝলসানো মাছ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলো না। সন্ধ্যা নাগাদ চড়াই ভেঙে তমংদের একটা বড় গ্রামে এসে পৌঁছালাম। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অবশেষে আমরা কালী নদীর তীরে এসে, কাঠমাণ্ডু থেকে চলে আসা রাজপথের সঙ্গে মিলিত হলাম। এখানেও রাস্তায় লবণ সংগ্রহকারীদের ভিড় —যেন কাছাকাছি কোথাও কোনো মেলা বসেছে। এ অঞ্চলেও শর্বোদের বাস। ১৮ই মে কালী নদী পার হয়ে একটা গ্রামে অবস্থান করলাম। সঙ্গীরা বলল —আগামী কাল আমরা নেপাল সীমান্ত পার হব।

এই যাত্রাপথে আমার আর ডুক্‌পা লামার জন্য ভাত রান্না করা হতো। বাকী সকলে থুক্‌পা এবং সত্তুতেই আহারের কাজ চালিয়ে নিত। কখনও কখনও সেই য়ল্মোদের গ্রামের মতো এখানেও জংলী শাক পাতা জুটে যেত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে ভাজা মাছের ঝোলও জুটে যেত মাঝে মধ্যে। এই গ্রামটিতে প্রচুর মুরগীর ডিম পেয়ে গেলাম। গোটা পঞ্চাশেক ডিম কিনলাম, কিন্তু রাত্রির মধ্যেই আমার সঙ্গীরা তার সবগুলিকেই সাবাড় করে দিলো। সমতলে অবস্থান কালে তবু আমার কিছু খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল। কিন্তু এখন আমি ও সমস্ত কিছুর থেকে একেবারেই মুক্ত। মাংস সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। খুব ছেলাবেলায় খাবার অভ্যাস ছিল, তাই যখন খেতাম না, তখনও ঘৃণার ভাব ছিল না, আর এখন নতুন করে শুরু করতেও খুব অসুবিধা হলো না। সামনে সীমান্ত, তাই য়ল্মোতে বসে যা কিছু লেখালিখি করেছিলাম, সে সমস্ত কাগজপত্র রাত্রিতেই পুড়িয়ে ফেললাম। কারণ তাতপাণীতে যদি কারও চোখে পড়ে তা'হলে ঝামেলা হতে পারে।

কাপ্সী নদীর ওপরের দিক দিয়ে আমরা চলেছি। যেমন যেমন নদীর পাড় উঁচু হচ্ছে তেমন তেমন আমাদের পথও উঁচুতে উঠছে। নদীর দু'ধারেই সবুজের সমারোহ। কোথাও অরণ্যের পরিমাণ কম কোথাও বেশী, কিন্তু কোথাও পাহাড় ন্যাড়া নয়। দুপুর দুটোতে তাতপাণী পৌঁছালাম। এখানে একটি গরম জলের প্রস্রবন আছে তাই জায়গাটির নাম হয়েছে তাতপাণী (তপ্তপানী)। গ্রামে নেপাল রাজ-সরকারের চুঙ্গীঘর (অকট্রয়), ডাকঘর ইত্যাদি কয়েকটি সংস্থা আছে। আমার তো বুকে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কেউ না বলে বসে —তুমি মধেসিয়া, এখানে কি মনে করে? ডুক্‌পা লামা পিছনেই আসছিলেন। চুঙ্গী কর আদায়কারীরা জিজ্ঞেস করল —লামা কোত্থেকে আসছেন? আমি জবাব দিলাম —তীর্থ থেকে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করে। ব্যস, আর কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়েই ছাড়া পেয়ে গেলাম। রিন্‌চেন তো খুশী হয়ে বলল —কি, কাজ হয়ে গেলো তো? আমি কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কারণ এরপর আছে সামরিক চৌকী, তাই রিন্‌চেনকে বললাম —সামনেই তো আসল বিপদ। সেটা কাটুক, তবে না হবে।

ইতিমধ্যে ডুক্‌পা লামাও এসে পড়লেন। টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই একটা ঝুপড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার চলা শুরু হলো। সামনেই একটা পাহাড় আমাদের দৃষ্টি-পথকে আড়াল করে দিচ্ছিল, এ দিকে নদীর উঁচু পাড়ও আর দেখতে পাচ্ছি না। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো যে সামরিক চৌকী কেন তাতপাণীতে না রেখে, তার চেয়ে খানিক আগে রাখা হয়েছে। বস্তুত পক্ষে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামনের পাহাড়টির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এখানে দাঁড়িয়ে একটা ছোট সৈন্যদল স্বচ্ছন্দে শত্রুর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা

করতে পারবে। খানিকটা চড়াই ভেঙে উঠতেই সামরিক চৌকীর এলাকার মধ্যে এসে পড়লাম। রাস্তাতেই পাহারাদার সৈন্য দাঁড়ানো। আমাদের সকলকে থামিয়ে এক জায়গায় বসাল। তারপর গেলো তার ওপরওয়ালা হাবিলদারকে ডাকতে। এটাই সেই জায়গা, যার কথা চিন্তা করতেই আমার ভয় হচ্ছিল এবং এর জন্যই ডুক্‌পা লামার শরণ নিয়েছি। আমার মনে হলো, যেন সাক্ষাৎ যমের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। হাবিলদার সাহেব এসে প্রশ্ন শুরু করলেন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে ইত্যাদি। আমার সঙ্গীরা উত্তর দিলো —আমরা কোরোং-এর অবতারী লামার শিষ্য। আপাতত বোধা থেকে আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ভারবাহীরা লামাকে সেখানে নিয়ে এল। হাবিলদার সাহেব সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পরই তার ওপরওয়ালা সুবেদারকে ডেকে আনলেন। সুবেদার সাহেব এসে প্রত্যেকের নাম, ধাম লিখতে শুরু করল। সে সময় আমার মুখের অবস্থা যদি কেউ দেখত, তা'হলে নিঃসন্দেহে মনে করত কঠিন রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। আমি সৈন্যদের সামনে যাচ্ছি না, পাছে তারা আমার মুখ দেখে ফেলে। এক সময় আমার পালা এল। রিন্‌চেনই আমার হয়ে বলল —এর নাম খুনু চুবঙ, ঠিকানা আমাদের সকলেরই এক। ব্যস, পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলাম। সকলেরই ছুটি হয়ে গেলো। এতক্ষণে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

এ দিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে তাই আশপাশের কোনো গ্রামে আশ্রয় নেবার কথা ঠিক হলো। সামরিক চৌকীর সুবেদার সাহেব কাছের গ্রামের একজনকে ডেকে অবতারী লামার থাকবার সুব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন। আমরা সেই লোকটিকে অনুসরণ করে তাদের গ্রামে গেলাম। সুবেদার সাহেবের নির্দেশে থাকবার জায়গাটি ভালোই জুটল।

আজ ১৯শে মে, গ্রামে পৌঁছেই ডুক্‌পা লামা দেবতার পূজা আরম্ভ করলেন। সত্তুর পিণ্ডে লাল রঙ ঢেলে মাংস তৈরি হলো। উৎকৃষ্ট আরক (মদ্য) এল বিভিন্ন বাড়ি থেকে। কুড়িটা ঘিয়ের প্রদীপও জ্বালা হলো। সামান্য কিছু মন্ত্রপাঠের পরই ডমরু বাজনা শুরু হয়ে গেলো এবং এই পূজা আর বাজনা চলল প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত। এরপর প্রসাদ বিতরণ শুরু হলো। আমার সামনে প্রসাদী মদ এল। সকলে মিলে আমাকে দেবতার রোষের ভয় দেখাতে শুরু করল। কিন্তু ওদের তো এ কথা বোঝানো যাবে না যে, ঐ সব দেবতা এবং তাদের রোষ ইত্যাদি কোনো কিছুর প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই। যাই হোক লাল সত্তুর প্রসাদ প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করলাম।

পরদিন, ভোরবেলা উঠে রওনা হলাম। দু'ঘণ্টার মধ্যে সীমান্তবর্তী সেই সেতুটির কাছে পৌঁছালাম, যেটি নেপাল ও তিব্বতের মধ্যেকার সীমানা নির্দেশ করছে। সেতুটি পার হয়ে তিব্বতের মাটিতে পা রাখতেই মন আনন্দে ভরে উঠল। কত দীর্ঘ পরিশ্রম আর ঝুঁকি নেওয়া এতক্ষণে সার্থক হলো।

কুভী অভিমুখে

২০শে মে বেলা দশটায় তিব্বতের সীমানায় পা রেখেছি। ভোটীয়া-কোশী নদীর ওপরের কাঠের সেতুটির ওপারে ফেলে এলাম নেপালকে। এ বার আবার চড়াই। রাস্তায় প্রচুর লোকজন যাতায়াত করছে। আগেই বলেছি এখন লবণ সংগ্রহের মরশুম। লোকজনের যাতায়াতও সেই উদ্দেশ্যে। পথের পাশে কোথাও কোথাও দু'একটি কুটির। পথিপার্শ্বস্থ এই সমস্ত কুটিরে যাত্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আর থাকে ভুট্টা থেকে তৈরি মদ। এখানকার গৃহস্থদের এটা অর্থোপার্জনের ভালো মরশুম। চারদিকে ঘন জঙ্গল তাই প্রত্যেক ঘরে কাঠের ধুনি বিরামহীন জ্বলছে। পথের দু'ধারে, এমন কি মাণী, চৈত্য ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত লবণ-যাত্রীদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপে নোংরা দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে। দুপুরে এক য়ল্মোর ঘরে বিশ্রাম নিলাম। গৃহস্বামী এবং তাঁর স্ত্রী নেপালের য়ল্মো অঞ্চল থেকে এসে এখানে বাস করছেন।

এ বার আমাদের যে পথে চলা শুরু হলো, তা অতীব সুন্দর। চারদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়, যার চূড়া পর্যন্ত সবুজে ঢাকা, তার মধ্য থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসা ঝর্ণার কলধ্বনি। নীচে খরস্রোতা কোশীর ফেনিল জলধারা। চারদিকে নাম না-জানা পাখীর সমবেত কূজনে পরিবেশ আমোদিত হয়ে রয়েছে। ভারমুক্ত মনে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল যেন এক স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু এই সমস্ত উপলব্ধিই মাটি হয়ে গেলো, যখন সঙ্গীরা মনে করিয়ে দিলো, এ রাস্তায় খুব পাহাড়ী বিছের ভয় আছে। এ সময় ডুক্‌পা লামাকে কেউ বহন করছিল না। স্থূলদেহে তাঁর পক্ষে এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ চলা খুবই কষ্টের ব্যাপার হচ্ছিল। তাই বার বার তাঁকে বিশ্রামের জন্য থামতে হচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে আমাদেরও। এখানে হঠাৎ বুদ্ধগয়াতে পরিচয় হওয়া মঙ্গোলিয়ান ভিক্ষু লোব-সঙ্-শের-রব (সুমতি-প্রজ্ঞ)-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। উনিও এখন আমাদের সঙ্গেই যাবেন। এখন সামনে দুরন্ত চড়াই, তবে সঙ্গে বোঝা না থাকায় অতটা কষ্ট বোধ হচ্ছিল না। বেলা চারটে নাগাদ আমরা ডাম গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালাম। এখানে পথের দু'পাশে প্রচুর ছোট ছোট বাঁশঝাড় দেখতে পেলাম। হিমালয়ের এত ওপরে পাইন, দেবদারু জাতীয় সরল বৃক্ষই শুধু হয় বলে এতদিন যা জানতাম তার দেখছি সবটাই সঠিক নয়। এ দিককার লোকরা আগেই খবর পেয়ে গিয়েছে ডুক্‌পা লামা আসছেন তাই সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে। লামা আসতেই স্ত্রী, পুরুষ প্রত্যেকেই মাথা নীচু করে তাঁর কাছে গেলো। লামা তাঁর ডান হাতখানা প্রত্যেকের মাথার ওপর একবার করে রাখলেন। কিছু লোক ধূপ জ্বালিয়ে আগে আগে চলছে। খানিকটা যাবার পর সমতল খানিকটা জায়গা, সেখানে কার্পেট পাতা। তার সামনে কতকগুলো চায়ের পেয়ালা রাখবার জন্য

কাঠের ছোট ছোট চৌকি রাখা হয়েছে। আমরা সবাই কার্পেটে বসতেই চা এল। এখানেও আমি চায়ের চেয়ে ঘোলই বেশী পছন্দ করলাম। এর পর ডুক্‌পা লামাকে চাল এবং নেপালী মুদ্রায় ভেট দেওয়া শুরু হলো। উনিও মন্ত্র পড়ে লাল এবং হলুদ রঙের কাপড়ের টুক্‌রো উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করলেন। আধ ঘণ্টার মতো সময় এখানে রইলাম, তারপর আবার চলার পালা। খানিক এগিয়ে কোশী নদীর এক শাখার দেখা পেলাম। নদীটি বেশ ঘোর নিনাদে ওপর থেকে নেমে আসছে। এই নদীর ওপরে লোহার শিকলে ঝুলানো একটি সেতু আছে, এ বার সেতু পার হতে হবে। সেতুটি শিকলের হবার ফলে কেউ এর ওপর পা রাখলেই কিছুটা দুলতে শুরু করে। নীচে অমন খরস্রোতা নদী আর ওপরে সেতুর দোলানি। অভ্যাস না থাকলে পার হতে ভয় লাগবেই। আমাদের সঙ্গে গুমা-জু নামে একটি নেপালী ছেলে বহুকষ্টে পার হলো। সেতুটি রক্ষার জন্য এর গায়ে নানা রঙের পতাকা সম্বলিত দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সেতু পার হয়েই ডাম গ্রাম। পাহাড়ের ধাপে ধাপে চাষের জমি। ডাম গ্রামে কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস। অধিকাংশ বাড়ির দেওয়াল পাথরের কিন্তু ছাদ কাঠের। বাড়িগুলো সাধারণত দোতলা কিম্বা তেতলা। গ্রামের কাছা-কাছি অফুরন্ত দেবদারুর বন, অতএব কাঠের অকৃপণ ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। এখানে আমাদের থাকবার জন্য একটা ভালো বাড়ির ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। যদিও এই লবণ সংগ্রহের মরশুমে, লবণ সংগ্রহকারীদের আশ্রয় দিলেই গৃহস্থের দুটো পয়সা হয়। কিন্তু লামার প্রতি ভক্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ও বড় কম নয়। গ্রামে প্রবেশ করতেই সকলে ডুক্‌পা লামার স্পর্শ লাভের আশায় ছুটে এল। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের ভিড়ে ঘর ভরে উঠল। আমাদের থাকার জায়গা হলো দোতলায়। ডুক্‌পা লামাকে মদের মধ্যে মাখন মিশিয়ে নিবেদন করা হলো। আর আমাদের জন্য এল মাখনযুক্ত ভালো চা।

রাত্রিবেলা রিন্‌চেন বলল আগামী কাল থেকে অবলোকিতেশ্বরের মহাব্রত শুরু হবে। সবাই দেখলাম ব্রত রাখতে যাচ্ছে। সকলের দেখাদেখি আমিও ব্রত রাখব বলে স্থির করলাম। এই ব্রত বা ন্যুমার কথা আগেই বলেছি, যা দেখেছিলাম য়ল্মোদের গ্রামে। এখানে এই ব্রতে, উপবাস ছাড়াও মন্ত্রজপ, পঞ্চাশটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালা, এবং সত্তু ও মাখনের তোর্মা (বলি) প্রস্তুত করতে হয়। এর ওপরেও আছে দণ্ডবৎ। অবলোকিতেশ্বরের এই ব্রতে মদ ও মাংসের ব্যবহার কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। ব্রতের দ্বিতীয় দিন দুপুরে ভাত খাওয়া হলো। সকলের সঙ্গে আমি শত খানেক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ সারলাম, কিন্তু এরপরই ভীষণ ক্লান্ত লাগতে লাগল। তখন মনে হলো কেন যে সাধ করে এই অনাবশ্যক

উৎপাতটি ঘাড়ে চাপাতে গিয়েছি! সুতরাং তৃতীয় দিনে ভোরবেলাতেই চা এবং সত্তু ভোজন করে ন্যুমা বা ব্রতের ইতি করে দিলাম। দুপুর বেলা স্থানীয় একজন তিব্বতী ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে মুরগীর ডিমের নরম সেওয়্‌ই খাওয়া হলো। তারপর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন লাসাতে ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন খাম প্রদেশে। নেপালী ভাষায়ও দেখলাম তাঁর ভালোই দখল আছে। তৃতীয় দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং নির্বাণ এই তিনটিরই তিথি বৈশাখী পূর্ণিমা। সে জন্য বৌদ্ধদের কাছে এটি পবিত্রতম তিথি। এইদিন সেই ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে বুদ্ধোৎসবের আয়োজন করেছেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, এইদিনটি সারা তিব্বতেই উৎসবের দিন হিসাবে পালিত হয়।

তিন দিনে ডাম গ্রামের অধিবাসীদের পুজো, ভেট ইত্যাদি দেওয়া শেষ হলো। ২৪শে মে আবার শুরু হলো চলা। খানিকটা দূরে গিয়ে যেন আমরা এক দেবদারু গাছের মহারণ্যে প্রবেশ করলাম। যতদূর তাকাই শুধু দেবদারু গাছের ভিড়, মনে হয় যেন দেবদারু ভিন্ন কোনো গাছই এখানে নেই। বেলা দুটো বাজবার আগেই আমরা পৌছে গেলাম চীনা গ্রামে। এখানকার লোকেরাও লামার আসবার খবর পেয়ে গিয়েছে আগেই। তাই তারা গ্রামের মুখে প্রচুর বাদ্যভাণ্ডের সহিত উপস্থিত হয়ে, ডুক্‌পা লামাকে স্বাগত জানাল। যথারীতি আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ড্জন খানেক চাল-ভরা থালা, নেপালী মোহর, খাতা (চীনের তৈরি সাদা রেশমী কাপড়, যা মালার বিকল্প হিসেবে এ দেশে ব্যবহৃত হয়) এসে গেলো। সন্ধ্যাবেলা রিন্‌চেনের কাছে খবর পেলাম যে ডুক্‌পা লামা এখানেও তিন দিন পূজাপাঠ করবেন। অনাবশ্যক কারণে দু'তিন দিন এক জায়গায় থেকে যাওয়া, আমার মোটেই পছন্দ সই নয়। কিন্তু আমার তো হাত-পা বাঁধা। তাই নিরুপায় হয়ে সয়ে যাচ্ছি। তবে ভাগ্য ভালো, চীনা গ্রামের লোকেরা ডুক্‌পা লামাকে বাজনা বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলেও বেশী দিন ধরে রাখার ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ দেখাল না। মনে হচ্ছে, যার যা দেবার ছিল তা প্রথমেই দিয়ে দিয়েছে। মাঝ রাতে রিন্‌চেন খবর দিলো, কাল সকালে আবার যাত্রা শুরু হবে'। কথাগুলো এই মুহূর্তে আমার কানে খুবই মধুর শোনাল।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হলো। ঝাড়া হাত-পা থাকায় আমি দলের অন্যান্য সকলের চেয়ে মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছি। দেবদারুর অরণ্য যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। মাঝে মাঝে দু'একটি গরু দূরে চরে বেড়াচ্ছে, সামনে একটা বাড়ি পড়ল। সেখানে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম, তাদের কোনো পাত্তা নেই। তখন বাড়ির ভেতরে একটু খোঁজ-খবর করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাড়ির লোকদের

ডেকে বললাম, ডুক্‌পা লামা রেণ-পোছে এই পথেই আসছেন। ব্যস, আর কি চাই। চট্‌পট চায়ের জল চড়ে গেলো। লামা এসে পৌঁছাতেই চায়ের খবরটা তাঁকে দিলাম। গৃহস্বামী লামাকে প্রণাম করে ভক্তিভরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। বাড়ির কোণে ছোট একটা জলের প্রস্রবণ ছিল। লামা সেটি দেখে, তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। এখানেও একথালা চাল এবং কিছু মোহর পাওয়া গেলো। সব শেষে গরম গরম মাখন চা পান করে আবার চলতে শুরু করলাম।

এখন আমরা যে পথে চলেছি এখানেও চারপাশে দেবদারুর ভিড়, কিন্তু এখানকার গাছগুলো আগের চেয়ে লম্বায় যেন অনেক খাটো। সব শেষে নদীর ধারে বিশাল এক পর্বতের বাহু যেন আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। পর্বতটিকে অতিক্রম করতেই চিরহরিৎ বর্ণের দেশটি যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। এ বার আমাদের পথের দু'পাশে ইতস্তত ছড়ানো বেঁটে বেঁটে গাছ। সমতলে সর্বত্র ঘাসও সমান নেই। বেলা চারটে নাগাদ একটা গ্রাম পেলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ আগেই গ্রামের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন এবং আমার মতোই আগাম খবর দিয়ে রেখেছিলেন। তাই গ্রামে পা দিয়েই গরম মাখন চায়ের দেখা পেয়ে গেলাম। পেয়ালা দু'য়েক চা পান করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে ইয়াক (চমরী গাই) চরছে দেখতে পাচ্ছি। বহু দূরে দিক্‌চক্রবালে যেন সেই আকাশছোঁয়া গাছের সারির নিশানা দেখা যাচ্ছে। মনে হলো পথের দু'পাশে যে সবুজের সমারোহ দু'চোখ ভরে দেখলাম, তার তুলনা নেই।

সন্ধ্যাবেলা চক-সুম। এখানে গ্রামের নীচের দিকে দুটো গরম জলের ঝর্ণা আছে, সে জন্য এই গ্রামের আর এক নাম ছু-কম (গরম জল)। গ্রামে সবচেয়ে ভালো বাড়িটিতে ডুক্‌পা লামার থাকবার ব্যবস্থা হলো। রাত্রিতে মশাল জেলে আমরা সেই গরম জলের ধারায় স্নান করতে গেলাম। আমার সঙ্গীরা উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে শুরু করল। যাই হোক তখন রাত্রির অন্ধকার ছিল কিন্তু পরদিন দিনের বেলাতেও আমার সঙ্গীরা মেয়েদের সামনে উলঙ্গ হয়েই স্নান করল। কোনোই বিকার নেই। এদের দেখে মনে হলো যদি শীতের ভয় না থাকত তা'হলে এরা বোধ হয় আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের মতো সব সময় উলঙ্গ হয়েই ঘুরে বেড়াত।

চক-সুম গ্রামটি বড়। তবে আকাঙ্ক্ষা মতো পূজা-উপাচার এখনও পড়েনি। ভাম গ্রাম থেকে যিনি আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি লামাকে বহন করে নেবার লোকের ব্যবস্থা করে আগে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু ডুক্‌পা লামা আরও একদিন এখানে থেকে-যাওয়া মনস্থ করলেন এবং নিজেও আমাদের মতো গরম জলে স্নান করলেন। স্নান সেরে গরম মদ সেবন করে ভক্তদের হাত দেখা, ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

২৬শে মার্চ চক-স্থম ছাড়লাম। রিনুচেনের কাছ থেকে একটা ভোটীয় ভিক্ষুর পোশাক ধার করে নিয়ে এ বার পরে ফেললাম। ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস যেন চামড়া ভেদ করে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। যে করেই হোক আজ কুতী পৌছাতেই হবে। চক-স্থম ছাড়াতেই ক্রমে ক্রমে গাছপালার পরিমাণ কমে আসতে লাগল। চারদিকে অনেক পাহাড় কিন্তু সেগুলো সমস্তই গাছপালা শূন্য। দূরে সমতলে কোথাও বিশালাকৃতি চমরী গাই চরে বেড়াচ্ছে সামান্য একটু ঘাসের খোঁজে। পথে দু'জায়গায় আমরা তুষারপাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এখানে কাঠ দুষ্প্রাপ্য, দুপুরে যেখানে চা পান করলাম, সেখানে দেখি ঘুঁটের দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়েছে। এ দিকের পথেও চড়াই পড়ল, তবে তা তেমন কিছু কঠিন নয়। ডান-দিকে দেখা যাচ্ছে তুষারে ঢাকা গৌরীশঙ্করের রূপালী চূড়া। আমরা যখন কুতী থেকে মাইল খানেক মাত্র দূরে, এমন সময় ডুক্‌পা লামার জন্য ঘোড়া এসে গেলো। আজ অবশ্য তাঁর জন্য বাহক দল মজুত রয়েছে, তাই তিনি ঘোড়া এলেও তাতে চড়লেন না। এখান থেকেই তিনি তাঁর অনুচরদের আগে-ভাগে কুতী চলে যেতে বললেন এবং আমাকেও সেই অগ্রগামী দলের সহযাত্রী হতে বললেন। উদ্দেশ্য আগের থেকে খবর দিয়ে অভ্যর্থনার ব্যাপারটা প্রস্তুত রাখা। কিন্তু তিব্বতের মাটিতে পা রেখেও আমার ভয় ভাবটা সম্পূর্ণ কাটেনি। তাই আমি অগ্রণী দলের সঙ্গে না গিয়ে লামার কাছাকাছি থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। বলা বাহুল্য আমার এ হেন ব্যবহার তাঁকে খুশীই করল। অবশেষে বেলা পাঁচটায় আমরা কুতী পৌছালাম। অভ্যর্থনার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর নতুন মাণী প্রতিষ্ঠার জন্য লামার কাছে অনুরোধ এল। লামাও "সুপ্রতিষ্ঠ বজ্রস্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণ করে মাণীর চারদিকে এক থালা চাল ছড়িয়ে দিলেন। ব্যস মাণী প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়ে গেলো। এরপর একটা ভালো বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে যাওয়া মাত্র লামার জন্য এল গরম ঘি মেশানো উৎকৃষ্ট মদ এবং আমাদের জন্য চা। আমার থাকবার জায়গাটা লামার ঘরেই হলো। আমিও এটাই চেয়েছিলাম।

ছাড়পত্রের সমস্যা

ডুক্‌পা লামা এ বার তিব্বতে এসেছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। লপচী হলো তিব্বতের অভ্যন্তরে একটা জায়গার নাম। এখানে এ দেশের একজন সিদ্ধ পুরুষ জো-চুন-মিলারে-পা এই লপচীতে একান্ত-বাস করেছিলেন। সে কারণেই এই জায়গা তিব্বতীদের কাছে খুব পবিত্র বলে বিবেচিত। ডুক্‌পা লামা তাঁর বাকী জীবন ওখানেই কাটাবেন এ রকম উদ্দেশ্য নিয়েই এ দেশে এসেছেন। খবর পাওয়া গেলো যে লপচীতে যাবার পথে যে সমস্ত লা (ঘাট) আছে সেগুলো এখনও বরফে ঢাকা, ফলে

কিছুদিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রইল। কুতী বেশ বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল। লোক বসতিও অনেক। তদুপরি লবণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ এখানে এসে জড়ো হয়েছে। ডুক্‌পা লামাও এই অতিরিক্ত জনসমাগমে যদি বাড়তি কিছু প্রাপ্তি-যোগ ঘটে এই আশায় এখানে কিছুকাল থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কুতী পৌঁছে আমার সঙ্গী তমং যুবকটিকে তেরো নেপালী মোহর (পাঁচ টাকা সাড়ে চার আনা) মজুরী চুকিয়ে অব্যাহতি দিলাম। যুবকটির অবশ্য তাতপাণী পর্যন্ত আসার কথা ছিল এবং তার জন্য পারিশ্রমিক চেয়েছিল চার মোহর, সে জায়গায় কুতী পর্যন্ত আসার জন্য তার পাওনা হয় আট মোহর এবং তার হিসাবেও এই পারিশ্রমিকই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আশাতিরিক্ত মজুরী পেয়ে সে অত্যন্ত খুশী মনে প্রচুর নুন কিনে দেশে ফিরে গেলো।

মে মাসের শেষ সপ্তাহ। বর্ষা এসে পড়ল বলে। এ সময়ে কুতীর চেহারাই পাল্‌টে যায়। এমনিতে এখানকার যা লোকসংখ্যা, লবণের মরশুমে তা বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। নেপাল থেকে লোক এখানে আসে চাল, মকাই কিম্বা অন্য কোনো ফসল নিয়ে; আর তিব্বতীরা ভেড়া অথবা চমরীর পিঠে গাদা করে নিয়ে আসে নুন। কুতীতে নেপালী ব্যবসায়ীদের অনেক দোকান এবং গুদাম আছে, তারা দু'দলের কাছ থেকেই তাদের সমস্ত পণ্য কিনে নেয়। তিব্বতীরা তাদের পাওয়া অর্থে শস্য ইত্যাদি কেনে আর নেপালীরা কেনে নুন। কোথাও কোথাও অবশ্য সরাসরি ফসল এবং নুনের বিনিময় হয়। তিব্বতীরা নুন ছাড়া সোডাও নিয়ে আসে। নুন, সোডা সমস্ত কিছুই তিব্বতের কয়েকটি হ্রদের ধারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু ট্যাক্স দিয়ে যে কেউ এ সব সংগ্রহ করতে পারে। নেপালীরা স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরেই আশ্রয় নেয়, বিনিময়ে অবশ্য কিছু অর্থ দিতে হয়। কিন্তু তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রচুর চমরী ও ভেড়া থাকে এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঐ পশুপালের সঙ্গেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের রাত্রি কাটাতে হয়।

আমরা যেদিন কুতী পৌঁছাই সে দিন থেকেই কয়েকজন নেপালী ব্যবসায়ী শীগর্চী (টশী-লুন-পো) যাবার অভিপ্রায়ে, এখানে অবস্থান করছিল। শীগর্চী বা লাসা যেতে হলে নেপালী ব্যবসায়ীরা এখান থেকেই ঘোড়া ভাড়া করে নেয়। একটা ঘোড়ার ভাড়া চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাং। আমাদের দেশের এক টাকার সমান দেড় সাং। একটি ঘোড়া কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যায় না। পথে কয়েক জায়গায় ঘোড়া বদলাতে হয়। ঐ চল্লিশ সাং ভাড়াতেই পথে ঘোড়া বদলানো থেকে মায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। আমি এবং আমার সঙ্গীরা এই নেপালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গী হবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কি কারণে জানি না, তারা আমাদের সঙ্গে নিতে অস্বীকার করল। আমি তো খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ দিকে ডুক্‌পা লামা নড়বার নাম করছেন না। অবশ্য যে রকম

পূজা, ভেট ইত্যাদি পড়ছে তাতে নড়ার ইচ্ছা না হবারই কথা। চাল এবং খাতার তো ঢিপি জমে গেছে। এ ছাড়া বেশ কিছু নেপালী মোহরও জমেছে। কেউ কেউ আবার দেখছি মাংস ও ডিমও দিচ্ছে। লামার অবশ্য কোনো কিছুতেই না নেই।

২৯শে মে স্থানীয় জোঙ পোন-এর (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ধরনের পদাধিকারী) কাছ থেকে ডুক্‌পা লামার ডাক এল সদলবলে দেখা করবার জন্য। আমার সঙ্গীরা আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে বলল। ওরা বলল—তোমার ভয় কি, আমরা বলব তুমি লাদাখী। আমি মনে মনে ভাবলাম—ভালোরে! আমার কোন দায় পড়েছে! "আয় ষাঁড় গুঁতো আমায়", বলে ষাঁড়ের কাছে এগিয়ে যাবার? অতএব একটা অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়লাম। সকলেই লামার সঙ্গে জোঙ পোনের কাছারীতে দেখা করতে চলে গেলো। সন্ধ্যের মুখে সকলেই ফিরে এল। ওদের কাছে শুনলাম, জোঙ পোন আগেই ডুক্‌পা লামার নাম শুনেছিলেন, তাই যাওয়া মাত্রই যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেছেন। ডুক্‌পা লামাও কিছু ভবিষ্যৎ গণনা এবং স্বল্প কিছু পূজার্চনাও করেছেন। কিন্তু এখানে এখন একজনই জোঙ পোন আছে, অন্য জনের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত জোঙ পোনের স্ত্রী হালফিল কিছু কাজকর্ম দেখাশুনা আরম্ভ করেছে। নতুন জোঙ পোন এখনও নিয়োগ করা হয়নি। তিব্বতে সমস্ত গ্রামেই একজন করে মাতব্বর বা মুখিয়া থাকে। তার ওপরে থাকে এলাকাভিত্তিক জোঙ পোন বা জেলা অধিকর্তা। জোঙ শব্দের অর্থ কেল্লা এবং পোন অর্থে উচ্চপদাধিকারী বোঝায়। জোঙ পোনের অফিস বা জোঙ সাধারণত ছোট টিলা বা পাহাড়ের ছোট ছোট চূড়ার ওপরে হয়ে থাকে। তবে কুতীতে তেমন কোনো পাহাড় না থাকায় এখানকার জোঙ সমতলেই অবস্থিত। এলাকার আয়তন অনুযায়ী জোঙ পোনের ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত হয়। আগেই বলেছি প্রতিটি জোঙে দু'জন করে জোঙ পোন থাকে। যার একজন হয় গৃহস্থ অপর জন ভিক্ষু। কোথাও কোথাও এ সমস্ত পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। যেমন এখন কুতীতে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। জোঙ পোনের ওপর একমাত্র দলাই লামার অধিকার খাটে। বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ এই দুটোই তাদের দেখাশোনা করতে হয়। এক কথায় জোঙ পোনদের, তাঁদের নিজস্ব এলাকার প্রায় সর্বময় কর্তা বলা যায়। এদের অধিকাংশই লাসা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী। এই পদাধিকারীদের সকলেই কোনো না কোনোভাবে দলাই লামার সঙ্গে সম্পর্কিত। কেউ হয়ত তাঁর প্রিয়পাত্র। কেউ বা আত্মীয় সম্পর্কের কিছু। কেউ বা হয়ত প্রেমিকা বা রক্ষিতার সম্পর্ক ধরেও এই পদে আসীন হয়েছে। কুতীর যে জোঙ পোনটির আসন এখন খালি, তার বিরুদ্ধে প্রজারা অভিযোগ নিয়ে লাসা পর্যন্ত দরবার করেছিলেন। এখানকার প্রজাদের

ভাগ্য ভালো যে সচরাচর যা ঘটে না, তাঁদের ভাগ্যে তাই ঘটেছিল। দরবারের নানা ধরনের বাধা ডিঙিয়ে তাঁদের অভিযোগকে তাঁরা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। দলাই লামার কাছে অপরাধী প্রমাণ হয়ে যাবার দুঃখে সেই জোঙ পোন লাসার নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে।

যে সমস্ত নেপালী ব্যবসা উপলক্ষে এ দেশে বসবাস করতে আসে, নেপালের রাজাজ্ঞানুযায়ী তারা নিজেদের স্ত্রীকে সঙ্গে করে আনতে পারে না। এ জন্য প্রায় সমস্ত নেপালীই এ দেশে এসে স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে থেকে আর এক দফা স্ত্রীর বন্দোবস্ত করে নেয়। এই সমস্ত ভোটীয় স্ত্রীরা সাধারণত খুব বিশ্বাসী হয়। তিব্বতের কতকগুলো জায়গায় নেপালীদের কিছু বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। যেমন এখানে কোনো নেপালী-প্রজার বিচার একমাত্র নেপালী বিচারকই করতে পারে। নেপালীরা এই সমস্ত বিচারককে 'ডীঠা' বলে। কোরোং, কুতী, শীগচী, গ্যাংচী এবং লাসাতে নেপাল সরকারের ডীঠা আছে, এ ছাড়া লাসায় একজন সহকারী ডীঠা ও গ্যাংচীতে আছে একজন রাজদূত। ভোটীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র হবে নেপালের প্রজা কিন্তু মেয়ে হবে এ দেশের প্রজা। এ ধরনের সন্তানদের নেপালীরা বলে 'খচরা'। এ সমস্ত খচরা সন্তানদের এবং তাদের মায়েদেরও পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো অধিকারই থাকে না। পিতা যদি খুশী হয়ে সন্তানদের কিছু দেয়, তা'হলে সেটাই শুধু তারা ভোগদখল করতে পারে। এ সত্ত্বেও এরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে পিতা বা স্বামীর ব্যবসাপত্র দেখাশুনা করে, তার জন্য পরিশ্রম করে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

৩০শে মে পর্যন্ত উপায় ভেবে ভেবে অবশেষে হার মানলাম। এখান থেকে অগ্রসর হবার কোনো বন্দোবস্তই করতে পারলাম না। কুতী ছাড়িয়েই একটা নদী পড়ে, সেটা পার হবার জন্য যে সেতু আছে তার মুখেই ছাড়পত্র (লম-ইক অর্থে পাসপোর্ট) পরীক্ষার চৌকী। ওটা যদিও কোনো রকমে পার হতে পারি, কিন্তু আরও খানিকটা এগোলেই পড়বে লেপ বলে একটা জায়গা। সেখানেও শুনলাম আর এক দফা ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হয়। অতএব এখন চারদিকেই শুধু নিরাশা। তবে কি এতদূর পর্যন্ত এসে ফিরে যেতে হবে? অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসেবে ঠিক করলাম, ডুক্‌পা লামার সঙ্গ ত্যাগ করে মঙ্গোলীয় ভিক্ষু সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গ ধরব। উনি এখনও কুতীতেই অবস্থান করছেন। বিন্দুমাত্র দেরী না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাকে তাঁর সঙ্গী করে নিতে অনুরোধ করলাম। উনিও খুব আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন—আপনার মতো একজন সঙ্গী পেলে তো ভালোই হবে। আমি কালই লম-ইক যোগাড়ের জন্য যাব, যাতে খুব তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারি। আমি ভাবছি—উনি তো বলে খালাস, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ হবে কি? কারণ কয়েকদিন আগেই এখানে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কাছেই

শুনেছি যে তিনি ছ'মাস ধরে ঐ কুতীতেই অবস্থান করছেন। কিছুতেই লম-ইক যোগাড় করে উঠতে পারেননি। তাই এখন না পারছেন এগোতে, না পারছেন পিছুতে। আমারও না এমন ত্রিশঙ্কুর মতো দশা হয়! যাই হোক, শুধু ভেবে তো কোনো কিছু সুরাহা হবে না। লম-ইক যোগাড়ের ভার যখন সুমতি-প্রজ্ঞ নিয়েছেন, এখন দেখা যাক তিনি কি করতে পারেন! এই ভেবে নিজের আস্তানায় ফিরে এলাম। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা একজন নেপালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডুক্‌পা লামার ভূত-প্রেত তাড়ানো এবং ব্যবসায়ীটির ভাগ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবার জন্য পূজা-পাঠের আমন্ত্রণ ছিল। সকলের সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। অনেক স্ত্রী, পুরুষ এবং বাচ্চা ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে। প্রদীপের আবছা আলোয় মানুষের জঙ্ঘার হাড়ের তৈরি বীণ বাজানো চলছিল। এ ছাড়াও জোড়া নর করোটির ডমরু ইত্যাদি জাতীয় নানা ধরনের ভীতি-সঞ্চারী উপকরণ নিয়ে লামা এবং তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা মহা উৎসাহে ভূত তাড়িয়ে চলেছেন। এরপর প্রদীপের আলো আরও কমিয়ে দিয়ে শুরু হলো মন্ত্রপাঠ, সঙ্গে ডমরুর তীব্র নিনাদ এবং কয়েক মাসের শিশুর কান্নার মতো আওয়াজের বীণ বাজানো সমানেই চলছিল। সমস্ত পরিবেশটাই ভয়ে এবং ভক্তিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ। প্রায় অর্ধেক-রাত পর্যন্ত এ সব চলল। তারপর হলো শান্তিবারি বর্ষণ। অবশেষে সে দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল।

৩১শে মে ভোরবেলা থেকেই জিনিসপত্র গোছ-গাছ শুরু করলাম। ছাড়পত্রের দায়িত্ব যখন সুমতি-প্রজ্ঞ নিয়েছেন, তখন আমার সবদিক থেকে প্রস্তুত থাকাই ভালো। আমার সঙ্গে প্রায় ষাট-সত্তর টাকা ছিল। ত্রিশ টাকা তা থেকে আলাদা করে এক জায়গায় রেখে, বাকী টাকায় কিছু জিনিসপত্র কেনা-কেটা করলাম। আর অবশিষ্ট যা থাকল, সেগুলোকে তিব্বতী টংকায় বদল করে নিলাম। কুতীতে ভারতীয় এক টাকার বিনিময়ে নয় তিব্বতী টংকা পাওয়া গেলো। সবটাই আধ টংকার মুদ্রায় ভাঙিয়ে নিলাম। জিনিসপত্রের মধ্যে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চার টাকা দিয়ে একখানা ভোটীয় কম্বল কিনে নিলাম। ডাম গ্রামের যে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এখানে এসেছেন, উনি একটা পশমী টুপী আমাকে দিলেন। এ ছাড়া কিছু চিঁড়ে, চা, চীনা-চা, সত্তু ইত্যাদি কিনে একটা গাঁটরিতে বেঁধে নিলাম। এরপর থেকে হয়ত সারাটা পথ নিজের বোঝা নিজেকেই বইতে হবে, তাই সে দিকে লক্ষ্য রেখে জিনসপত্র যতটা পারলাম, কম কিনলাম। ডুক্‌পা লামা আমার নামে ভালো করে একখানা সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন। ইতিমধ্যে সুমতি-প্রজ্ঞও ফিরে এলেন এবং আনন্দের সংবাদ উনি দু'খানা ছাড়পত্রই সংগ্রহ করে এনেছেন। এ বার বিদায় নেবার পালা। দু'মাসের বেশী সময় কাটিয়েছি ডুক্‌পা লামা এবং তাঁর শিষ্যবর্গের সঙ্গে। ফলে সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজ বিদায়ের সময়ে বন্ধু

বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করলাম। ডুক্‌পা লামা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মঙ্গল কামনা করলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উপহার স্বরূপ কিছু চা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে দিলেন।

টশী-গণ্ডের পথে

ভার বহন করার বাঁকের মাঝখানে জিনিসপত্রের গাঁটরি রেখে বাঁকের একপ্রান্ত নিয়েছি আমার কাঁধে, এ ছাড়া এক হাতে রয়েছে লম্বা লাঠি। এ ভাবেই কুতী থেকে বের হলাম। খুব তাড়াতাড়িই সেই সেতুমুখে পৌঁছে দেখলাম, ছাড়পত্র পরীক্ষার জন্য কেউ নেই। সেতু পার হয়েই খানিকটা চড়াই। জীবনে প্রথম এ রকম বোঝা বইছি। তাই সামান্য চড়াই ভাঙতেই হাঁপিয়ে উঠলাম। মনে হলো সব মানুষেরই এটা অভ্যাস করে রাখা উচিত। কে বলতে পারে কার জীবনে কখন এর প্রয়োজন পড়বে। একটু পরেই আমরা কোশীর প্রধান ধারাটিকে বাঁয়ে রেখে তার কিনারা ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। এ দিকে রাস্তার তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কাঁধের বোঝা সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশ সেরের বেশী হবে না। কিন্তু এতেই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘাড় এবং হাঁটুতে ব্যথা ধরিয়ে দিলো। অথচ সুমতি-প্রজ্ঞ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সেরের বোঝা নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে গল্প করতে করতে চলেছেন। এ দিকে আমার এমন অবস্থা যে কথা শুনতেও তেতো লাগছে। নদীর তীর বেশ প্রশস্ত কিন্তু বৃক্ষহীন। মাঝে মধ্যে দু'একখানা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি যদিও দূর থেকে সেগুলো প্রথমে পাথরের স্তূপ বলে মনে হচ্ছিল।

ডাম গ্রামের সেই ভদ্রলোকের লপ্‌চী যাবার কথা। তাই তিনি সকালবেলাই কুতী থেকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর টশী-গণ্ডে থাকার কথা। সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন—চলুন আমরাও ওখানেই রাত কাটাব।

সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় দূর থেকে ফর-ক্যো-লিঙ মঠ (গুম্ফা) দেখতে পেলাম। মঠের আগেই একটা গ্রাম পড়ল। আমি ওখানে ভার বইবার লোকের খোঁজ করলাম, কিন্তু কেউ রাজী নয়। অবশেষে মঠে এসে পৌঁছালাম। মঠটি বাইরে থেকে দেখতে বেশ সুন্দর। ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষু এখানে বাস করেন। জিনিসপত্র বাইরে রেখে দেবদর্শনের জন্য ভেতরে গেলাম। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, মহাযান এবং বিভিন্ন তন্ত্রাদির প্রতীক নানা দেবদেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্তি। এ ছাড়া রয়েছে সুন্দর সুন্দর সব চিত্রপট এবং ধ্বজা। সমস্ত দেবালয়টি বড় বড় প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল। মঠের প্রতিষ্ঠাতা জে-চুন-মিলা-র মূর্তির সামনে এক পাত্র ছঙ অর্থাৎ কাঁচা মদ দেখে আমি সুমতি-প্রজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো মনে হচ্ছে গে-লুক-পা (পীত টুপীধারী লামা সম্প্রদায়) সম্প্রদায়ের মঠ। তবে এখানে মদের

ব্যবস্থা কেন? সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন, জে-চুন-মিলা ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে গে-লুক-পা সম্প্রদায়ও মদ নিবেদন করেন। তবে তাঁদের নিজেদের পান করা বারণ। মন্দিরের বাইরে এসে দেখি ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা তৈরি হয়ে গেছে। মঠের প্রশস্ত অঙ্গনে বসে কয়েক পেয়ালা চা পান করলাম। এরপর এখানকার ভিক্ষুরা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ তাঁর নিবাস বললেন ডে-পুঙ মঠ এবং আমাকে লাদাখের লোক বলে পরিচয় দিলেন। বললেন আমরা গ্যগর (ভারত)-এর দোর্জে-দন (বুদ্ধগয়া) তীর্থদর্শন করে ফিরছি, এখন গন্তব্যস্থল লাসা।

কুতী থেকে এ পর্যন্ত বোধ হয় মাইল পাঁচেক মাত্র হেঁটেছি। কিন্তু তার সঙ্গে বোঝা বইতে হয়েছে বলে শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে। আর এক পা নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মঠেই টশী-গঙের একটি ছেলে বলল, ডাম গ্রামের ভদ্রলোক টশী-গঙে পৌঁছেছেন এবং ওখানেই এখনও আছেন। সুমতি-প্রজ্ঞ তখনই ওখানে যাবার জন্য তৈরি হলেন। আমার মনে হলো ওখানে গেলে হয়ত কোনো ভারবাহক পেতে পারি তাই ক্লান্ত দেহে আবার চলতে শুরু করলাম। চারদিক সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে। আমরা ছেলেটিকে অনুসরণ করে চললাম। নদীর ধার ঘেঁসে বেশ কিছুটা গিয়ে সাঁকো পার হলাম। আরও বেশ খানিকটা হাঁটার পর চাষের ক্ষেত দেখতে পেলাম। এতক্ষণে বিশ্বাস হলো যে কাছাকাছি সত্যি কোনো গ্রাম আছে। কিন্তু যখন শুনলাম এটি আমাদের বাঞ্ছিত গ্রাম নয়। সেটি আরও খানিক দূরে, তখন শরীর এবং মনের অবস্থা যে কি দাঁড়াল তা বলার নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। অবশেষে ভারাক্রান্ত শরীরে এক রকম টলতে টলতে সেই ভদ্রলোকের আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছালাম।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে খুব খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি বসবার জন্য আসন পেতে দিলেন। আমি বোঝাটাকে ফেলেই সটান শুয়ে পড়লাম। চা তৈরিই ছিল। ভদ্রলোক চালের থুক্‌পা রান্না করতে বসে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাও তৈরি হয়ে গেলে, গরম গরম সেই থুক্‌পা তু'তিন পেয়ালা খেয়ে নিলাম। এরপর কয়েক পেয়ালা চা পানের পর শরীর কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হলো। এ বার আগামী কালের যাত্রাসূচী নিয়ে সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। সুমতি-প্রজ্ঞের ইচ্ছে লপ্‌চী হয়ে যাবার। লপ্‌চী হচ্ছে মহাতীর্থ (চা-ছেন-বো), এটি জো-চুন-মিলা-র সিদ্ধস্থান তাই তাঁর ইচ্ছে লপ্‌চী হয়ে যাবার। আমার কিন্তু লপ্‌চী যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই। কারণ এখন আমাদের লপ্‌চী যেতে হলে এই সোজা রাস্তা ছেড়ে একটা বড়-লা (গিরিসঙ্কট) অতিক্রম করে পূর্বদিকে তুম্বাকোশীতে যেতে হবে। সে জায়গাটা আবার খুবই উঁচুতে। সেখান থেকে আবার তুটো লা পার হয়ে তিঙরী, তারপর লপ্‌চী। একে তো প্রচণ্ড দুর্গম পথ তার ওপর পথে একটি জোঙ পড়বে কিন্তু এত কথা বোঝাব কাকে? তা'ছাড়া এখন লপ্‌চী যেতে অস্বীকার করলে

সেটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আমিই সুমতি-প্রজ্ঞের যাত্রা-সঙ্গী হতে চেয়েছিলাম। তার চেয়ে সুমতি-প্রজ্ঞের ইচ্ছাতেই সায় দেওয়া ভালো। শুধু অসুবিধা রইল একটা। সেটা আমার বোঝা। সুমতি-প্রজ্ঞ আমার বোঝা বইবার লোকের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় ওজর দেখাবার আর উপায় রইল না। অতএব স্থির হলো আগামী কাল খাওয়া-দাওয়া সেরে, দুপুরের দিকে রওনা হব।

পূর্বনির্ধারিত সময়েই আমরা লপ-চীর উদ্দেশ্যে টশী-গঙ ছাড়লাম। বোঝা বইবার দায় না থাকায় হাঁটতে ভালোই লাগছিল। আমাদের রাস্তা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে। ঘণ্টা দেড়েক বোধহয় হাঁটছি এ রকম সময়ে টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো। মোটা পশমী পোশাক পরণে থাকায় ভোটীয়রা এই সামান্য বৃষ্টিকে মোটেই আমল দেয় না। সামনের রাস্তাটা এক জায়গায় খানিকটা তির্যক-ভাবে পাহাড়ের ঢালু গা ঘেঁসে চলে গেছে। এখানকার মাটিও অন্য জায়গার তুলনায় অনেক নরম। সামান্য চাপেই ধারের মাটি, পাথর অল্প অল্প ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে রাস্তা থেকে কয়েকশো ফুট নীচে, দেখে তো আমার প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হবার যোগাড়। খালি মনে হচ্ছে একটু যদি এদিক-ওদিক হয় তা'হলে আমিও ঐ মাটি-পাথরের সঙ্গে কয়েকশো ফুট নীচের খাদে গিয়ে চির-বিশ্রাম নেব। কিন্তু এ সবে আমার সঙ্গীদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা বোঝা নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাকে পিছিয়ে পড়তে দেখে ভারবাহীদের একজন সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কিন্তু পাছে কেউ ভীরু অপবাদ দেয় এই ভেবে কারুর সাহায্য না নিয়েই দুরুদুরু বক্ষে কোনো মতে সেই ভয়ঙ্কর পথটুকু পার হলাম। ভয় পাবার প্রধান কারণ ছিল আমার পায়ের ঢিলে ভোটীয় জুতো-জোড়া, ও দুটোর দৌলতে যে কোনো মুহূর্তেই পা হড়কাতে পারতাম। আরও ওপরে ওঠার পর বৃষ্টির পরিবর্তে ছোট ছোট এলাচদানার মতো তুষারপাত হতে লাগল। আমরা বৃষ্টির মতো তুষারপাতকেও অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চললাম। বেলা দুটোর সময় লর্সেতে (লার নীচে বিশ্রাম নেবার জায়গা) পৌছালাম। এখনও পেঁজা তুলোর মতো তুষারপাত চলছে। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ গেল চমরী গাইয়ের গোবরের শুক্‌নো ঘুঁটে যোগাড় করতে আর কেউ কেউ লেগে গেলো পাথরে দড়ি বেঁধে ছোলদারী (ছোটতাঁবু) খাড়া করতে। এ জায়গাটা মনে হয় ভূ-পৃষ্ঠের চৌদ্দ-পনের হাজার ফুট উঁচুতে হবে। তুষারপাতের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডার প্রকোপ। কোনো মতে ছোলদারী খাড়া করে তার মধ্যে ঘুঁটের আগুন জ্বালানো হলো। আমরা সকলেই সেই আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসলাম, চায়ের জল চড়ানো হলো। কিন্তু জল আর গরম হতে চায় না, মনে হচ্ছিল যেন আগুনেরও ঠাণ্ডা লেগেছে। অনেক কষ্টে চায়ের জল ফুটল কিন্তু তাতে মাখন ঢেলে মন্থন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আর কারও নেই। সে জন্য প্রত্যেকের পেয়ালাতেই এক টুক্‌রো করে মাখন ফেলে দেওয়া হলো। সেই

আধা-গরম কালো চা-ই আমরা মহানন্দে পান করলাম। তাম গ্রামের সেই কুশোকের (ভদ্রলোকের) কাছে ছোট বিস্কুট এবং কমলালেবু দিয়ে তৈরি কিছু মিষ্টি ছিল, উনি সেগুলো ভাগ করে দিলেন। আগুনের যা হাল, তাতে থুক্‌পা তৈরি অসম্ভব, অন্যেরা সত্তু খেয়ে নিল। আমি অবশ্য চায়ে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেলাম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। কুশোক তাঁর লণ্ঠন জেলে আমাকে 'বোধিচর্যাবতার' থেকে কিছু পড়ে শোনাতে বললেন। আমার কাছে সংস্কৃতে লেখা একখানা বোধিচর্যাবতার ছিল, আর কুশোকের তিব্বতী ভাষায় অনূদিত উক্ত বইয়ের সমস্ত শ্লোকই তো মুখস্থ। আমি একটি করে সংস্কৃত শ্লোক পড়ি এবং ভাঙা ভাঙা তিব্বতীতে তা তর্জমা করে কুশোককে শোনাই আর কুশোক তখন ঐ শ্লোকের তিব্বতী অনুবাদ আমাকে শোনাতে থাকেন। এইভাবে অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের ধর্মালোচনা চলার পর সবাই কুঁক্‌ড়ে ছোলদারীতেই শুয়ে পড়লাম। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার প্রভাবে অস্নাত মানুষের শরীরের বা পোশাকের দুর্গন্ধ নাকে আসছিল না। কিন্তু সকালবেলায় বুঝতে পারলাম যে, আমার পোশাকে রাতারাতি কয়েকশো বাড়তি উকুন বাসা বেঁধেছে। তিব্বতী ছুপার আড়ালে লুক্কায়িত তাদের কয়েকটিকে খুঁজে বের করলাম।

সকালে ছোলদারীর বাইরে এসে দেখি সমস্ত জায়গাই বরফে ঢাকা। কমসে কম এক ফুট আন্দাজ বরফ পড়েছে। কোথাও কোথাও বরফ গলে গিয়ে ছোট ছোট জল-ধারার সৃষ্টি করেছে। এ রকম একটিতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আগুন জ্বালবার জন্য ঘুঁটে যোগাড় হবার আর কোনো সম্ভাবনা এখন নেই, তাই গতরাত্রির মতো বিস্কুট এবং মিঠাই সামান্য যা ছিল তাই খাওয়া হলো। সুমতি-প্রজ্ঞ চারদিকে দেখে বললেন —এখানেই যদি এ রকম তুষারপাত হয়ে থাকে তবে লাতে না জানি আরও কত বেশী হয়েছে। এ রকম অবিশ্রান্ত তুষারপাতের মধ্যে লপ্‌চী যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করাই ভালো। আমিও তো মনে মনে এটাই চাইছিলাম। সঙ্গী কুশোকের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তাঁকে লপ্‌চী যেতেই হবে। আবার নিজের বোঝা কাঁধে নিয়ে বরফে ঢাকা রাস্তায় কোনোক্রমে আন্দাজে পা ফেলে ফেলে নীচে নামছিলাম। দেখলাম উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতের পরিমাণও কমে আসছিল। অবশেষে তুষারহীন মাটিতে যখন পা রাখলাম, তখন সেখানে আবার বৃষ্টির উৎপাত চলছে। বেলা দশটা নাগাদ আমরা দু'জন ভিজতে ভিজতে আবার টশী-গঙে ফিরে এলাম। এ বার আশ্রয় মিলল গ্রামের গোবার (মোড়ল) ঘরে। তাঁর কাছে আশ্বাস পেলাম যে আগামী কাল বোঝা বইবার লোক উনি সংগ্রহ করে দেবেন। আমাদের দু'জনেরই জুতোর অবস্থা অতি শোচনীয়। মোড়লের ছেলেকে কিছু পয়সা দিতে সে ওগুলো সারিয়ে এনে দিলো। দিনমানে চমরীর দুধের ঘোলে সত্তু মিশিয়ে খেলাম।

রাত্রিতে সুমতি-প্রজ্ঞ ভেড়ার চর্বি দিয়ে থুক্‌পা রাঁধলেন। পরদিন সকালে উঠে শুনলাম, কুশোকের দলের কিছু লোক তুষারপাতের ফলে পথ হারিয়ে ফেলে এবং বরফে সূর্য রশ্মির প্রতিফলনে অন্ধ হয়ে গিয়ে কোনো মতে এখানে ফিরে এসেছে। সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন—ভাগ্যিস ফিরে এসেছিলাম, না হলে কে জানে হয়ত আমাদের হালও ঐ রকম হতো।

থোংলা পার হয়ে লঙকোরে

চা, সত্তু খেয়ে ৩রা জুন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। মালপত্র বহনের লোকও যোগাড় হয়েছে। তাই মহা উৎসাহে পথ হাঁটছিলাম। রাস্তাও সোজা এবং উৎরাই। সুমতি-প্রজ্ঞের বোঝাও খুব বেশী নয়, তা'ছাড়া তাঁর এ সমস্ত পথে বোঝা নিয়ে চলার অভিজ্ঞতা আছে। বেলা এগারটা নাগাদ এসে পড়লাম র্গে-লিঙ গ্রামে। সুমতি-প্রজ্ঞ এ পথে এর আগে আরও তিন বার এসেছেন। সে জন্য পথের পাশে জায়গায় জায়গায় তাঁর পরিচিত লোকজন ছিল। র্গে-লিং গ্রামেও আমরা মোড়লের বাড়িতেই আশ্রয় পেলাম। আমাদের গৃহস্বামীর বয়স বেশী নয়, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেশ বৃদ্ধা, বয়স পঞ্চাশের বেশী হবে। তিব্বতে এমন ঘটনা আকছারই ঘটে। প্রথমে অবশ্য এদের এই সম্পর্কটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। দেখলাম, গৃহকর্তা, মহিলার চুলের বিনুনি খুলে, চুল ধোয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করল। তারপর চাঙ প্রদেশের ধনুকের মতো শিরোভূষণ মহিলার চুলে বেঁধে দিলো। ভেবেছিলাম, মা-ছেলে বা ঐ রকম কোনো সম্পর্কই হবে। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতেই সুমতি-প্রজ্ঞ হেসে বললেন, এরা স্বামী-স্ত্রী।

সুমতি-প্রজ্ঞও তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক এবং ভবিষ্যৎ গণনায় পটু। চা পান করে তিনি গেলেন গ্রামের মধ্যে বেড়াতে। একটু পরেই ফিরে এসে আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আমি কারণ জানতে চাইলে উনি বললেন, এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা বন্ধ্যা মহিলাকে সন্তান হবার ওষুধ দিতে যাচ্ছি। আমাকে সঙ্গে নেবার কারণ সুমতি-প্রজ্ঞ তিব্বতী অক্ষর লিখতে জানেন না। আমি হেসে বললাম, ঐ বৃদ্ধার ওপর আপনি আপনার ওষুধ পরীক্ষা করবেন?

সুমতি-প্রজ্ঞ উত্তরে বললেন, এখানে হাসছেন হাসুন। কিন্তু দোহাই ওখানে গিয়ে যেন হাসবেন না। মহিলা ধনবতী, কিছু সত্তু, মাখন তো পাবই, আর যদি ওষুধ লেগে যায়, তা'হলে আগামী দিনের জন্য একঘর স্থায়ী যজমান পেয়ে যাব।

আমি তাঁর এ হেন প্রত্যয় দেখে বললাম, ওষুধ লেগে যাবার কথাটা ভুলে যান। তবে এখনকার মতো প্রাপ্তি-যোগের ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেতে পারে। সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে সেখানে গেলাম। দরজা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই বিরাটাকৃতি এক কুকুর প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। ভাগ্য ভালো, কুকুরটা শেকলে

বাঁধা ছিল। কুকুরের গর্জন শুনে ঘর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে কাপড় দিয়ে কুকুরের মুখ চেপে ধরে রইল। আমরা সেই ফাঁকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে ওষুধ এবং পুজোর মন্ত্র দিলেন। পরিবর্তে আমরাও সের দুই সত্তু, চর্বি এবং খানিকটা চা পেলাম।

পরদিন সকালে উঠে আবার বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের কাছাকাছি বড় গাছ-গাছড়া বিশেষ নেই। চাষের জমিতে এখন ফসল রোয়া চলছে। সারা শরীর লাল পশমে ঢাকা চমরীরা হাল টানছে। কাজের মধ্যে মধ্যে কেউ গলা ছেড়ে গানও ধরেছে। দুপুরে আমরা য়া-লেপ নামে একটা জায়গায় পৌছালাম। এখানে পুরানো একটি চৈনিক কেল্লা আছে। নদীর ওপারে কাঁচা দেওয়াল ঘেরা কেল্লার অবশেষ এখনও দেখা যায়। তিব্বতে চীনা প্রভুত্বের সময় এই কেল্লায় অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকত। কেল্লায় অবশ্য এখনও কিছু সরকারী কর্মচারী আছে। কিন্তু তাতে কেল্লার শ্রীহীনতা কিছু মাত্র ঘোচেনি। ঘর-দুয়ার ভাঙা, সংস্কারের অভাবে ধ্বংসপ্রায়। এখানেও সুমতি-প্রজ্ঞর পরিচিত বাড়ি-ঘর আছে। তারই একটিতে বসে চা পান এবং সত্তু ভোজন সেরে নিলাম। বাড়ির কর্ত্রীকে সুমতি-প্রজ্ঞ বুদ্ধগয়ার প্রসাদী কাপড়ের টুক্‌রো উপহার দিলেন। এখানে লম-ইক (ছাড়পত্র) জমা নিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ছাড়পত্রের কোনো প্রয়োজন হয় না। আমরাও আমাদের লম-ইক জমা দিলাম। গ্রামের বাইরে পা রাখা মাত্র এক ভীমকায় কুকুর তার হাড় চিবানো বন্ধ করে আমাদের দিকে তেড়ে এল। শীতের সময়ে এখানকার কুকুরের গায়ে বড় বড় লোম জন্মায়, যার ফলে ওদের ঠাণ্ডা লাগে না। আবার গরমকালে সেগুলো ঝরে পড়ে যায়। আমাদের দিকে তেড়ে আসা কুকুরটিরও গরমের প্রভাবে লোম ঝরা অবস্থা। আমরা তিন জন থাকায় বিশেষ ভয়ের কিছু ছিল না। য়া-লেপ ছাড়িয়ে আরও মাইল তিনেক চলবার পর লে-শিঙ-ডোল্মা গুম্ফা (মঠ) পড়ল। এই গুম্ফাটি কেবল মাত্র ভিক্ষুণীদের জন্যই নির্দিষ্ট। এখানে নদী ক্ষীণস্রোতা। একটু এগিয়ে সেই স্রোত পার হলাম। দু'পাশে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আবাদী জমি। নদী থেকে ছোট ছোট নালার সাহায্যে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেচের জন্য। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থো-লিঙ গ্রাম। এ গ্রামে বিশ-পঁচিশ ঘর লোকের বাস। গ্রামটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে। আমাদের ভার-বহনকারী লোকটি এ পর্যন্তই আমাদের সঙ্গে আসতে রাজী হয়েছিল। সে-ই আমাদের তার এক চেনা বাড়িতে নিয়ে গেলো। শুনলাম, রাজকর্মচারী বা কোনো বিশিষ্ট অতিথি গ্রামে এলে তাঁকে এই বাড়িতেই থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই রূপ বাড়িতে থাকা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক বাড়িতে উঠলাম। এটির অবস্থান একেবারে গ্রামের মাঝখানে। কিছু স্ত্রী-পুরুষ রোদে বসে সুতো কাটছিল এবং তাঁত বুনছিল।

সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখেই তারা জু-দলজ (আগন্তুককে নমস্কার) জানাল। খবর পেয়ে ওর আরও পরিচিত লোকেরাও এল। আমরাও বসলাম। বাড়িটি দোতলা, চারদিকে বাসের ঘর। ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্য মাটির ছাদে বড় একটা ফুটোও করা আছে।

সুমতি-প্রজ্ঞ চা বের করে গৃহকর্ত্রীকে দিলেন তৈরি করে দেবার জন্য। মহিলার মুখে তেলকালির একটা মোটা প্রলেপ। পরণের গরম কাপড়ের পোশাকের দশাও অনুরূপ। তিনি তাড়াতাড়ি চা করবার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। একটা বহুমুখী চুলোতে ভেড়ার নাদির আঁচ জ্বালানো হলো। আঁচ যাতে তাড়াতাড়ি ওঠে তার জন্য একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। চা ফোটার পর তাতে অল্প একটু ঠাণ্ডা জল আর লম্বা কাঠের চোঙার সাহায্যে খানিকটা নুন দেওয়া হলো। সুমতি-প্রজ্ঞ খানিকটা মাখন বের করে দিলেন। মাখন দিয়ে আট-দশ বার চা এমনভাবে মন্থন করা হলো যে ফেনা উঠে গেলো। সাধারণত দু'আড়াই হাত লম্বা পিচকারি জাতীয় একটা জিনিস দিয়ে মন্থন করা হয়; তবে এখানে তার অভাবে সাধারণ মন্থনী ব্যবহার করা হলো।

এরপর আমাদের থোঙ-লা (থোঙ নামক ঘাট বা গিরিসংকট) পার হতে হবে। ভার বহনের জন্য লোক নেওয়ার চেয়ে দুটো ঘোড়া নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এখান থেকে লঙকোর পর্যন্ত দুটো ঘোড়ার ভাড়া স্থির হলো আঠার টংকা যা আমাদের দেশের মুদ্রায় দু'টাকার কাছাকাছি। পরদিন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে রওনা হলাম। নির্জন রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষহীন পাহাড়ের সারি। পাশেই ক্ষীণস্রোতা কোশী ধীর গতিতে প্রবহমানা। পথে কোনো কোনো জায়গায় পরিত্যক্ত জনপদ চোখে পড়ল। দেখলাম কিছু বাড়িঘর, এমন কি বাড়ির দেওয়াল পর্যন্ত এখনও অটুট। দেখেই বোঝা যায় একদিন এখানে বেশ বড়-সড় জনবসতি এবং তদনুরূপ চাষ-আবাদ ছিল। তখন নিশ্চয়ই কোশীও অনেক প্রশস্ত এবং বেগবতী ছিল, না হলে এত ক্ষেতের সেচকার্য হতো কিভাবে? এই নির্জন রাস্তায় চোর-ডাকাতের উপদ্রবও আছে বেশ। আগের গ্রামে শুনে এসেছি, কিছু দিন আগে এই পথে দু'জন যাত্রীকে তস্করেরা খুন করে ফেলেছে। বস্তুত তিব্বতে মানুষের প্রাণের মূল্য একটা কুকুরের প্রাণের চেয়ে বেশী নয়। রাজদণ্ড কিম্বা আইনের ভয় এ দেশে মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। সুমতি-প্রজ্ঞ অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন।

ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছি, আশপাশে সমতল ভূমির পরিমাণও কমে আসছে। অবশেষে আমরা পৌছালাম লর্সে-অঞ্চলে। এর ওপারেই সামনে লা (অর্থাৎ গিরিসঙ্কট বা ঘাট)। এখানে কিছু লোক আগেই ওপার থেকে এসে চা তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল। একে ঠাণ্ডা, তার ওপর ঘুঁটে ভেজা থাকায় এবং আমাদের কাছে হাত পাখা না থাকায় আগুন জ্বালানো অসম্ভব দেখে, আমরা

আমাদের চা ওদের সঙ্গেই মিশিয়ে দিলাম। ঘোড়াগুলোকে খানিক চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা চা পান করতে করতে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলাম। লা-এর ওপার থেকে আসা যাত্রীদের কাছেই শুনলাম এই লা-টিতে বরফ নেই। এই লোকগুলোর মুখের রঙ পুরানো তামার মতো। তিব্বতে উঁচু পার্বত্য পথে প্রায়শই যাদের যাতায়াত করতে হয় তাদের শরীরের যে সমস্ত অংশ ভালো মতো আচ্ছাদিত থাকে না তার রঙ এই ধরনের হয়।

চা পান সেরে আবার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলাম। এবার চড়াই, তবে তেমন কঠিন নয়। অবশ্য ঘোড়ার পিঠে থাকার জন্যও এ রকম মনে হতে পারে। যতই এগোচ্ছি রাস্তাও ততই সরু হচ্ছে। অবশেষে শুধুমাত্র নদীর ধারটুকুই পথ হিসেবে অবশিষ্ট রইল। তারও জায়গায় জায়গায় গতকালের বরফ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এ বার আমরা নদীর ধার ছেড়ে ডান দিকে বিস্তৃত পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম। এ দিকের বাতাস খুবই হালকা, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আর সেটা কেবল মানুষেরই নয় জন্তু জানোয়ারদেরও। মনে হলো বোধ হয় গিরিসঙ্কট বা লা-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। তিব্বতে এ রকম প্রত্যেকটি লা-এরই একটি করে দেবতা বর্তমান। সে জন্য লা-এর কাছাকাছি এসে লোকে ঘোড়া থেকে নেমে যায়। পাছে দেবতা অসন্তুষ্ট হন। সুমতি-প্রজ্ঞ এবং অন্যান্য ভোটীয়রা (তিব্বতীরা) শো-শো-শো শব্দে দেবতার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিলেন। এখানটায় দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তুষারাচ্ছাদিত পর্বতমালা দেখা যাচ্ছিল। ওটা হিমালয়। তার বিপরীত দিকেও পাহাড়ের সারি। তবে ওগুলোর চূড়ায় তুষার জমে নেই। কিন্তু উপত্যকায় এদিক-ওদিক কিছু তুষারপাতের চিহ্ন পড়ে আছে। এ বার উৎরাই শুরু। আমার ঘোড়াটি একটু মন্থরগতির। তা'ছাড়া ঘোড়া চাব্‌কানোর অভ্যাস না থাকায় সকলের চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়লাম। অচেনা জায়গা তা'ছাড়া পথে লোকজনের চলাচলও নেই, যার ফলে একটু ভয় ভয় ভাবও মনের মধ্যে এসে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ চলার পরে সামনে ছোট একটি লোক-বসতি পেয়ে, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সুমতি-প্রজ্ঞের পৌঁছানোর প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমি লঙকোর পৌঁছালাম। বলা বাহুল্য আমার দেরী করে আসায় সুমতি-প্রজ্ঞ বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

লঙকোর-তিঙরী

লঙকোর একটা ছোট গ্রাম। এর অবস্থান তিঙরীর বিশাল প্রান্তরের একেবারে শীর্ষদেশে বলা যায়। লঙকোর-এর বিহারটির খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'তঞ্জুর' (বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক ত্রিপিটকের তিব্বতী অনুবাদের নাম 'কঞ্জুর'। 'তঞ্জুর', সেই 'কঞ্জুর' সম্পর্কে আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদির সংগ্রহের নাম) সম্পর্কিত কিছু

বইপত্র এখানে মূল সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। গ্রামের কাছে পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন মঠের ভাঙা দেওয়াল, ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই বিহারটি গোর্খা সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর এটিকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন মঠটির ভিক্ষুদের কিছু কিছু বংশধর এখনও লঙকোর গ্রামে আছে। তারাই ওখানে নতুন করে ছোট একটি মঠ স্থাপন করেছে। তিব্বতের প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হলো নিগ্-মা-পা (পুরাতন)। এদের উদ্ভব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। একাদশ শতাব্দীতে কর-যুগ-পা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাক্য-পা এবং ষোড়শ শতাব্দীতে গে-লুক-পা গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। তিব্বতের প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলতে এই চারটিকেই বোঝায়। এখানে এসে সুমতি-প্রজ্ঞ আর কিছুতেই অগ্রসর হতে চাইছেন না। জিজ্ঞেস করায় বললেন —এই যাত্রাপথেই আমাকে কিছু রোজগার করে নিতে হবে, নইলে লাসাতে গিয়ে খাব কি। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমার প্রস্তাব মতো তিনি যদি তাড়াতাড়ি লাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথে অপ্রয়োজনে দেরী না করেন, তবে লাসা পৌঁছে আমি তাঁকে পঞ্চাশ টংকা দেব। সুমতি-প্রজ্ঞ এ প্রস্তাবে রাজী হলেন।

৭ই জুন বের হওয়া স্থির ছিল। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত লোকের জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হলাম। লঙকোর থেকে কিছু শুক্‌নো মাংস এবং মাখন নিয়ে নেওয়া হলো। দুপুরের পর নিজেদের বোঝা আবার নিজেরাই পিঠে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। লঙকোর থেকে তিঙরীর দূরত্ব চার-পাঁচ মাইলের কম নয়। কিন্তু পুবদিকে তিঙরীর কেল্লা এখান থেকে খুব কাছে মনে হচ্ছিল। বোধ হয় এ অঞ্চলের বাতাস হাল্কা হওয়ার জন্যই অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও এ জায়গার উচ্চতা প্রায় চৌদ্দ হাজার ফিট, তবুও উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে পথ হাঁটতে হাঁটতে বেশ গরম লাগতে শুরু করল। মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে কুশের মতো ছোট ছোট ঘাস গজিয়েছে। বিশাল মাঠে অনেক ছাগল, ভেড়া, চমরী আর দু'একটা জংলী গাধাও (কিয়াং) চরছে। এ দিককার কুকুরগুলো যেমন আকৃতিতে বড় তেমনি হিংস্র। আমি তো সব সময়েই একা গ্রামে যেতে ইতঃস্তত করতাম। রোদের মধ্যে পথ চলতে চলতে পিপাসা পেয়ে যাচ্ছিল বার বার। সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন, চা খাওয়া যাক, পিপাসার ভাব কমবে।

সামনে একটা ছোট মতো গ্রাম পাওয়া গেলো। এ গাঁয়ের বাড়িগুলো ছোট ছোট। গাঁয়ের এক গরিব বৃদ্ধ আমাদের নিয়ে গেলো তার কুটিরে। ওখানে চা তৈরি হতে লাগল। বৃদ্ধ, সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এক সময়ে সঙগে-ওপা-মে (অমিতাভ বুদ্ধ) সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিব্বতীরা টশী লামাকে অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বলে মানে এবং সে জন্য তাঁকেও অমিতাভ বলেই সম্বোধন করে। সে যখন শুনল যে টশী লামা

বর্তমানে চীনে আছেন এবং আপাতত তাঁর ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন বৃদ্ধের মুখের ভাব করুণ হয়ে উঠল। কান্না-ভেজা কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল তা'হলে উনি কি আর কোনো দিনই ফিরে আসবেন না? সাধারণ তিব্বতীদের মধ্যে এ ধরনের সরল মানুষের সংখ্যাই বেশী। ইতিমধ্যেই অপরিচিত লোক দেখে বেশ কয়েকটি কুকুর বাড়ির দরজার কাছে হাজির হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে সেগুলোকে তাড়ানোর পর নিশ্চিন্ত হলাম।

চা খেতে খেতে সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন, পাশের গ্রামের শোকর বিহারে এখন চাষাবাদ চলছে। ওখানকার প্রধান ভিক্ষু নম-সে আমার পূর্ব পরিচিত। ওখানে গেলে পথের জন্য হয়ত কিছু মাংস, এবং মাখন পাওয়া যেতে পারে। তা'ছাড়া বোঝা বইবার লোকও জোগাড় হতে পারে। দ্বিতীয়টির আশাতেই আমি তাঁর সঙ্গে গে-লোঙ (ভিক্ষু) নম-সে-র কাছে যেতে রাজি হয়ে গেলাম। চা শেষ করেই বেরিয়ে পড়লাম। শোকর বিহার এখান থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কুকুরের উৎপাত থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্য বেচারা বৃদ্ধ লাঠি হাতে নদীর ধার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। গে-লোঙ নম-সে-র মঠেরও চারদিকে কয়েকটি কুকুর বাঁধা। দূর থেকে জানান দিতেই একজন বেরিয়ে এসে কুকুর সামলাতে লাগল, আমরাও বিহারে প্রবেশ করলাম। ভিক্ষু নম-সে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আমাদের দেখে বললেন, আরে সোস-পো (মঙ্গোল) গে-লোঙ (ভিক্ষু) যে। আমরা নীচে রান্নাঘরে বসলাম, চা এবং সত্তু এল। আমার সত্তুতে বিশেষ রুচি ছিল না, শুধু চা-ই নিলাম। শোকর বিহারের কিছু সম্পত্তি আছে। তার মধ্যে কিছু চাষের জমিও আছে। আমাদের সামনে বসে মঠের খাজাঞ্চী মশাই জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসেব কষছিলেন। পাথর আর হাড়ের টুক্‌রো গুণে গুণে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হচ্ছিল, তারপর আবার দুটোকে আলাদা আলাদা গুণে পৃথক আর এক জায়গায় রাখা হলো। আমরা হয়ত এ রকম হিসেব-পদ্ধতি দেখে কৌতুক বোধ করব, তবে এ কথাও ঠিক, এ রকম হিসেব শিখতে আমাদেরও প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। খুব সহজে পারব বলে মনে হয় না।

এক দফা চা পর্ব চুকিয়ে গে-লোঙ নম-সে-র ঘরে গেলাম। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। উনি পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। কামরার মধ্যে বেশ কিছু মূর্তি এবং সত্তু ও মাখনের তোর্মা (বলিপিণ্ড) সুন্দরভাবে সাজানো। আমাদের জন্য তিনি আবার চায়ের ব্যবস্থা করলেন। গঙ্গা-যমুনা (তামার ওপর রূপার কাজ করা) ট্রের ওপর চীন দেশের পেয়ালায় চা এল। আমরা খুব সামান্যই পান করলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে বললেন, আপনি কয়েকদিন এই মঠে থাকুন, ইতিমধ্যে আশপাশের গ্রামগুলোতে আমার যে সব পরিচিত লোকজন আছে, তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমার থাকার ব্যবস্থা

হলো কঞ্জুর (ত্রিপিটকের তিব্বতী অনুবাদ) পুস্তকালয়ে। এখানে একখানা প্রাচীন হাতে লেখা কঞ্জুর পেলাম। কঞ্জুরটি একশো খণ্ডে বিভক্ত এবং এক একটি খণ্ডের ওজন দশ সেরের কম নয়। আমি একটি খণ্ড খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে কঞ্জুরের খণ্ডটি পড়তে দেখে বললেন —আচ্ছা ধরুন যদি এই কঞ্জুর গ্রন্থটি আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয়, আপনি কি নিতে রাজী ?

আমি বললাম —অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজী।

পরদিন সকালে সুমতি-প্রজ্ঞ তাঁর পরিচিত লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন, আর আমি রইলাম বই নিয়ে। কিন্তু বই নিয়ে বেশীক্ষণ থাকা গেলো না। দুপুরের মধ্যেই সুমতি-প্রজ্ঞ ফিরে এলেন এবং বললেন —চলুন, আজই বেরিয়ে পড়ি। সেদিন ৮ই জুন। দুপুরের পর শোকর বিহার ছেড়ে তিঙরী অভিমুখে রওনা হলাম। তিঙরী এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন —ওখানে আগে যিনি জোঙ পোন (জেলা অধিকর্তা) ছিলেন, তিনি আমার পরিচিত, ভাবছি তাঁর ওখানে গিয়েই উঠব।

আমার ইতস্তত ভাব দেখে উনি আবার বললেন —আপনার আর কোনো ভয় নেই। এখানে কেউ আপনাকে গ্যগর-পা (ভারতীয়) বলে চিনতে পারবে না। তিঙরী আশপাশের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট এলাকা, এখানে ছোট মতো একটা কেল্লা আছে। এখন অবশ্য তার ভগ্ন দশা। তবে এখনও সেখানে সামান্য কিছু সৈন্য আছে। তিঙরী গ্রাম, আয়তনে কুতী অপেক্ষা বড়। কিন্তু এখানে নেপালী ব্যবসায়ীদের কোনো দোকান-পাট নেই। পুরানো আমলের জের হিসেবে কিছু চীনা বংশীয়েরা এখানে বাস করে। পুরানো জোঙ পোনের বাড়ি গ্রামের এক প্রান্তে। আমাদের দেখতে পেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন এবং নিজেই সুমতি-প্রজ্ঞের পিঠের বোঝা নামালেন। তাঁর ভৃত্যরা এগিয়ে এসে আমাকেও বোঝা থেকে মুক্ত করল। প্রশস্ত অঙ্গনে গালিচা পাতা হলো। চা আর সঙ্গে প্লেটে শুকনো মাংস এবং সেগুলো কাটার জন্য ছুরি এল। আমাকে দেখে উনি প্রশ্ন করলেন —ইনি তো লদা-পা (লদাখ-বাসী), তাই না ? তারপর নিজের হাতে শুকনো মাংস কেটে কেটে আমাদের দিতে লাগলেন। আমি মাংস নিলাম না দেখে, সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন —নতুন দেশ থেকে এসেছে, লাদাখে মাংস সেদ্ধ না করে কেউ খায় না। চা খেতে খেতে বর্তমান জোঙ পোনও এলেন। তাঁর জন্য রূপোর পেয়ালায় দামী মদ এল। আমাকে দেখে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছিল না যে আমি হচ্ছি সেই ভারতীয়দের একজন —যারা তিব্বতবাসীর আতিথেয়তার অপব্যবহার করে এ দেশের জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিব্বতের রাজনৈতিক, সামরিক গোপনীয় তথ্যাদি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে অনেক বার। যার ফলে তিব্বতীরা তাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন সবচেয়ে বেশী সন্দেহের ভাব পোষণ করে।

আমাদের গৃহস্বামী বেশ রসিক লোক। সন্ধ্যে হতে না হতেই তিনি পেয়ালার পর পেয়ালা চড়াতে লাগলেন। লোকে বলে, এই অতিরিক্ত পানাসক্তিই তাঁর পদচ্যুতির কারণ। এরপর অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতেই তিনি বীণ বাজাতে বাজাতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। চাকর-বাকরদের বলে গেলেন, আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এখানেও আমাদের স্থান হলো রান্নাঘরে। রান্নার দায়িত্ব একজন অনীর (ভিক্ষুণী) ওপর ন্যস্ত। তিব্বতে সমস্ত ভাই মিলে একটি স্ত্রী গ্রহণ করে। যাকে পাণ্ডব বিবাহ বলে সে রকমই ব্যাপার আর কি। এর ফলে সমস্ত মেয়ের কপালে স্বামী জোটা সম্ভব হয় না। তখন এই সমস্ত মেয়েরা চুল ছেঁটে ভিক্ষুণী হয়ে কোনো মঠে চলে যায় কিম্বা ঘরে থেকে যায়। আমাদের সামনের এই অনীটি একেবারে সাক্ষাৎ মা কালী। সারা শরীরে তার তেল-কালির এমন মোটা প্রলেপ জমেছে, যা আগে কোথাও কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। তার কালো মুখ-মণ্ডলে লাল লাল দুটো ঘূর্ণায়মান বড় বড় চোখ বর্ণনার অতীত। অনীটি থুক্‌পা রাঁধছিল। হাঁড়ি থেকে হাতায় করে খানিক থুক্‌পা তুলে সে হাতে ঢেলে নিয়ে চেখে দেখল। তারপর সেই হাত তার পোশাকেই মুছে ফেলল। ভাগ্যিস এ দেশের লোক খাবার-দাবার হাতে ঘাঁটাঘাঁটি না করে হাতা-চামচের সাহায্যেই করে। খাবারে হাতের ছোঁয়া খুব কমই লাগে। থুক্‌পা এবং চা খেতে খেতে প্রায় রাত্রি দশটা বাজল। গৃহস্বামীও এই সময় বীণ বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরলেন। এসেই আমাদের ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ ওঁকে বললেন চলুন না, আমাদের সঙ্গে লাসায় বেড়িয়ে আসবেন। উনি বললেন —আমার তো যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু চাম (চাম কুশোক —ভদ্রমহিলা) যেতে চান না। বলে পেছনে স্ত্রীকে দেখালেন। পরবর্তী কালে আমি যখন লাসাতে ছিলাম, তখন এ দেশের নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে এই দম্পতিকে লাসার রাজপথে দেখেছিলাম। সে সময় এঁরা খুব সাধারণ পোশাকে ওখানে ঘোরা-ফেরা করছিলেন। আর আমি ছিলাম মোটামুটি দামী পোশাকে, যেমন লাল রেশমের পুস্তিন, পায়ে বুট ইত্যাদি। আমি ওঁদের দেখেই চিনতে পেরেছিলাম, তেমনি ওঁরাও আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। সে দিন ইনি আমাকে লাদাখী বলেই সম্বোধন করেছিলেন। আমি তখন আমার সব কথা তাঁকে খুলে বলি এবং তাঁর আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। লাসাতেও লোকে তাদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা গোপন করে সাধারণভাবে জীবন যাপন করে। এর কারণও নেপালেরই মতো রাজকর্মচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করা। তিঙরীতে এই ভদ্রলোকের অনেকগুলো অশ্বতর (খচ্চর) আছে, যেগুলো কুতী-লাসা পথে মাল পরিবহণের কাজে ভাড়া খাটে।

পরের দিন ভোরে আমরা বের হবার জন্য তৈরি। আমাদের গৃহস্বামী, আরও

দু'চার দিন থেকে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগলেন। আমরাও সবিনয়ে আমাদের অসুবিধার কথা বললাম। পাথেয় হিসাবে উনি কিছু শুকনো মাংস, চর্বি, সত্তু এবং চা দিয়ে দিলেন। এখানেও বোঝা বইবার লোক পাইনি। অতএব স্বাবলম্বী হতে হলো বাধ্য হয়ে। সৌভাগ্যের ব্যাপার রাস্তায় চড়াই ছিল না। আমরা ফুঙ নদীর ডান-দিক ধরে পূর্বদিকে চলছিলাম। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। ঘণ্টাখানেক চলবার পর নদীর বাঁ-দিকে শিব-রী-র পাহাড় দেখা গেলো। এ দেশে অধিকাংশ পাহাড়ই বৃক্ষহীন এবং মাটির তৈরি। কিন্তু শিব-রী-র এই পাহাড়টি পুরোপুরি পাথরের। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য লোকে ওটাকে গ্যগর (ভারত)-এর পাহাড় বলে। শিব-রী-র এই পাহাড়টি এ দেশের লোকের কাছে খুবই পবিত্র স্থান। আজকাল ভক্তেরা একেও পরিক্রমা করে। পরিক্রমার পথে পথে চিত্রকূটের মতো অনেক মন্দির। বহু লোক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং দণ্ডবৎ করছিল। সকাল আটটা থেকে আমাদের চলা শুরু করে দ্বিপ্রহরে একটি গ্রামে পৌঁছে চা পানের জন্য সেখানে থামলাম। চা পানে ও গল্প-গুজবেও বেশ দেরী হয়ে গেলো। শুনলাম, পরবর্তী গ্রাম নাকি আরও অনেক দূরে। অতএব বাধ্য হয়ে এই গ্রামেই রাত্রিবাস স্থির হলো। থাকবার জন্য যে বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে জানল যে, তার ঘরে স্থানাভাব। সে অন্য এক বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলো, সেখানে দুটো ঘর, একটিতে একজন অসুস্থ ভিখারী শ্রেণীর লোক শুয়েছিল। আমরা দ্বিতীয় ঘরটিতে আমাদের বিছানাপত্র পাতার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলাম। খানিক পরেই সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন —এখানে থাকা ঠিক নয়, এ সব গ্রামে লুঠেরা-তস্করদের উপদ্রব খুব বেশী। রাত্রিতে এ রকম অরক্ষিত জায়গায় আমাদের ওপর যদি হামলা হয়! কে বলতে পারে যে, এ জন্যেই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে কিনা? সুমতি-প্রজ্ঞর কথাগুলোর যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। অতএব আবার জিনিসপত্র গুটিয়ে ফেলে, অন্ধকারের মধ্যেই এক বৃদ্ধার বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বৃদ্ধার ঘরে আরও দু'জন অতিথি ছিল। এরা শিব-রী পরিক্রমা করতে যাচ্ছে। ওদের মুখেই শুনলাম, এবার নাকি শিব-রী পরিক্রমায় খুব ভিড় হবার সম্ভাবনা। সুমতি-প্রজ্ঞ তো পরিক্রমার নামে লাফিয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে নিরস্ত করে বললাম —এবারকার মতো সোজা লাসায় চলুন। আগামী বছর আমরা দু'জনে একই সঙ্গে এই পরিক্রমায় আসব। এরপর আমি ঐ পরিক্রমাকারীদের একজনকে কিছু পয়সা দিয়ে বললাম —বিশেষ প্রয়োজন থাকায় আমরা পরিক্রমায় যেতে পারছি না। আপনারা অনুগ্রহ করে শিব-রী রেন-পো-ছেতে আমাদের নামে পুজো দিয়ে দেবেন।

এই গ্রামে পেতলের তৈরি একটা সুন্দর বজ্রযোগিণী মূর্তি দেখতে পেয়েছিলাম। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যখন লোকে এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল, তখন এ গ্রামেরই

কোনো ভোটীয় সে সময় সৈন্য দলে ছিল, সে-ই এটিকে কোনো মঠ বা বিহার থেকে লুট করে এনেছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ যুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্যদের চেয়ে তিব্বতী সৈন্যরাই লুটপাট করেছে বেশী।

ভোর হতেই যাত্রা শুরু করি। পরবর্তী গ্রামের দেখা যখন পেলাম তখন বেলা দশটা। প্রথমে আমরা যে বাড়িতে গেলাম, সেটি সুমতি-প্রজ্ঞের মনোমতো হলো না। সুতরাং তাঁর পরিচিত লোকের ঘরে আশ্রয় নিতে চললাম। গ্রামটি, বড় বড় কুকুরে ভর্তি। আমাদের সঙ্গে এক বালক আগে আগে পথ দেখিয়ে চলছিল, তার পিছনেই আমি, সুমতি-প্রজ্ঞ একেবারে পেছনে। গ্রামের বেওয়ারিশ কুকুরগুলো আমাদের দেখে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে দিলো। যেই আমরা সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত লোকের বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, অমনি সে বাড়ির দরজায় বাঁধা কুকুরটা এত জোরে চিৎকার করে আমাদের দিকে তেড়ে এল, যে টানের চোটে কুকুরটার শেকল গেলো ছিঁড়ে। সুমতি-প্রজ্ঞ একটা সিঁড়ি বেয়ে চট করে দোতলায় উঠে গেলেন। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে আমি আর ছেলেটি লাগালাম ছুট। কুকুরটা আমাদের ফেলে, দোতলায় সুমতি-প্রজ্ঞকেই তেড়ে গেলো। রক্ষা, ইতিমধ্যেই বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এসে কুকুরটিকে সামলে নিল। সুমতি-প্রজ্ঞ তো আমাকে যাচ্ছেতাই করে বকলেন—কিন্তু তিনি একটা বিষয় ভুলে যাচ্ছিলেন যে, চৌদ্দ বছর এ দেশে থেকে, এখানকার গৃহপালিত পশুদের আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি খানিকটা নির্ভয় হতে পেরেছেন। আর আমি সবে মাত্র এ দেশে পা দিয়েছি, আমার মধ্যে ও রকম সাহস না থাকাটাই তো স্বাভাবিক। উনি সব সময় আমাকে বোঝাতেন, কুকুরের শরীর অত বিশাল হলে কি হবে, সে তুলনায় এদের সাহস এবং তেজ খুবই কম।

এ বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং চা পান সেরে আবার চলা শুরু হলো। বাড়িতে কর্তা ছিলেন না, গৃহিণী তিন চার সের সত্তু দিতে চাইলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ সত্তুটা আমাকে বেঁধে নিতে বললেন। এমনিতেই আমি আমার বোঝা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, তার ওপর আবার তিন-চার সের সত্তু। আসলে আমার বোঝা বইবার কষ্টটা উনি আন্দাজই করতে পারতেন না। ওঁর ধারণা, উনি যখন ভারি বোঝা বইতে পারেন, তখন আমারও তা পারা উচিত। মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আমাদের যথেষ্ট সত্তু আছে আর প্রয়োজন হবে না। সুমতি-প্রজ্ঞ আমার ওপর আর একদফা কুপিত হলেন। অনেকক্ষণ হাঁটার পর আমরা চা-কোর-এর কাছাকাছি পৌঁছালাম। চা-কোর-এর প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, পাথরে গাঁথা কেল্লা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ এখনও পড়ে আছে। এক সময় এখানে এক প্রতাপশালী রাজবংশ রাজত্ব করত। পথে মাটির দেওয়ালঘেরা একটা জায়গা পড়ল। এটা ছিল চীনা ফৌজের ছাউনি। তখন এ দিকে যাতায়াতের পথেও কঠোর নিয়ম জারী ছিল। বিনা আজ্ঞাপত্রে এ দিকে যাওয়া-আসা সম্ভব ছিল না।

চা-কোর গ্রামের বাড়ি ঘরও গ্রামটির পড়তি দশারই সাক্ষী দেয়। এখানেও সুমতি-প্রজ্ঞের চেনা লোক ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবু অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বাড়ির অন্যান্যরা আমাদের থাকতে দিতে রাজী হলো। সন্ধ্যায় এক পশলা শিলাবৃষ্টি হয়ে গেলো। তারপর আর এক দফা নামল মূষল ধারে। বাইরের উঠোনে জল থৈ থৈ করতে লাগল, মাটির ছাদ চুঁইয়ে ঘরের ভেতরেও জল পড়তে লাগল। খানিক পরে বাড়ির মালিক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা (চাম-কুশোক) এলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ এঁর পরিচিত। সকাল থেকেই সুমতি-প্রজ্ঞ আমার ওপর রেগে ছিলেন, এখন বাড়ির কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে আমার নামে একপ্রস্থ নিন্দাবাদ শুরু করলেন। আমি ও-দিকে কান দিলাম না, কারণ আমি ভালো করেই জানাতাম যে মানুষটি মুখে যত উষ্মাই প্রকাশ করুক না কেন, ওর মনটা সত্যিই ভালো।

১১ই জুন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরেই আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম, পূবদিকে খানিক এগিয়ে ফুঙ নদী পার হলাম। নদীটি ছোট হলে কি হবে, বেশ প্রশস্ত এবং এক কোমর গভীর জল। জল এত ঠাণ্ডা যে পার হবার সময় মনে হচ্ছিল উরু দুটো যেন কেউ কেটে ফেলছে। অতি কষ্টে নদী পার হয়ে মেষ পালকদের আড্ডায় গিয়ে খানিক বসে, চা খেলাম। তারপর আবার চলা শুরু করলাম। হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর কাঁধে বোঝা। সত্তুতে আমার বিশেষ রুচি না থাকায়, আমার খাওয়া ঠিকমতো হচ্ছিল না। কারণ অন্য পরিবর্ত খাদ্য কিছুই পাইনি, ফলে একদিনেই শরীর বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। পথে আরও এক জায়গায় চা খাওয়া হলো। লঙ-কোর থেকে কিছু লোক শো-কর জোঙকোতে যাচ্ছিল, পথে তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেলো। আমরাও তাদের সঙ্গেই চলা শুরু করলাম। আমি কোনো মতে, শুধু মাত্র মনের জোর সম্বল করে হাঁটছিলাম। পথে দুটো ছোট ছোট লা পড়ল। প্রথমটি কোনো মতে পার হলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টি পার হবার সময় আমার আর ক্ষমতা ছিল না। আমার অবস্থা দেখে লঙ-কোরবাসীদের একজন সহানুভূতিশীল হয়ে আমার বোঝাটা নিজে তুলে নিল। এ বার তবু হাঁটাটা কিছু সহজ হলো। পাহাড় থেকে নেমে আবার একটা নদী পার হয়ে পথে আর একবার বিশ্রাম নিয়ে বেলা চারটের সময় শো-কর গিয়ে পৌছালাম।

শো-কর বিহার

শো-কর এসেও আমরা লঙ-কোরবাসীদের সঙ্গ ছাড়লাম না, ওরা রাত্রিবাসের জন্যে যে বাড়িতে উঠল আমরাও সেখানে গেলাম, বাড়িটা তিব্বতী সৈন্য বাহিনীর জনৈক প্রাক্তন সৈনিকের। সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত একজন ভিক্ষু শো-কর বিহারে

ছিলেন। কিন্তু তিনি ওখানে গেলেন না। এ দিকে আমার অবস্থা শোচনীয়। দুই পা কেটে-ছড়ে একসা। এরপর এই জখম পা এবং কাঁধে ঝোলা নিয়ে আরও চলতে হবে — ভাবতেও ভয় হচ্ছিল। এখান থেকে টশী-লুন-পো পর্যন্ত ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায় কিনা, তার জন্য খোঁজ-খবর করতে লাগলাম। সে জন্য ১১ই জুন থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত শো-কর গ্রামে অপেক্ষা করেও কোনো ব্যবস্থা হলো না। এর মধ্যে একদিন গেলাম এখানকার মঠের অবতারী লামার মন্দির দেখতে। খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি এবং চিত্রপটে মন্দিরটি সাজানো। লামা অবশ্য মন্দিরে ছিলেন না। তবে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাসস্থানটিও দেখলাম! বাড়ির সামনে সফেদার বাগান, টবে রকমারি ফুলের গাছ, সব কিছু মিলিয়ে বৈভবের চিত্র বড় বেশী ছড়ানো। ১৩ই জুন শো-কর বিহারটি দেখতে গেলাম। এটি বেশ বড় গুম্ফা (বিহার)। প্রায় পাঁচশো ভিক্ষু এখানে বাস করে। গুম্ফাটি পাহাড়ের সানুদেশ থেকে একেবারে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মন্দিরের ভেতরটা অসংখ্য প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল। প্রদীপগুলো সবই সোনা বা রূপোর তৈরি। সুমতি-প্রজ্ঞের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এই গুম্ফা বা বিহারের কুশোক খোম্বার (প্রধান পণ্ডিত মহাশয়) সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমে তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধদর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা হলো, পরে তা 'তন্ত্র' ছাড়িয়ে 'বিনয়' পর্যন্ত গড়াল। আমি প্রশ্ন করলাম —বিনয় যেখানে জীবহিংসা, মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদিকে একেবারে বর্জনীয় বলছে, সেখানে তন্ত্র (বজ্রযান) এগুলো ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব —এমন কথা বলছে। দুটো এ রকম পরস্পর-বিরোধী চিন্তা একই ধর্ম বা দর্শনের মধ্যে কি করে এক সঙ্গে চলতে পারে? উত্তরে কুশোক খোম্বা বললেন —এগুলো হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথের বিধান। যেমন ধরুন অসুস্থ রোগীর জন্য চিকিৎসক অনেক রকম খাদ্যাখাদ্য এবং ঔষধের বিধান দেন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে, কিন্তু সুস্থ মানুষের জন্য অত বিধি-নিষেধ থাকে না, তেমনি বিনয় হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু তন্ত্র হচ্ছে সাধনার পথে অগ্রগামীদের জন্য। কুশোক খোম্বার শিক্ষা-দীক্ষা লাসার শ্রেষ্ঠ বিহারে। চীন সীমান্ত লাগোয়া খাম প্রদেশে ওঁর জন্ম। মনে পড়ে গেলো এ দেশে আসবার পথে, নেপালের য়ল্মো ভূমিতেও একজন খাম দেশীয় ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কুশোক খোম্বা আমাদের যাত্রার ব্যাপারে অসুবিধার কথা শুনে, লাসা যাত্রী ব্যবসায়ীকে আমাদের তাঁর সঙ্গে নিতে অনুরোধ করলেন এবং আমাদের নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে গুম্ফায় চলে আসতে বললেন। পরদিন এসে শুনলাম, ব্যবসায়ীরা আমাদের না নিয়েই চলে গেছে। অতঃপর এখান থেকে খচ্চর যোগাড় করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ ব্যাপারেও সফল হলাম না। শেষে সুমতি-প্রজ্ঞ লঙকোরের এক ঢাবাকে (ভিক্ষু) নিখরচায় লাসা তীর্থদর্শনের লোভ দেখিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি করালেন।

১৪ই জুন দুপুরের পর বের হলাম। নদী পার হয়ে আমাদের পথ বাঁ-দিকে নীচে নেমে গিয়েছে। আবার খানিক দূরে বাঁকের মুখে নদীর ডান-দিক ধরে ওপরের দিকে উঠেছে। এই নাতিবৃহৎ উপত্যকায় সামান্য কিছু ছোট ছোট গাছপালা মাত্র রয়েছে। জমিতে জোয়ার এবং গম বোনা হয়েছে। নদী কাছে থাকায় সেচের জলের অভাব নেই। পড়ন্ত বেলাতে আমরা এ-রা গ্রামে পৌছালাম। এই গ্রামের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক দেখলাম সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত। ভদ্রলোকের বাড়ি গ্রাম থেকে একটু দূরে। বাড়ির চারদিকে চারটি বিশালাকৃতি কুকুর বাঁধা। দূর থেকে ডাকাডাকি করতে বাড়ির ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে দরজার সামনের কুকুরটির মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বসে পড়ল। আমরাও ইত্যবসরে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম। জিনিসপত্র রেখে বিশ্রামের উদ্যোগ করছি, এমন সময় সুমতি-প্রজ্ঞের সংগৃহীত সেই ঢাবাটি কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। —আমি মায়ের একমাত্র ছেলে, আমাকে না দেখলে আমার মা মরে যাবে। এই সমস্ত বিরাট বিরাট কুকুর আমায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, তার চেয়ে আমাকে ফিরে যেতে দিন। কান্নাকাটির মধ্যে এগুলোই ছিল তার বক্তব্য। সুমতি-প্রজ্ঞ তাকে ধমকাতে লাগলেন, আমি বোঝাবার চেষ্টা বৃথা দেখে তাকে ফিরে যেতে বললাম।

দিনের আলো শেষ হতে তখনও কিছু বাকী ছিল। লোকটি তার জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় হলো। কিন্তু সে যে এই সুযোগে সুমতি-প্রজ্ঞের সত্তুর থলিটি নিয়ে কেটে পড়েছে তা আমরা কেউ তখনও বুঝতে পারিনি। থলিটাতে সাত সের মতো সত্তু ছিল। গৃহকর্তা আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে চা খাবার সময় ব্যাপারটা ধরা পড়ল। সুমতি-প্রজ্ঞ তো তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধরবার জন্য বের হতে চাইলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম —অনাবশ্যক সময় নষ্ট হবে মাত্র। কারণ লোকটি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বহু দূর চলে গিয়েছে। সুমতি-প্রজ্ঞ বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন - -এর আগে সেই গৃহিণীর দেওয়া সত্তু নিতে দেননি, আজ এ লোকটি সম্বন্ধে আবার ঐ রকম কথাবার্তা বলছেন!

আমি তাঁকে শান্ত করার প্রয়াসে বললাম —সে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক, এখন তাকে ধরতে হলে সেই শো-কর বিহারে ফিরে যেতে হবে। আপনি সেখানে পৌছাতে পৌছাতে রাত্রি হয়ে যাবে। আমাদের কথাবার্তা শুনে গৃহস্বামী পাঁচ ছ'সের সত্তু ভর্তি একটি থলি আমাদের সামনে রেখে দিলেন। আমি বললাম —নিন, যা গিয়েছিল, তাই ফেরৎ পেয়ে গেলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ এ বার একটু শান্ত হলেন। আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি, একজন দর্জী সে বাড়িতে বসে কাপড় সেলাই করছিল। কথাবার্তায় জানতে পারলাম, দর্জীটির বাড়ি সেই গ্রামেই, যে গ্রামের মোড়লকে আমাদের ঘোড়া ঠিক করে দেবার জন্য শো-কর বিহারের কুশোক খোম্বা একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন। এ দিকে

আমাদের আশ্রয়দাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম, এ গ্রামে না পাওয়া যাবে মাল বইবার লোক, না পাওয়া যাবে ঘোড়া। অতএব রাত্রিতেই দর্জীটির সঙ্গে তাদের গ্রামে যাওয়া স্থির করলাম। সবে সন্ধ্যা হয়েছে, এমন সময় আমরা এ গ্রাম ছেড়ে বের হলাম। দর্জীটি আমার জিনিসপত্র নিজেই আগ্রহ সহকারে তুলে নিল। রাত্রির প্রথম প্রহরে গন্তব্য স্থানে পৌছালাম। দর্জীটি আমাদের সেই মোড়লের বাড়িতে নিয়ে গেলো। মোড়লকে কুশোক খোম্বার চিঠি দিলাম, চিঠি পরে মোড়ল মশাই বললেন, ঘোড়ার ব্যবস্থা তো এখন করতে পারব না, তবে কাল আপনাদের সঙ্গে লোক দিয়ে লো-লো গ্রামে পাঠিয়ে দেবো, সেখানে ঘোড়া পেয়ে যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে মোড়ল-প্রেরিত লোকের মাথায় জিনিসপত্র তুলে দিয়ে বের হলাম, সকাল আটটার মধ্যেই লো-লো পৌছে গেলাম, বিশ-পঁচিশ ঘর লোক অধ্যুষিত ছোট একটি গ্রাম। কাঠের অভাবে বাড়িগুলো ছোট ছোট করে তৈরি। আমাদের সঙ্গী লোকটি ঐ রকম একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মালিককে মোড়লের অনুরোধ জানাল। বাড়ির মালিক আমাদের ঘোড়া সম্বন্ধে আশার বাণী শোনাল। বলল, এখান থেকে লর্সে-জোঙ পর্যন্ত আঠার টংকা ভাড়া লাগবে। যদিও এখানকার হিসেব অনুযায়ী ভাড়া কিঞ্চিৎ বেশীই চেয়েছিল কিন্তু আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। লোকটি আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করে, জঙ্গলে পশুপালকদের কাছে গেলো ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে। বেলা তিনটে নাগাদ ফিরে এসে জানাল, লর্সেতে অত্যধিক গরম, তাই ঘোড়া অতদুর যাবে না, ওরা আমাদের চাসা-লা পর্যন্ত, অর্থাৎ একদিনের পথ পার করে দিয়ে ফিরে আসবে। প্রথমে ভাড়া এক কথায় রাজী হয়েছিলাম, কিন্তু এখন অন্য রকম কথাবার্তায় ঘোড়া নিতে রাজি হলাম না। লোকটি আগে সৈন্য বাহিনীতে ছিল, তিব্বতে ছোট ভাইরা আলাদা বিয়ে করে না, বড় ভাইয়ের স্ত্রীর ওপর সব ভাইয়ের স্বামীত্বর অধিকার বর্তায়। কিন্তু আমাদের এই লোকটি সেই প্রথা ভেঙে আলাদা বিয়ে করার জন্য, পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখানে ও ছোট একটা ঘর বানিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। সকাল থেকে ওর দৌড়-ঝাঁপের জন্য ওকে কিছু পয়সা দিলাম, ও খুশী হয়ে গেলো। এমন সময় খবর পেলাম শো-কর জোঙ থেকে লর্সে-জোঙ যাচ্ছে এমন একটি যাত্রীদল কয়েকটি গাধা নিয়ে এখানে এসে পড়েছে। স্থমতি-প্রজ্ঞকে পাঠালাম ওখানে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখবার জন্য। উনি পাঁচ টংকায় আমাদের মালপত্র লর্সে-জোঙ পর্যন্ত যাবার ভাড়া ঠিক করলেন। ওরা সওয়ারীর জন্যও একটা বড়োসড়ো গাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মালপত্র না থাকলে খালি-হাতে হাঁটতে আমার কোনো অসুবিধাই নেই। সেই রাত্রিতেই মালপত্র নিয়ে ওদের ডেরাতে গিয়ে উঠলাম।

গর্দভ-বাহিনীর সঙ্গে

১৬ই জুন রাত থাকতে থাকতেই আমাদের গর্দভ-বাহিনী রওনা দিলো। গাধার পিঠে লাসার জন্য নেপাল থেকে চাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে চাল ব্যবসায়ীদের দু'জন লোক দুটো বড় সাইজের তলোয়ার কোমরে ঝুলিয়ে দলের সঙ্গে যাচ্ছিল। রাস্তাটা একটু চড়াই গোছের। বেলা দশটার সময় এক জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য থামা হলো। গাধাগুলোকেও ভারমুক্ত করে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিলো। রাস্তার এদিক-ওদিক থেকে চমরীর ঘুঁটে যোগাড় করে, রান্নার জন্য আগুন জ্বালা হলো। আমাদের চারদিকে বরফ-পড়া জমি, তাতে শত শত ইঁদুরের গর্ত। আমাদের সামনেই ইঁদুরগুলো এক গর্ত থেকে আর এক গর্তে ছুটোছুটি করছিল। আকৃতিতে ইঁদুরগুলো আমাদের দেশের মেঠো ইঁদুরেরই মতো, তবে এদের লেজ নেই এবং গায়ের চামড়া খুব মোলায়েম। আমাদের চা, জল-খাবার খাওয়া সারা হলো। গাধাগুলোকেও ভেজা মটর চট্‌কে খাওয়ানো হলো এবং তারপর আবার যাত্রা শুরু হলো। আমার এখন খালি হাত, সে জন্য পনের ষোল হাজার ফুট উচ্চতাতেও হাঁটতে কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। নদীর ওপারে যাবার জন্য আমাদের অনেকটা বেশী হেঁটে একটা লা (গিরি-সঙ্কট বা ঘাট) পার হতে হলো। কারণ নদীর ধার দিয়ে এখানে কোনো রাস্তাই নেই। লা পার হয়ে স্বভাবতই কিছুটা উৎরাই। এখানে চতুর্দিকে চমরীর পাল চরে বেড়াচ্ছে। এ বার অনেকটা হাঁটার পর নদীর তীর ঘেঁসে একটি রাস্তা পাওয়া গেলো। দেখলাম, অপর পারে একদল হরিণ তৃষ্ণা নিবারণে ব্যস্ত, কিন্তু যেই মাত্র আমাদের দলটির অস্তিত্ব টের পেলো অমনি দ্রুত পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিছু দূর গিয়ে একটা শ্লেট পাথরের পাহাড় দেখতে পেলাম। এ রকম ধরনের পাহাড়ের নীচে পেট্রোলিয়াম পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলেই আমার অনুমান। বেলা শেষ হবার মুখে আমরা বক্‌চা নামে একটা গ্রামে পৌছালাম। গ্রামটি খুবই ছোট। পাথরের তৈরি অল্প কয়েকটি বাড়ি। ছাগল, ভেড়া এবং চমরী পালনই এই গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা। সুমতি-প্রজ্ঞের কাছে সামান্য চা ছিল। গ্রামের একটি বাড়িতে গিয়ে তাই দিয়ে চা বানানো হলো এবং সেই স্বল্প পরিমাণ চা আমরা সকলেই ভাগ করে খেলাম। ইতিমধ্যে গাধাগুলোও পৌছে গেলো।

১৭ই জুন শেষ রাত্রিতেই বক্‌চা গ্রামে ছেড়ে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের দলটির যে প্রধান, সে একটা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলছিল, আর আমরা সকলেই তাকে অনুসরণ করে চলছিলাম। এ বার যতই চলছি ততই পাহাড় গুলো ছোট এবং উপত্যকা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। জায়গায় জায়গায় তুষারপাতের চিহ্ন। উপত্যকার কোথাও পশুপালকদের অস্থায়ী তাঁবু তার ভেতর থেকে ধোঁয়া

বের হচ্ছিল। এরপর কিছু দূরে একটা ছোট লালপাথর বা লোহাপাথরের পাহাড় পড়ল, আমরা সেখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম, ব্যাপারীরা যে সমস্ত চালের বস্তা ফেটে গিয়েছে, সেগুলোতে ভিজে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে নিল। আমরাও ইত্যবসরে চা-সত্তু খাওয়া সেরে নিলাম, প্রান্তর শেষ হতেই আবার চড়াই। সুমতি-প্রজ্ঞ খানিকটা পিছিয়ে পড়লেন, কিন্তু আমি বেশ স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটছিলাম, যদিও সামনের চাসা-লা-এর উচ্চতা আঠার হাজার ফুট, তবুও খালি-হাত থাকায় জন্য অত উঁচুতে হেঁটে উঠতেও কোনো কষ্ট অনুভব করিনি। লা পার করে অল্পক্ষণ মাটিতে গড়িয়ে নিলাম, সুমতি-প্রজ্ঞ এলেন খানিক পরে, গর্দভ-বাহিনী এবং ব্যাপারীরা এখনও পিছনে রয়েছে। আমরা দু'জনে এ বার নামতে শুরু করলাম। চাসা-লা-র উৎরাইটি বেশ বড় এবং কয়েক মাইল জুড়ে এর ব্যাপ্তি। এখানেও সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তরে চমরীর পাল চরছে, বেলা দুটোর সময় আমরা একটা গ্রাম পেলাম, নাম জিগ-চেব, আমরা পৌঁছাবার আড়াই ঘণ্টা পর বাকী সওয়ার বাহিনীও চলে এল। যাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে কিছু উপার্জন করাই এই গ্রামের প্রধান জীবিকা, এ ছাড়া সামান্য কিছু পশু পালনও আছে। সে রাত্রিটা ওই জিগ-চেব গ্রামেই কাটিয়ে, পরদিন ১৮ই জুন আবার ভোরে উঠে যাত্রা শুরু হলো। কঠিন উৎরাইয়ের পথ। যত নীচে নামছি গরমও যেন তত বাড়ছে, মাঝখানে একবার শুধু চায়ের জন্য অল্প কিছুক্ষণ থামলাম, প্রায় চার ঘণ্টা চলার পর ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার দেখা মিলল। আশপাশে বনস্পতির মেলা দেখা যেতে লাগল। বেলা দশটা নাগাদ আমরা ব্রহ্মপুত্রের কাছে এসে পড়লাম, ব্রহ্মপুত্র এখানে বেশ প্রশস্ত। দু'পাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চাষ-আবাদ ছাড়াও স্থানে স্থানে বৃক্ষপূর্ণ বাগানও রয়েছে, তথাপি বিস্তর পতিত জমি রয়ে গেছে। বেল একটার সময় আমরা খচোং গ্রামে উপস্থিত হলাম, এই গ্রামটা আমাদের সওয়ার বাহিনীর মালিকদের গ্রাম। সে জন্য ওরা এই গ্রামেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

সুমতি-প্রজ্ঞ এবং আমি আশ্রয় নিলাম, এক বৃদ্ধার বাড়িতে। চা খেয়ে সুমতি-প্রজ্ঞ একটু গ্রামটা ঘুরে-ফিরে দেখবার জন্য যেই বাড়ির বাইরে পা দিয়েছেন, অমনি কোথা থেকে চারটে ভীমকায় কুকুর ছুটে এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস সুমতি-প্রজ্ঞের হাতে একটা ছাতা ছিল, তাই দিয়ে উনি আক্রমণের প্রথম চোটটা সামলাতে পারলেন। আওয়াজ শুনে আমি বাইরে এসে ওই অবস্থা দেখে পাথর ছুঁড়ে কুকুরগুলোকে মারতে শুরু করলাম। কুকুরগুলো তখন সুমতি-প্রজ্ঞকে ছেড়ে, আমার ছোঁড়া পাথরগুলোর পেছনে ছুটে সেগুলোকে কামড়াতে লাগল। সুমতি-প্রজ্ঞও চট করে ঘরের ভেতরে চলে এলেন। এরপর যতক্ষণ ওই গ্রামে ছিলাম, উনি আর বাইরে বের হবার নামও করেননি।

১৯শে জুন, আমাদের জিনিসপত্র বাধা-ছাঁদা করে গাধাওয়ালাদের জিম্মা করে দিয়ে, আমরা লর্সে-জোঙ-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ব্রহ্মপুত্রের এই

অববাহিকায় অনেক ছোট বড় গ্রাম আছে। দু'পাশে চাষের জমিতে জলসেচের জন্য নদী থেকে অনেক খাল কেটে আনা হয়েছে। এ রকম একটি খাল আমরা পার হলাম। এরপর একটা ছোট নদী আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল। সুমতি-প্রজ্ঞ বললেন—এই নদীর সৃষ্টি হয়েছে স-ক্যা গুম্ফাতে। বেলা ন'টা-দশটার মধ্যে লর্সে পৌঁছে গেলাম। প্রথমেই গেলাম স্থানীয় বিহারে। এখানে পথে-ঘাটে লোকে আমাকে প্রায়শঃই লাদাখী বলে উল্লেখ করে দেখে এখন আমিও নিজেকে লাদাখী বলেই চালাই। বিহারে চা খাওয়ার পর, আমি সুমতি-প্রজ্ঞকে বললাম— চলুন আমরা নদীর ধার ঘেঁসে চলতে থাকি কারণ আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে গাধাগুলো এবং তাদের সওয়াররা তো ঐ পথেই আসবে। সুমতি-প্রজ্ঞ আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না। বললেন—বরং এখানেই অপেক্ষা করি। সওয়ারীরা এলে জিনিসপত্তর নেওয়া যাবে। আসলে ওঁর ইচ্ছে—এখানে কিছুদিন থেকে, ভূত-প্রেত তাড়িয়ে কিছু আয় করা। কিন্তু আমার রয়েছে তাড়া। এখানে, ব্রহ্মপুত্রে নৌকা চলে। কাঠের ফ্রেমে চামড়া সেঁটে বানানো নৌকা। নাম 'কা'। খবর পেলাম বর্তমানে এখানে কোনো কা নেই। শীগগী চলে গেছে। ফিরতে দু'চার দিন লাগবে। অনেক অনুরোধে সুমতি-প্রজ্ঞ নদীর ঘাটে গেলেন। সেখানে তিন জন সওদাগর মালপত্তর নিয়ে কা-র প্রতীক্ষা করছে। তারা জানাল দু'দিনের আগে কা পাওয়া যাবে না। দুটো দিন অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই। থাকবার বিহারটি মনের মতো নয়। কুকুরের উৎপাত খুবই, এ দিকে সুমতি-প্রজ্ঞের বিহারে থাকারই ইচ্ছা। আমি রয়ে গেলাম নদীর ধারে, সওদাগরদের সঙ্গে। সুমতি-প্রজ্ঞ ফিরে গেলেন বিহারে।

চতুর্থ পর্ব

ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে

নৌকার প্রতীক্ষায়

লসে-জোঙ থেকে শীগচী পর্যন্ত ইয়াকের চামড়ায় তৈরী ক্বা নামক দেশী নৌকা চলে। একটা ক্বা-তে তিরিশ চল্লিশ মণ ধান আঁটে। প্রতীক্ষারত সওদাগরদের একজন টশী-লুন-পো-র ঢাবা অর্থাৎ ভিক্ষু, দ্বিতীয় জন লাসার সে-রা মঠের ভিক্ষু, তৃতীয় জন গৃহস্থ। তিব্বতে ভিক্ষুদের জীবন দুই ধারায় চলে। একদল বিহারে বিদ্যাচর্চা, পূজার্চনায় রত থাকে, আরেকদল ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে মেতে থাকে। তবে এমন ভাগ সর্বত্রই দৃঢ়ভাবে মানা হয় বলা যায় না। সওদাগর ভিক্ষুদের পোশাক-পরিচ্ছদ গৃহস্থ-সওদাগরদের মতোই। গৃহীর মাথায় চুল আছে, ভিক্ষুদের নেই। ভিক্ষু কিম্বা গৃহস্থ উভয়েই ইচ্ছেমতো, যতদিন খুশী গৃহী কিংবা ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে পারে। সওদাগর ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখলাম। জীবহত্যাতেও তাদের অ-রুচি দেখিনি। অনেকেরই রক্ষিতা আছে। স্থায়ী অথবা অস্থায়ী রক্ষিতা। আমার সঙ্গী ভিক্ষু-সওদাগরেরা ছিলেন খাম-পা (খাম অঞ্চলের অধিবাসী) এবং গৃহী ছিলেন লাসা-পা (লাসার অধিবাসী)। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন টশী-লুন-পো-র ভিক্ষু এবং সে কারণে তিনি ছিলেন দলনেতা। দলটির কাছে যে পরিমাণ মালপত্তর ছিল তাতে ১৮/২০ টা ক্বা লাগার কথা। মাল ছিল প্রধানত চাল, লোহা-পেতলের বাসনপত্র আর পেয়ালা তৈরির কাঠ। গাদা করে রাখা মালে চারপাশে খাড়া দেওয়াল হয়েছিল। মাঝখানে জলছিল আগুন। আগুন ঘিরে শোবার জায়গা। মাথার ওপর ছাউনি হলো চমরীর ছোলদারী। গ্রামের বাইরে, নদীর ধারে বিপুল পরিমাণ মালপত্তর নিয়ে রাত্রিবাস বিপজ্জনক। তবে শোনা গেলো —চোর-ডাকাতও ভিক্ষু-সওদাগরদের ভয় করে। তাদের সঙ্গে ছিল দীর্ঘ এ দেশী কৃপাণ। দিনের বেলা ওরা সকলেই টুকটাক মেরামতি করত নয় তো এখানে-ওখানে যেত নৌকার তলায় পাতবার তক্তা সংগ্রহ করতে। নদীর ধারে আমাদের আস্তানার কাছাকাছি গুল্ম-জাতীয় গাছপালার ঝোপঝাড় ছিল। দলনেতা রাত্রিতে শয়নের জন্য গ্রামের মধ্যে যেতেন। কখনও কখনও আর একজনকে নিয়ে যেতেন। আমি একজন সঙ্গীসহ মালপত্তর পাহারায় থাকতাম। এখানকার লোকজনের লজ্জা-সরমের বালাই নেই বলা যায়। প্রকাশ্যে নারী-পুরুষ দৈহিক

সংসর্গে লিপ্ত হয় দ্বিধাহীনভাবে। যাত্রাপথে কিম্বা কোনো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে চাইলেই নারী সহজলভ্যা। এমনিতে কুমারী মেয়ে আর চুল কেটে ঘরে বসে থাকা অনীর মধ্যে ফারাক অনেক। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, এ দেশে ব্যভিচার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। বরং আমার ধারণা যদি সব দেশের গুপ্ত ব্যভিচারের ও প্রকাশ্য ব্যভিচারের হিসেব নেওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে ফারাক যৎকিঞ্চিৎ। যে সব ব্যবসায়ী একই পথে বার বার যাতায়াত করে তাদের প্রায় সকলেরই একাধিক গ্রামে রক্ষিতা আছে। আমাদের দলনেতা হামেশাই এ পথে যাতায়াত করেন; সে জন্য এই গ্রামেও তার একটি অবৈধ সংসর্গের জায়গা ছিল। দিনের বেলা সেই মহিলাকে দেখতাম হাঁড়ি ভর্তি করে ছঙ (কাঁচা মদ) নিয়ে এখানে আসতে। আমার সঙ্গীরা তখন জলের বদলে ছঙ পান করত। মাঝে মাঝে তারা নদীতে মাছ ধরতে বসতো। কিন্তু মাছেদের সৌভাগ্য, আমি যতদিন ছিলাম, তাদের একটিকেও ধরা পড়তে দেখিনি।

১৯শে থেকে ২৪শে জুন পর্যন্ত নদীর তীরে কাটল। কথা ছিল, দু'তিন দিনের মধ্যেই নৌকা ফিরে আসবে। এল না। নৌকা দু'তিন দিনেই শীগচী পৌঁছে যায়। কারণ নদীর স্রোত প্রবল। অনুকূল স্রোতে নৌকা তীর ঘেঁসে চলে। ফেরার পথে প্রতিকূল স্রোত। তখন নৌকার চামড়া এবং কাঠের কাঠামো আলাদা করে গাধার পিঠে চাপিয়ে স্থলপথে ফেরৎ আনা হয়। এতে চার-পাঁচ দিন লেগে যায়। দিনগুলো ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসে সঙ্গীদের মুখ থেকে তিব্বত, খাম, অম-ধু (মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে, চীনের প্রান্তসীমার একটি প্রদেশ) প্রভৃতির নানা জায়গার গল্প শুনতাম। কখনও কখনও বিভিন্ন লামাদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ শুনতাম। তবু আমার সময় যেন কাটিতে চাইত না। অবশেষে সময় কাটানোর এ দেশীয় পদ্ধতির স্মরণ নিলাম। তিব্বতে নারী-পুরুষ সকলেরই হাতে মালা দেখা যায়। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, সেই মালা ঘুরিয়ে জপ করে। যারা আরও ধর্মভীরু তারা এক হাতে মালা, অন্য হাতে ছোট মাণী ঘুরিয়ে চলে। তামা বা পেতলের চোঙার মতো একটা জিনিস মাণী, যার ভেতরে থাকে লাটাইয়ের মতো একটা ব্যবস্থা। এর মধ্যে মন্ত্র (লক্ষাধিক) ছাপা একখানা কাগজ ভরা থাকে। মাণীর ভেতরের কাগজখানা ঘোরালেই লক্ষ মন্ত্র জপের সমান পুণ্য অর্জিত হয়। এই হলো হাতে চালানো মাণী। এই জিনিস অনেক বড় আকৃতিরও হয়। সেগুলো একজন মানুষ ঘোরাতে পারে না। জনাকয়েক লোক দরকার হয়। কোথাও কোথাও বৃহদাকারের মাণীগুলোকে মানুষের পেশীর শক্তিতে না ঘুরিয়ে জল-প্রবাহের শক্তিতে ঘোরানো হয়। সেই সমস্ত মাণীর ভেতরে কাগজে মন্ত্রের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে কোটিও ছাড়িয়ে যায়। ফানুস-ওড়ানোর পদ্ধতিতেও এক রকম মাণী ঘোরানো হয়। একটা ঘেরাটোপের মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে ওপরে মন্ত্রলেখা কাগজ বা কাপড় ছাতার মতো করে টাঙানো হয়। প্রদীপের

আলোতে বাতাস গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে, সেই বাতাসের প্রভাবে ছাতাটি ঘুরতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রলেখা কাগজ বা কাপড়টিও ঘুরতে থাকে এবং সেইসঙ্গে যে বা যারা এটি তৈরি করেছে তারা পুণ্য সঞ্চয় করতে থাকে। আগামী দিনে এ দেশে যখন বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার শুরু হবে, তখন বৈদ্যুতিক মাণীর প্রচলনও যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার কাছে কোনো মাণী ছিল না, তবে নেপালে থাকার সময় একটা মালা কিনেছিলাম। পথে কখনও কখনও একটু-আধটু জপ করতাম, কিন্তু এতদিনে আসল সুযোগ এল। তিব্বতীরা সাধারণত অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ) অথবা বজ্রসত্ত্বের মন্ত্র (ওঁ বজ্রসত্ত্ব হুঁ, ওঁ বজ্রগুরু পদ্মসিদ্ধি হুঁ, ওঁ আ হুঁ) জপ করে থাকে। আমি সেই মন্ত্রের পরিবর্তে 'নমো বুদ্ধায়' মন্ত্রটি জপ করা ঠিক করলাম এবং এ দেশীয় পদ্ধতিতে জপ করে ফাঁকতালে বেশ কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নিলাম।

আগেই বলেছি ব্রহ্মপুত্র এখানে বেশ প্রশস্ত। নদীর ওপারে লোক পারাপারের জন্য ঝুলানো একটা সেতু আছে। গৃহপালিত পশু বা মালপত্রর পারাপারের জন্য কিছু দূরে ঘাট আছে। ঘাট থেকে অনতিদূরে গ্রামের প্রান্তসীমায় একটা ছোট টিলার উপর এখানকার জোঙ বা কালেক্টরী অফিস। জোঙ-এর কাছাকাছি আরও কয়েকটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। তিব্বতে সরকারী কাজে যে সমস্ত বাড়িঘর লাগে, সেগুলো বেগার শ্রমের সাহায্যে তৈরি করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে বেগার খাটার জন্য দিতে হয়। যাদের অর্থ আছে তারা নিজের বা নিজের পরিবারের সদস্যের বদলে মূল্য দিয়ে অন্য লোক ভাড়া করতে পারে। বহু সংখ্যক লোক বাড়ি তৈরির কাজে লেগেছে দেখলাম। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। তারা চমরীর লোম দিয়ে তৈরি থলিতে, নদীর ধার থেকে বেছে বেছে পাথর আনছিল। কাজ করতে করতে গান গাইবার অভ্যাস তাদের আছে। তা'ছাড়া কাজের ফাঁকে ফাঁকে হুড়োহুড়ি, হাসাহাসি লেগেই ছিল। আর উলঙ্গ হয়ে নদীতে নেমে স্নান করা, কাদা ছোঁড়া এমন কি ঐ অবস্থাতেই পাড়ে ছুটোছুটি দিব্যি চলছিল। তবে চরম কৌতুক ছিল সকলের সামনে মেয়েদের উলঙ্গ করে দেওয়া। এ সমস্ত কিছুই যেন ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। সময় গ্রীষ্মকাল হলেও নদীর জল ছিল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। আমি মিনিট খানেকের বেশী জলে থাকতে পারিনি। ওরা কেউ কেউ ঘণ্টাখানেকের বেশী জলে গা ডুবিয়ে ছিল।

লর্সে গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান বাস করে। এখানে প্রথম দিন আজান শুনতে পেয়েছিলাম। তখন অন্য কিছু ভেবেছিলাম। পরে জানলাম মুসলিম অধিবাসীদের কথা। লর্সে লাসা থেকে লাদাখে যাবার পথে অবস্থিত। এরা লাদাখী মুসলমানদের তিব্বতী স্ত্রীদের গর্ভজাত সন্তান। স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রে এরা তিব্বতীদের তুলনায় অনেক বেশী নিষ্ঠাবান।

২২শে জুন কয়েকটি ক্বা ফিরে এলো। একটায় যেতে পারতাম কিন্তু সওদাগর সঙ্গীরা বলল —আমাদের সঙ্গেই চলুন। পরদিন আমাদের ক্বা এল। দু'দিন নৌকাতেই থাকতে হবে। সে জন্য পাথেয় সংগ্রহ প্রয়োজন ছিল। কিছু শুকনো ভেড়ার মাংস জোটালাম। তিব্বতীরা শুকনো মাংসকে স্বয়ংপক্ক মনে করে। অতদূর মনে করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই মাংসগুলো জলে সেদ্ধ করে নিলাম। সঙ্গীরা বলেছিল —এভাবে মাংসের সার পদার্থ বেরিয়ে যায়। যাই হোক সেদ্ধ করা মাংসের টুক্‌রোগুলো একটা কাপড়ে বেঁধে নিলাম। আর সুরুয়াটুকু খাবার জন্যে ঢাবাকে দিতে গেলাম। সে রাজি হলো না। তার রাজি না হবার পেছনে কারণ থাকতে পারে অনুমান করতে পারিনি। পরে অন্য একজনের কাছ থেকে • শুনলাম যে, সে মাংস না দিয়ে শুধুমাত্র সুরুয়া দেওয়াতে বিলক্ষণ চটেছে। আমি নিজেও মাংস খাইনি। পথে সকলে মিলেজুলে সদ্ব্যবহার করা যাবে ভেবে বেঁধে নিয়েছিলাম। এ কথা যে জানিয়ে রাখা দরকার ভাবিনি। যাক যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন আর শোধরাবার উপায় নেই।

এ দিকে পথে আসতে আনতেই নৌকার চামড়া শুকিয়ে গিয়েছে। মাঝিরা পাথর চাপা দিয়ে নদী গর্ভে সেগুলো ডুবিয়ে রাখল। এরপর কাঠের কাঠামোয় সেগুলো আটকে নৌকা জলে ভাসানো হলো। তারপর সওদাগরদের সংগৃহীত তক্তাগুলো খোলের নীচে বিছানো হলো। সকালবেলা সওদাগর দলনেতা আমাকে ডেকে বলল —নৌকায় ঠাঁই নেই। অতএব আপনাকে সঙ্গে নিতে পারছি না। প্রথমে কথাটা ঠাট্টা ভেবে গুরুত্ব দিলাম না। দুপুরবেলা যখন নৌকায় মালপত্তর রাখতে এলাম তখনও একই কথা শুনলাম। এ বারও ব্যাপারটাকে কৌতুক ভেবে ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল, হলুদ, সবুজ কাপড়ের ছোট ছোট পতাকা নৌকায় টাঙানো শেষ হলো। দুটো নৌকাকে জুড়ে প্রথমটায় নিশান ওড়ানোও হলো। এমন সময় শীগর্চী-গামী কিছু যাত্রী এসে পড়ল। নৌকায় তাদেরও ঠাঁই হলো। এমন সময় সুমতি-প্রজ্ঞ এসে হাজির। কিন্তু, একজন সওদাগর বলল —সর্দার আপনাদের নিতে অ-রাজি। কি করি বলুন? নৌকার মাঝিরা তখন ছং সহযোগে পান ভোজনে ব্যস্ত। একটি কথাও না বলে মালপত্তর নৌকা থেকে নামিয়ে নিলাম। তাপর সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে সেই মালপত্তর ধরাধরি করে চলে গেলাম সোজা বিহারে।

শীগর্চী যাত্রা

গুম্ফায় ফিরে চা পানান্তে সুমতি-প্রজ্ঞ খচ্চর যোগাড়ের জন্য বের হলেন। তার কিছুক্ষণ পর সেই সওদাগরদের দু'জন বিহারে এল। তারা জানাল সর্দারকে রাজি করিয়েছে আমাকে নেবার জন্য। অবশ্য একা আমাকেই নেবে, সুমতি-প্রজ্ঞকে

নেবে না। আমি এ প্রস্তাবে রাজি হলাম না। সুমতি-প্রজ্ঞ চার সাং (প্রায় তিন টাকা) ভাড়ায় দুটো খচ্চর ঠিক করে এসেছেন। আগামী কাল রওনা হতে হবে।

২৬শে জুন ভোর। চা-এর পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খচ্চরওয়ালাদের ডেরায় পৌঁছে আর এক বিপত্তি। স্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মাল যাবে। এখনও সে মালপত্তর গোছানো হয়নি। অতএব যাত্রা শুরু হবে আগামী কাল। আমারা পড়লাম মহাবিপদে। বিহার ছেড়ে এসেছি, সঙ্গে মালপত্তরও কম নয়। এ দিকে খচ্চরওয়ালাদের ডেরায় স্থানাভাব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মালপত্তর খচ্চরওয়ালাদের জিম্মায় রেখে নিজেরা গেলাম দেড় মাইল দূরে সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক গৃহস্থের বাড়িতে। আর এক দফা চা খাওয়ার পর সুমতি-প্রজ্ঞ চাঙবোমা বিহারে পরিচিত একজনের কাছে গেলেন। বিহারের মহাস্তূপ দেখা যাচ্ছিল। সময় কাটাবার জন্য বাড়ির মেয়েদের পশম বোনা দেখলাম খানিকসময়। এখানে ঘরে ঘরে পশম বোনা হয়। যেগুলো বোনে সেগুলো লম্বায় যতোটাই হোক না কেন চওড়ায় এক বিঘৎ-এর বেশী হয় না। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তবে বোনা মজবুত হয়, দেখতে সুন্দর হয়। বাড়িতে পানীয় জলের জন্য কুয়ো আছে। কুয়োর অনেক তলায় জল। চামড়ার মশকে জল তোলা হয়। কিছুক্ষণ পরে ছাদে বেড়াতে গেলাম। বাড়ির বৃদ্ধা গৃহিণী ছাদ থেকে নামতে বললেন। পরে জানলাম এ তল্লাটে ছাদে ওঠা খারাপ নজরে দেখা হয়। নিছক সংস্কার বলা যায়। রাতে গৃহিণীর রান্না করা থুক্‌পা খেলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ পথে কেনা কাপড়ের টুকরো বুদ্ধগয়ার প্রসাদ বলে সকলকে বিতরণ করলেন। জানি কাপড়ের টুকরোগুলো এ দেশে সংগ্রহ করা। তবে মুখ খুললাম না।

পরদিন সকালবেলা চা খাওয়া শেষ করে দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু খচ্চরওয়ালারা বেপাত্তা। শঙ্কিত হয়ে ওদের আড্ডার দিকে গেলাম। মাঝপথে তাদের সঙ্গে দেখা হলো। একটা খচ্চরের পিঠে আমি, আর একটায় সুমতি-প্রজ্ঞ উঠলেন। খচ্চরগুলো লাগাম ছাড়া থাকায় তাদের আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। ওরাই খুশী মতোন আমাদের নিয়ে চলল। ব্রহ্মপুত্রের কিনারা থেকে দূরে ডান-দিকে পথ। পথ বালিময়। কোথাও কোথাও কুশজাতীয় ঘাস। অল্প চড়াইয়ের পর এক সময় একটা লা অর্থাৎ ঘাটের সামনে এলাম। তারপর এল উৎরাই। ছোট লাঠি নিয়ে উৎরাই পার হলাম। দেখতে পেলাম ডাইনে-বাঁয়ে দুটো বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বাঁয়ে পুরানো বিহারের ধ্বংসাবশেষের নীচে নতুন বিহার গড়া হয়েছে। পাহাড়টির শীর্ষদেশ বৃক্ষহীন কিন্তু সানুদেশ বড় বড় গাছ-গাছালি ভরা। দূর থেকে মনে হলো আখরোট জাতীয় গাছ।

বেলা দুটোয় একটি গ্রামে বিশ্রামের জন্য থামলাম। আমরা চা খেলাম এবং খচ্চরগুলোকে দানা-ভুষি দেওয়া হলো। গ্রাম ছাড়াতেই চড়াই। পথে একটা ছোট নদীও পার হতে হলো। একটা ঘাট পেরুলাম। পথে দেখলাম এক ধরনের

কালো পাথর, যেগুলোর কাছাকাছি সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উৎরাই শেষে পথ-অবরোধকারী একটা কেল্লার সামনে পৌঁছালাম। কেল্লার দেওয়ালে ঘাটের দিকে মুখ করা একটা কামান বসানো। কেল্লার পাশ কাটিয়ে এলাম ছোট এক গাঁয়ে। নিতান্ত দরিদ্র গ্রামটি। একটি বাড়ি বিত্তবানের। এক বৃদ্ধার কুটিরে আমি আর সুমতি-প্রজ্ঞ আশ্রয় নিলাম। খচ্চরগুলোকে খাদ্য-পানীয় দেওয়া হলো। বৃদ্ধা আমাদের জন্য থুক্‌পা তৈরি করে দিলো এবং শোবার জন্য গদিও পেতে দিলো।

ভোরবেলা বৃদ্ধা মহিলাকে এক টংকা নে-ছঙ (রাত্রিবাসের মূল্য) হিসেবে দিলাম। মূল দলের সঙ্গে মিলে চলা শুরু হলো। এ বারে পথ—বহু দূর বিস্তৃত উৎরাই। স্থানে স্থানে সেই কালো পাথরের স্তূপ। খচ্চরগুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। সেই ঘণ্টার আওয়াজে সারা প্রান্তর মুখরিত করে অতি দ্রুত উৎরাই বেয়ে নেমে এল খচ্চরগুলো। বেলা এগারটা নাগাদ উৎরাইয়ের শেষে পথের ডাইনে লাল রঙের একটা গুম্ফা দেখলাম এবং সামনে একটি নদী পড়ল। নদী পেরিয়ে একটি ছোট গাঁয়ে এলাম। সেখানে একদফা চা পান সাঙ্গ করে আবার শুরু হলো চড়াই ভেঙে ওঠা। একটা ছোট গিরি-সঙ্কটের পর যে পথ পেলাম সেখানকার মাটি ঈষৎ হলুদ বর্ণ। তার মাটি অতি মোলায়েম। সেচের বন্দোবস্ত থাকলে এ মাটিতে সোনা ফলানো যায়। খানিক এগিয়ে চাষের জমি নজরে পড়ল। তবে সেগুলো একান্তই বৃষ্টিনির্ভর।

অনেক চড়াই ডিঙিয়ে উৎরাই বেয়ে সাত-চী নদীর ধার ঘেঁসা এক গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামখানিতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর বাড়ি, সফেদা ও অন্যান্য ফলের গাছ-গাছালি, সেচখাল সবই রয়েছে। নদীর ওপর আছে ভারী পাথরের সেতু। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেতুটি। সেতুর ওপর পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। গ্রামের সীমার বাইরে নদী অনেক বেশী চওড়া। নদীর পাড় সর্বত্র সমতল নয়। এ বার যাত্রা, পথের বাঁ-দিক ঘেঁসে। বেলা চারটের সময় নে-চোঙ গ্রামে এসে থামলাম। গ্রামটিতে খচ্চর, গাধা ইত্যাদির পরিচর্যার সুব্যবস্থা আছে। যাত্রীদের চা খাইয়ে, রাত্রিবাসের স্থান দিয়ে এ তল্লাটের লোকজন বেশ দু'পয়সা কামায়। এক বাড়িতে একখানা ঘর পাওয়া গেলো। দীর্ঘ পথ খচ্চরের পিঠে চেপে চলায় গায়ে-গতরে ব্যথার টনটনানি। বিছানা পেতে সটান শুয়ে পড়লাম। সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে চা করতে বসলেন। রাতে থুক্‌পা রান্নার সময়ও ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হলো। তবে আমি বিশেষ আমল দিলাম না।

পরের দিন বেলা ন'টায় নে-চোঙ ছাড়লাম। এ বারে সোজা রাস্তা। দশটার মধ্যে লা পেরিয়ে নামে মাত্র একটা চড়াই ডিঙিয়ে এলাম। এ তল্লাটের পথ দুর্গম নয়। অতএব দস্যু-তস্করের ভয় খুব বেশী। সমতল, উৎরাই, বিশাল উপত্যকা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বেলা বারোটায় পৌঁছালাম নর-থঙ গ্রামে। এখানে কঞ্জুর ও

তঞ্জুর ছাপার বড় ছাপাখানা আছে। সে বিষয়ে বিশদভাবে পরে বলব। চা পানের পর আবার যাত্রা শুরু হলো। বেলা দুটোর পর পর্বতমূলে টশী-লুন-পো-র মঠ আর টশী লামার বিহার দেখতে পেলাম।

শীগর্চী

মঠ দেখা যাচ্ছিল। সবাই খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের সোনালী রঙের চীনা-ধাঁচের ছাদ খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। মঠের সর্বনিম্ন অংশে টশী লামার বাগান। বাগানের চারদিক প্রাচীর-ঘেরা। প্রাচীর ঘেঁসে টশী-লুন-পো-র সদর-দরজার সামনে এলাম। বাগানে সারি সারি মূলো এবং মাটির গামলায় অন্যান্য সব্জী লাগানো দেখতে পেলাম। টশী-লুন-পো থেকে শীগর্চীর বস্তী কয়েকশো গজ মাত্র। এখান থেকে প্রাচীন চীনা দুর্গের ভাঙা দেওয়াল দেখা যায়। দেওয়ালের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্তি আর মন্ত্র উৎকীর্ণ রয়েছে। স্থানীয় লোক এগুলোকে মাণী বলে। মাণী ডাইনে রেখে আমরা শীগর্চীতে প্রবেশ করলাম। খচ্চরওয়ালারা নিজেদের ডেরা খুঁজে নিল। তাদের কাছে মালপত্তর রেখে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুলাম। সুমতি-প্রজ্ঞর পরিচিত গৃহস্থের হদিশ মিলল না। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের যা অবস্থা, যেমন দীন-দশা তাতে ভবঘুরে কিম্বা ভিক্ষুক ভেবেই বোধ হয় কেউ আশ্রয় দিতে রাজি হলো না। অগতির গতি সরাইখানায় এলাম। অনেক অনুনয়, বিনয় এবং এক টংকা দিনপ্রতি ভাড়া কবুল করে বারান্দার একটি কোণে রাত্রিবাসের ঠাঁই মিলল।

রাতে সুমতি-প্রজ্ঞ অশেষ কুটুক্তি করায় ভাবলাম এর সঙ্গে আর চলা যাবে না। এখন থেকে নিজের পথ নিজেই দেখব। সকাল বেলা, নিজের মালপত্তর সরাইখানার বারান্দায় রেখে এক নেপালী ব্যবসায়ীর খোঁজে বেরুলাম। নেপালে আমার একজন শুভার্থী বন্ধু শীগর্চী-বাসী দু'জন ব্যবসায়ী ভাইয়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন। অবশ্য লিখে না নেওয়ায় ঠিকানা বা নাম কিছুই মনে নেই। তবু চেষ্টা শুরু করলাম। কাজ হলো। নেপালে কুড়ি-পঁচিশ জন নেপালী ব্যবসায়ী রয়েছে। তার মধ্যে চার-পাঁচ জন উচুঁদরের ব্যবসায়ী। আমার উদ্দিষ্ট দু'জন তাদের দলভুক্ত। বেলা সাতটায় তাদের ঠিকানায় হাজির হলাম। তখনো শাহুজী (ব্যবসায়ী) বিছানা ছাড়েননি কিন্তু আমার খবর পেয়ে বাইরে এসে কথাবার্তা বললেন। আমি নেপালের বন্ধুটির কথা বললাম, তৎক্ষণাৎ একজন লোককে আমার মালপত্তর আনতে পাঠালেন। সরাইখানায় আমিও এলাম। দু'জনের ভাড়া মেটালাম এবং সুমতি-প্রজ্ঞ উপস্থিত না থাকায় তাঁর উদ্দেশ্যে চিঠিতে ঠিকানা রেখে চলে এলাম শাহুজীর কুটিতে, দীর্ঘদিন পর গরমজল, সাবান সহযোগে হাত-মুখ ধুয়ে চা, মাংস ইত্যাদি সমাবেশে প্রাতরাশ সমাধা করলাম।

প্রাতরাশের পর সিংহলে শ্রীআনন্দ ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি লিখলাম। শাহুজীকে অনুরোধ করলাম —সহজে লাসা যাবার ব্যবস্থা করতে। তিনি আমার কথা কানে না তুলে, অন্তত দশ-বারো দিন তাঁর কাছে কাটিয়ে যাবার অনুরোধ করলেন। আমি যে চোরের মতো লুকিয়ে লাসা যাচ্ছি এবং ধরা পড়লে এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে এ কথা তাঁকে বলায়, তিনি আমাকে খচ্চরওয়ালাদের আড্ডায় নিয়ে গেলেন। সেখানে লাসা যাবে এমন কোনো দল পাওয়া গেলো না। শেষে লর্সের সেই দলের খোঁজে গেলাম, কিন্তু সেখানে তাদের না পেয়ে, আমাদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে এলাম।

শীগর্চী তিব্বতের দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী। রাজধানী লাসার পরই এর স্থান। লোক সংখ্যা দশ হাজারের বেশী। বাড়ি ঘর খুবই সুন্দর। কুড়ি-বাইশ ঘর নেপালী ব্যবসায়ী ছাড়া কিছু সংখ্যক মুসলমান ব্যবসায়ী আছে। দোকানগুলোর মুখ রাস্তার দিকে কিন্তু লুটপাটের ভয়ে জিনিসপত্তর বাইরের দিকে না রেখে, ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা। প্রত্যেক নেপালী ব্যবসায়ীর গদীতে একাধিক পিস্তলজাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেকের ছাদে সারা রাত বড় বড় কুকুর ছাড়া থাকে। রোজ সকাল ন'টা থেকে এগারটা অবধি, বড় মাণার পেছনে হাট বসে। হাটে শাক-সব্জী, মাখন, কাপড়, বাসনপত্র ইত্যাদি গেরস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। কেনা-কাটা সারতে হয় দু'ঘণ্টার মধ্যে। নয় তো আবার পরদিন। হাটের পশ্চিম দিকে একটি জোঙ কেন্দ্র আছে। সেটি লাসার পোতলা প্রসাদের অনুকরণে তৈরি। শীগর্চীতে প্রায় প্রতিটি নারীর মাথায় দেখলাম ধনুকাকৃতি শিরোভূষণ আর দু'পাশ থেকে পরচুলার বেণী ঝুলছে। বেণীগুলি অবস্থানুযায়ী প্রবাল, মুক্তো ইত্যাদি রত্ন-খচিত। তিব্বতে আসার পর এখানেই প্রথম গৃহপালিত পশুর মধ্যে শূয়োরের আধিক্য চোখে পড়ল।

১লা জুলাই, রামপুর-বুশহর (সিমলা-পাহাড়) এলাকার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের একজন যুবক আমার কাছে এল। দেশে আপার প্রাইমারী অবধি পড়াশুনা করায়, ভালো হিন্দী ও উর্দু বলতে পারে। চার-পাঁচ বছর যাবৎ এখানে তিব্বতী ভাষা শিখেছে। কুতী ছাড়াবার পর এই প্রথম হিন্দীতে কথা বলার সুযোগ হলো। তার কাছ থেকে শুনলাম এক লাদাখী তরুণ বাড়িঘর, মুহুরীগিরি ছেড়ে এ দেশে ধর্মশিক্ষা করতে এসেছিল। দু'বছরের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে লাসার এক যুবতী ভিক্ষুণীকে সঙ্গে নিয়ে এই পথেই দিনকয়েক আগে ফিরে গেছে। রঘুবর (বুশহরী সেই যুবক) সিদ্ধপুরুষকে মড়ার খুলিতে কারণবারি পান এবং লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ অনায়াসে বলতে দেখেছে। কথাবার্তার মাঝে খচ্চরওয়ালারা এসে হাজির। শীগর্চী থেকে লাসা আট সাং (পাঁচ টাকার কিছু বেশী) দাবি করল। কথা দিলো গ্যাংচী হয়ে বারো দিনে লাসা পৌঁছে দেবে। সোজা পথে লাসা সাত দিনে পৌঁছানো যায়। কিন্তু ঐ পথটি দুর্গম বলে খচ্চরওয়ালারা গ্যাংচী হয়ে

যাওয়ার ওপরই জোর দিলো। গ্যাংচীতে ইংরেজদের বাণিজ্য-দূতাবাস আছে। সুতরাং ও পথ আমার পক্ষেও উদ্বেগজনক। অবশ্য এতদিনে নিজের ছদ্মবেশের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মে যাওয়ায় ওদের প্রস্তাবে সায় দিলাম।

২রা জুলাই গ্রামের বাইরে, নদীর ধারে নাচ-গানের আয়োজন ছিল। সকল শ্রেণীর লোক খাবার এবং অপরিহার্য ছঙ নিয়ে সেখানে জমা হলো। তিব্বতীরা নাচ-গান খুব ভালোবাসে। নাচ হলে এরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। মেয়েরা নাচে। আর পুরুষরা বাজনা বাজায়। এখানে প্রায় প্রত্যেক নেপালীর ভোটীয় (তিব্বতী) স্ত্রী আছে। তারাও এল দল বেঁধে। সন্ধ্যার পর জলসা ভাঙলে যে যার ঘরে ফিরল। এ দেশে চালের উৎপাদন প্রায় হয় না। কিন্তু নেপালী সওদাগরেরা দিনে একবার ভাত খাবেই। মাংস চাই তাদের তিনবেলা। রাতে মদ্যপান প্রতিদিনের ব্যাপার।

৩রা জুলাই ভোরে রওনা হব স্থির হলো। তার আগে শাহু-র সঙ্গে গেলাম টশী-লুন-পো-র বিহার দেখতে। এখানে অনেকগুলো দেবালয় আছে। তার মধ্যে পাচটি প্রধান এবং সেগুলির ছাদ স্বর্ণ-খচিত। প্রথমে গেলাম মৈত্রেয়-মন্দির দেখতে। আগামী যুগে বুদ্ধ যে রূপে বা নামে আবির্ভূত হবেন, তারই নাম মৈত্রেয়। মৈত্রেয়-মূর্তি আকারে বিশাল, মেঝেতে দাঁড়িয়ে মুখ-চোখ দেখতে হলে দোতলায় উঠতে হয়। মাটির মূর্তি কিন্তু সোনার পাতে আচ্ছাদিত। শান্ত-সৌম্য মূর্তি। নানা রঙের পতাকা উড়ছে। মূর্তির সামনে বিরাট সোনা-রূপার কাজ করা ঘিয়ের প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলছে। মন্দিরের অপর এক কক্ষে কয়েকশো ছোট ছোট পেতলের মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক পণ্ডিত, বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিদ, সিদ্ধপুরুষ স্থান পেয়েছেন। বৌদ্ধ-অনুশাসন অনুযায়ী কোনো প্রতিবন্ধী ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হতে পারে না। এখানে জনৈক শ্রমণকে দেখলাম যার একটি চোখ নেই। এক জায়গায় তিব্বতী ভাষায় স্তোত্র পাঠ চলছিল। সুরে নেপালী স্তব-গীতের আভাস মেলে। অন্যান্য মন্দিরগুলোও সুন্দর। প্রত্যেকটি মন্দিরই সোনা-রূপা ও নানা রত্নখচিত।

গ্যাংচী-অভিমুখে

সকাল ন'টায় শীগচী ছেড়ে যাত্রা শুরু হলো। চারপাশে ভরা-ফসলের ক্ষেত। পাশ দিয়ে পথ। পাছে ফসলে মুখ দেয়, এ জন্য খচ্চরগুলোর মুখে কাঠের জালি আঁটা। কোনো কোনো জমিতে জোয়ার এবং গমের শীষ সবে উঠেছে। সরষে ফুলের হলুদ বর্ণে চারদিক আলোকিত, কোথাও লাল ফুল ভরা মটর গাছের সারি। কোথাও চাষীরা জমিতে জলসেচ করছে, কোথাও চলছে নিড়ানির কাজ। মাইলের পর মাইল এই দৃশ্যাবলী। একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে সবুজ পাতায় ছাওয়া

সফেদা গাছের বাগান। বিরি গাছের কাটা মাথা থেকে সরু সরু বেতের সব ডাল গজিয়েছে। আমার মনে হলো যেন মাঘ মাসে —যুক্তপ্রদেশের (উত্তরপ্রদেশ—অনুঃ) কোনো এক গ্রামের পথ পেরিয়ে চলেছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম তু-রিং গ্রামে। আজ আমরা এখানেই থাকব।

আমার সহযাত্রী তিন জন খচ্চরওয়ালার মধ্যে একজন ছিল দলপতি, তার খচ্চরের সংখ্যা অন্য দু'জনের চাইতে বেশী ছিল। সে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা লোক। নিজেকে উচ্চ বংশজাত প্রমাণ করবার জন্য লোকটি তার বাঁ-কানে দু'আড়াই তোলা ওজনের ফিরোজা বসানো সোনার মাকড়ি পরে থাকত। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে ছিল সবুজ রঙের চওড়া পাথর-বসানো একটা আংটি। বাকী দু'জনের কানেও রূপোর মাকড়ি ছিল। মাথায় প্রত্যেকেরই 'ফেল্ট-হ্যাট'। ফেল্ট হ্যাট পরাটা তিব্বতে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

আমরা গ্রামে পৌঁছালে খচ্চরগুলিকে আশ্রয়গৃহের বাইরে উঠানে বাঁধা হলো এবং দানাপানি দেওয়া হলো। গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে গেলাম। গৃহকর্তার বাঁ-কানে ফিরোজা, প্রবাল, মুক্তা বসানো পেন্সিল প্রমাণ দিচ্ছে যে, সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমার সঙ্গীরা টুপী খুলে কাছে গিয়ে, জিভ বার করে কোমর অবধি ঝুঁকে তাকে অভিবাদন জানাল। এখানে আমার জন্য পৃথক আসন ও চায়ের জন্য চীনা মাটির পেয়ালা এল। আমার সঙ্গীদের জন্য এল শুকনো মাংস এবং ছঙ। গৃহস্বামীর নির্দেশে একজন পরিচারিকা সদা প্রস্তুত ছিল ছঙ সরবরাহে। আমার সঙ্গীদের অবস্থা সঙীন হলো। অবশেষে সন্ধ্যায় ছঙ-পর্ব শেষ হলো।

তিব্বতে শিল্পকলা ও সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ সর্বজনীন। এখানে যে ঘরটিতে ছিলাম তার দেওয়ালের হাসিয়া (dado) সুন্দর এবং অপূর্ব লাল সবুজ রঙের ঝালরে সুসজ্জিত। সত্তু রাখবার কাঠের পাত্রটিও বিচিত্র কারু-কার্যমণ্ডিত; চায়ের পেয়ালা রাখবার ছোট্ট জলচৌকিটিও রঙের বিন্যাসে অপরূপ। ঘরের প্রতিটি বস্তুতে গৃহস্বামীর শিল্পরুচির ছাপ পড়েছে। গদীগুলো শুকনো ঘাস আর পশম ভর্তি। তার ওপরে হাতে বোনা পশমী রঙীন পট্টি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। মেঝেতে চীনা কাজ করা গালিচা। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নামায় উঠানে কালো বর্ডার দেওয়া সাদা জিনের চাঁদোয়া টাঙানো হলো। জানালার পাল্লাগুলো কাঠের জালির ওপর কাপড় মুড়ে তৈরি। বাইরের দিকে সাদা জিনের পর্দা খাটানো। পর্দাগুলো দড়ি আর ঘুন্টির সাহায্যে টাঙানো। প্রয়োজন মতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। আমরা যেখানে বসেছিলাম, সেখানে গৃহকর্তার দুই ছেলে গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাঠ নিচ্ছিল। এ দেশে সুন্দর ও দ্রুত লেখার জন্য দু'রকমের হস্তলিপি চালু আছে। প্রথমটি 'উ-চেন' (মাত্রাযুক্ত) সুন্দর করে লেখা হয়; দ্বিতীয়টি 'উ-মেদ' (মাত্রাবিহীন) দ্রুত লেখা হয়। 'উ-মেদ' পদ্ধতির প্রয়োজন অধিক। ভিক্ষু ছাড়া

সকলেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। ছাত্রদের শেখানোর জন্য শিক্ষক মশায় ঘন ঘন বেত ব্যবহার করছিলেন।

এ বাড়িতে ঝি-চাকর প্রচুর সংখ্যক। তা সত্ত্বেও চাম কুশোক (গৃহকর্ত্রী মহিলা) মুগা ও মুক্তোর কাজ করা ঝালর বসানো ধনুকাকৃতির শিরোভূষণ চাপিয়ে খাবার দেওয়া, পূজার্চনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাতে মাংস সহযোগে থুক্‌পা খাওয়া হলো। গৃহস্বামী অনেকক্ষণ আমার জন্মস্থান লাদাখ (?) সম্পর্কে আলাপ করলেন। ধর্মালোচনাও হলো কিঞ্চিৎ পরিমাণ। রাত বাড়ায় জোর করে বৈঠক ভাঙা হলো। কর্তার ছেলে দুটি চুক্‌টু-র (নরম মোলায়েম পশমের থলি, আধুনিক স্লিপিং ব্যাগ জাতীয়) মধ্যে বেশ আরামে ঘুমোচ্ছিল। তিব্বতে স্ত্রী-পুরুষ নগ্ন-দেহে ঘুমোয়। স্বামী-স্ত্রী সর্বজন সমক্ষে নগ্ন-দেহে চুক্‌টু-র মধ্যে ঘুমোতে যায়। ধারে কাছে পরিবারের অন্য কেউ থাকলে কিছু যায় আসে না। আগেই বলেছি—এ দেশে লজ্জা-সরমের বালাই প্রায় নেই। চুক্‌টুর মধ্যে শুয়ে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন হলে ছেলেমেয়েরা বা অন্য কেউ চা ইত্যাদি দিয়ে আসে। এ জন্য কোনো তরফেই সঙ্কোচের ভাব দেখা যায় না। আবার ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তারাও বাবা মা-র সামনেই নগ্ন-দেহে স্ত্রী বা স্বামীর হাত ধরে ধীরেসুস্থে চুক্‌টু-র মধ্যে শুতে যেতে ইতস্তত করে না। সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপারে হলো—স্বামীর যদি একাধিক ভাই থাকে তা'হলে চুক্‌টু-র আয়তন বাড়াতে হয়। সে ক্ষেত্রে স্বামী দেবতাগণ, ভাগ্যবতী এজমালী স্ত্রীটিকে মাঝখানে রেখে যে যার নির্ধারিত স্থানে শোয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শীগর্চীর উচ্চতা ১২,৮৫০ ফুট আর গ্যাংচীর উচ্চতা ১৩,১২০ ফুট। এ জন্য শীগর্চী অপেক্ষা গ্যাংচীতে ঠাণ্ডা একটু বেশী। এখানে ক্ষেতে প্রচুর বেথুয়া শাক হয়েছে। আমাদের খচ্চর-বাহিনীর দলপতির পূর্বপুরুষের বাসস্থান জুগ্যা। এখানে আমরা যে বাড়িতে উঠলাম তার নক্‌সা-কারুকাজ সবই আগের গ্রাম তু-রিং-এর বাড়ির মতোই। আমাদের আসার খবর পেয়ে সর্দারের জ্ঞাতিভাইয়ের স্ত্রীরা খাদ্য পানীয় নিয়ে দেখা করতে এল। মুড়ি, খই, তেলে-ভাজা এবং আপেল ও কমলালেবুর মিঠাই—এমনি অনেক খবার এল। এ দেশের প্রথা হলো—খাদ্য-সামগ্রী যত বেশীই দেওয়া হোক না কেন তার সামান্য একটু মুখে দিতে হয়, তা না হলে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আমিও ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সর্দার বাধা দিয়ে বলল—যত পারেন খান। পরে প্রচুর মাখনযুক্ত চা এল। রাত্রে আমাদের রেখে সর্দার জ্ঞাতিদের সঙ্গে দেখা করতে গেলো।

৫ই জুলাই জোয়ারের আটা সেদ্ধ ও গরম সরষের তেল প্রাতরাশের জন্য এল, তবে আমি তা খেলাম না। বেলা দশটার সময় আবার যাত্রা শুরু হলো। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশে ফসল-ভরা প্রান্তর, মাঝখান দিয়ে পথ পাড়ি দিয়ে এলাম গা-চা গ্রামে। আগের গ্রামে আমাদের খচ্চরগুলোর ঠিকমতো বিশ্রাম হয়নি।

অতএব এই গ্রামে কয়েকদিন কাটিয়ে খচ্চরগুলোকে সস্তা ভুষি খাইয়ে নেবার প্রস্তাব করল ওদের মালিকরা। আমার অন্য একটি বাসনা ছিল —নাটক দেখার বাসনা।

গা-চা গ্রামের এক জমিদারবাড়ির গোয়ালঘরে গিয়ে উঠলাম আমরা। জমিদার ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য হয়নি। তবু বাড়িটির সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করল। প্রসঙ্গত বলছি —এ দেশে গোয়ালঘর বলতে আমাদের দেশের অন্ধকার, নোংরা, দুর্গন্ধময়, মশা, মাছি, ডাঁশের আবাস-স্থল বোঝায় না। এ দেশের গোয়ালঘর যথেষ্ট খোলামেলা ও পরিচ্ছন্ন। সব দিক থেকেই মানুষের বাসযোগ্য।

ভোটীয়-নাটক

চা খাওয়ার পর ভোটীয়-নাটক দেখতে গেলাম। গ্রাম ছাড়িয়ে, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে নদীর তীরে এক জায়গায় বসেছে নাটকের আসর। নাটকের আখ্যান ভাগ ছিল 'অচী লামা'র (স্ত্রী-দেবী) 'তেম্' (লীলা) বিষয়ক। অনেকটা আমাদের দেশের রামলীলা, কৃষ্ণলীলার মতো এতদ্দেশীয় ধর্মমূলক নাটক। আমাদের সঙ্গে দুটো বড়ো কুকুর ছিল। সে দুটোকে দরজার সামনে বেঁধে দরজায় তালা দিয়ে নাটক দেখতে গেলাম। সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা নাটকের আসর। এক পাশে বাবলা গাছের ঝোপ। গা-চা গ্রামের জমিদার প্রতি বছর এ রকম নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। খরচ খরচা বলতে সাজ-পোশাক, ভিক্ষু-অভিনেতাদের খাদ্য-পানীয় যোগানো, ক্ষেত্র বিশেষে পুরস্কার প্রদান এবং উপস্থিত অভিজাত দর্শকবৃন্দের আহার্য ও পানীয় সরবরাহের দায় বহন করেন গা-চা গ্রামের জমিদার। বিশাল চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। আসরের চারপাশেও চাঁদোয়া খাটোনো রয়েছে। ওগুলোতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শকদের ভিড়। যারা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে অনেক দূরের গ্রাম থেকে, তাদের ঘোড়া বাঁধা আছে বাবলা গাছে। আসরের ডান-দিকে কয়েকটি ছোট ছোট তাঁবু। সেখানে বিশিষ্ট অতিথিরা। বাকী সব দিকে সাধারণ মানুষ নিজেদের আসন বিছিয়ে বসেছে। দর্শকদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য নয়। গা-চা-র জমিদার মশাই আমাদের দেখামাত্র লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে ফরাসে বসালেন। নাটক দেখার সঙ্গে চা এবং ছঙ পান সমানে চলছিল।

দুপুরের রোদ্দুর কড়া হওয়া সত্ত্বেও দর্শকদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নির্বিকার বসেছিল যে যার জায়গায়। আসরের চেহারা আমাদের দেশের যাত্রার আসরের মতো। আসরের মাঝখানে সমতল-মঞ্চ। দৃশ্যপট, পর্দা, উইংস ইত্যাদির বালাই নেই। আসরের এক ধারে চামড়ার তৈরি বড় বড় জালা-ভর্তি ছঙ। তার পাশে বসেছে বাজনদারেরা। বড় বড় লাঠির মাথায় বাঁধা ডমরু, লম্বা লম্বা

বীণ, সানাই আর একটি ঢাক—বাজনা বলতে এগুলোই। বাজনদার এবং অভিনেতারা সব ক'জনই কাছাকাছি এক বিহারের ভিক্ষু (ঢাবা)। নাচ, গান, কৌতুক, তামাশা মেশানো নাটক। বিষয়বস্তু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম-সংক্রান্ত। অর্থাৎ জাতকের গল্প। অভিনেতাদের মুখে কাগজ অথবা কাপড়ের মুখোশ। পোশাক পরিচ্ছদ মানানসই এবং সুন্দর। গানের কথা ক'জন বুঝছিল হাতে গোণা যায়। তবে গানে তাল মেলাচ্ছিল দর্শকেরা। অভিনেতাদের উচ্চারণভঙ্গি ছিল কৃত্রিম। গদ্য-সংলাপ যদি বা কারো বোধগম্য ছিল, পদ্য-সংলাপ ছিল অবোধ্য। অভিনয়ে লম্ফঝম্পের অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় দৃশ্যে এল স্ত্রী-চরিত্র সমূহ। সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো পোশাক। পরচুলা ব্যবহারের বাড়াবাড়ি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কেন না তিব্বতী মেয়েরা এমনিতেই যথেষ্ট পরচুলা ব্যবহার করে। স্ত্রী-চরিত্রে সাজ-সজ্জা ও অভিনয়ে একজন পুরুষ এত নিখুঁত ছিল যে মহিলা-দর্শকরা তাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলে সন্দেহ করতে লাগল। নাটকের প্রহসনের একটি দৃশ্যে ছিল একজন বৈদ্য, অপর জন মন্ত্রবিশারদ। নাটকের এই অংশটুকু ছিল অতিমাত্রায় স্থূল। অশ্লীল সংলাপ এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি দেখে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। নাটকের সবকটি চরিত্রই দেবতার। অতএব সুরাপানের দৃশ্য ছিল বহু। সুরাপানের দৃশ্যগুলি কিন্তু অভিনয়ের মতো কৃত্রিম ছিল না। এইসব দৃশ্যে অকৃত্রিম ছঙ পান চলছিল।

অভিনয় চলাকালেই আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত দর্শকদের খানাপিনা দেওয়া হলো। খাবারের মধ্যে ছিল মাংস এবং ডিমের সেওয়ঁই। আমার কাছে এল কাঠের বারকোসের ওপরে চীনা মাটির বাসনে রাখা খাবার এবং চীনা-ধাঁচে খাওয়ার চপষ্টিক। দীর্ঘকাল চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এদের জীবন-যাত্রায় ও সংস্কৃতিতে চীনা প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। মাংসের জাতি-গোত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে শুধু ডিমের সেওয়ঁই নিলাম।

শেষ বেলায় নাটক শেষ হলো। ফিরতি পথে মনে হলো আমাকে দেখিয়ে একজন লোক অপর জনকে বলল—লোকটি নিশ্চয়ই ভারতীয়। কথাটা শুনে অস্বস্তি বোধ করলাম।

কুকুর দুটো আমার খুব বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। এ দেশী কুকুরগুলোর আকার যত বড়োই হোক না কেন খাদ্যের পরিমাণ অতি অল্প। সকালে দেড়-দু'সের গরম জলে দু'ছটাকের মতো সত্তু গুলে একবার খাইয়ে দেয় এবং সন্ধ্যায়ও সমপরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয়। রাতে লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়। দ্বিতীয় দিন নাটক দেখতে যাইনি। আমার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সত্তু ছিল। তারই খানিকটা জলে গুলে কুকুর দুটোকে খাওয়ালাম। এক একটি কুকুর দেড় সেরেরও বেশী সত্তু ও সেই পরিমাণ জল খেয়ে নিল। দেখে মনে হলো এ দেশের কুকুরগুলো সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকে। এ জন্যেই বোধ হয় এদের রাগ এত বেশী।

আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সে বাড়িতে একটা বিপুলকায় কুকুরের চামড়ায় ভুষি ভরে দেওয়ালে টাঙানো ছিল। কোনো কোনো বাড়িতে এভাবে ভালুক কিম্বা ইয়াকের চামড়া টাঙানো থাকে। তিব্বতীদের বিশ্বাস এগুলোর প্রভাবে বাড়িতে অপদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ থাকবে। কোনো কোনো বাড়িতে রাতে ছাদে কুকুর ছাড়া থাকে। একদিন রাতে এক সঙ্গী নিয়ে ছাদে শুয়েছিলাম। টের পাইনি কখন আমার সঙ্গী ঘুম থেকে উঠে নেমে গেছে। ঘুম ভাঙতেই চক্ষু চড়ক গাছ। কয়েকটা কুকুর প্রস্তুত। জানতাম শায়িত লোককে কুকুর কিছু বলবে না। অতএব প্রাণপণ চেষ্টায় মট্‌কা মেরে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে বাড়ির একজন লোক এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক। যাই হোক সে দিন ওই লোকটার দৌলতে অক্ষতদেহে ছাদ থেকে নামতে পেরেছিলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞের কাছে শুনেছিলাম যে তিব্বতীরা উকুন খায়। একজন খচ্চরওয়ালা অবশ্য খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে কথাটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। একদিন আমাদের দলনেতার এক আত্মীয়া তার সঙ্গে দেখা করতে এল। আত্মীয়াটি যুবতী। তিব্বতীরা সচরাচর স্নান-টানের ধারে-কাছে যায় না। সে জন্য তাদের দেহে উকুন বাসা বাঁধে। মেয়েদের পরনে থাকে গরম কাপড়ের ছুপা, ওপরে চাপানো থাকে রেশম, এণ্ডী অথবা মুগার রঙীন জ্যাকেট। ছুপার নীচে থাকে সুতীর ঘাগরা। পোশাকের যে অংশ গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকে, উকুনেরা সে দিকেই ঘর-সংসার বসায়। সে দিন সেই যুবতী আমাদের সামনে তার জ্যাকেট খুলে কালো কালো মুসুরীদানার মতো উকুনগুলো ধরে ধরে খেতে লাগল। পরে আরও একজনকে উকুন খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে স্বীকার করেছিল। বলেছিল এ দেশের প্রায় সর্বত্রই উকুন খাওয়ার রেওয়াজ আছে আর উকুন খেতে একটু টক টক লাগে।

৮ই জুলাই ভোরে রওনা হলাম। বের হওয়ার আগে চা-সত্তু সহযোগে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। গ্রামের বাইরে আসতেই আমাদের দলের একটি খচ্চর পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে লাফ মারল। ফলে তার পিঠে বাঁধা চালের বস্তাটা ঝুলে পড়ল। যাই হোক বস্তাটা আবার ঠিক করে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। অনেকক্ষণ দক্ষিণমুখো চলবার পর পুবদিকের মোড়ে দেবালয় দেখলাম। দেবালয়ের পাশ কাটিয়ে, সেচ-নালার ধার ঘেঁসে এগিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর চড়াই শুরু হলো। ধীরে ধীরে চড়াই পার হয়ে বিকেল চারটের আগেই স-চা গ্রামে পৌছে গেলাম। গ্রামের লাগাও একটি বিহার। বিহারের নামটি ভারি সুন্দর —নে-সা।

এ দিকে খচ্চরওয়ালাদের হাবভাব ভালো ঠেকছে না। এ ক'দিন মিলেমিশে চলছিলাম। সহসা তারা নানা ধরনের উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। হেতু খুঁজে পেলাম না। বুঝতে পারলাম না কি করা উচিত, কি অনুচিত। একবার ভাবলাম খচ্চরের পিঠ থেকে মাল ওঠানো নামানোয় হাত লাগাই। মুরোদের

অভাবে তাও সম্ভব হলো না। এ ধরনের ব্যবহার শুধু এদের নয়, ভোটীয়দের স্বভাবগত। ওরা বলল—কাল ভোরে রওনা হয়ে গ্যাংচীতে চা খেয়ে, সন্ধ্যা নাগাদ কাছাকাছি কোনো গ্রামে বিশ্রাম নেব। গ্যাংচীতে খচ্চরের খাবারের দাম খুব বেশী সে জন্য ওখানে থাকব না।

৯ই জুলাই ভোরবেলায় স-চা ছেড়ে চললাম। পথে দেখলাম এ দিকের মাঠে মাঠে প্রচুর সেচ-নালা। জলপ্রবাহ প্রবল। নালাগুলোর শেষ প্রান্তে সত্তু পেষাই-এর বহু পাণ-চাক্কী দেখা গেলো। এ ছাড়াও, গ্রামের ভেতরে কয়েক কোটি মন্ত্র-ভরা একটি বিশাল মাণী দেখলাম। মাণীর বাইরের দিকে একটি লম্বা দণ্ডাকৃতি টুক্‌রো বের করা ছিল। প্রতিবার চক্কর দেওয়ার পরই দণ্ডটি মাণীর উপরের ছাউনীতে লট্‌কানো ঘণ্টায় গিয়ে আঘাত করে। মনে হলো ব্যাপারটা ঘটতে এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে। সময়ের এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে ঐ মন্ত্র কয়েক কোটি বার জপ করা হয়ে যাচ্ছে। অতএব এই সুবৃহৎ মাণীটি প্রতি পলে এই গ্রামের জন্য যে বিপুল পরিমাণ পুণ্য অর্জন করে চলেছে তার হিসেব রাখা পৃথিবীর সেরা অঙ্কশাস্ত্রবিদের পক্ষে অসাধ্য মনে হয়। আর যে বুদ্ধিমান, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি অর্জিত পুণ্যের সুবাদে ইন্দ্র কিম্বা ব্রহ্মার আসন বহুকাল দখলে রাখতে পারবেন। একদিনে, এক মাসে, এক বছরে কি পরিমাণ পুণ্য সঞ্চিত হবে তার হিসেব করতে গিয়ে যে গোলকধাঁধায় পথ হারালাম তা থেকে বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সহসা মনে পড়ল তিব্বতীরা মহাযান পন্থী। মহাযান মতে যে কোনো ব্যক্তির উপার্জিত পুণ্যফল প্রাণীজগতে সকলের মধ্যে বিতরিত হয়ে যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম এ দেশের এ রকম সহস্র মাণীর অর্জিত পুণ্যফলের দৌলতেই ঘোর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত পৃথিবী সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যায়নি। গ্যাংচীতে পৌছাতে দশটা বাজল। ধর্মমান সাহু নামে এখানকার একজন ব্যবসায়ীর বদান্যতার কথা সিংহলেই এক লাদাখী বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। কিছুদিন যাবৎ তাঁর এখানকার দোকানটা বন্ধ আছে। গ্যাংচীতে তাঁর দোকানের নাম গ্যোঙ-লিং-ছোক-পা। তিব্বতে গ্রামে বা শহরে নম্বরের বদলে প্রতিটি বাড়িরই একটা করে আলাদা নাম থাকে। এখনও লাসায় পৌছাতে আট দশ দিন লাগবে, সে জন্য কিছু খাবার জিনিসপত্র কিনতে ধর্মমান সাহুর দোকানে যাব তাই খচ্চরওয়ালাদের বললাম ওদের সঙ্গে দুপুরে দেখা করব।

আমার কথা শুনে খচ্চরওয়ালারা জানাল তারা মত পরিবর্তন করেছে। তার মানে তারা আজ গ্যাংচীতেই থাকছে। কাল সকালে রওনা হবে। গ্যাংচী ভারতবর্ষ থেকে লাসা যাবার প্রধান সড়কের ওপরে অবস্থিত। এই সড়কই কালিম্পং হয়ে শিলিগুড়িতে গিয়ে ই. বি. রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানে ভারত সরকারের বাণিজ্য-দূতাবাস এবং নেপালের রাজদূত আছে। তা'ছাড়া এখানে সহকারী বাণিজ্য-দূত, ডাক্তার, কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর

বাসস্থান রয়েছে। তাদের প্রহরার জন্য মোতায়েন আছে শতাধিক ভারতীয় সৈন্যের একটি বাহিনী।

লাসার পথে

রাতে বৃষ্টি নামল। তার জের চলল পরদিন বেলা দশটা অবধি। এখানে রোজ হাট বসে। সকাল আটটা থেকে দশটা হাটের মেয়াদ। হাটে কাঁচা মূলো, চিঁড়ে, চিনি, চাল, চা এবং কিছু মিষ্টি কিনে নিলাম—পথের জন্য। খানিক সিদ্ধ করা মাংসও কিনলাম।

গ্যাংচীর পশ্চিম দিকের পর্বতমালার একটি শাখা শহরের ভেতরে এসে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন অংশটির শেষ প্রান্তে গ্যাংচীর জোঙ (কেল্লা)। তাকে ঘিরেই এ শহরের জন-বসতি। শহরের প্রধান বাজারটি শুরু হয়েছে পাহাড়ের ডান-দিক থেকে, শেষ হয়েছে বাঁয়ে ঘুরে একটি বিহারের দরজায়। গ্যোাঙ-লিং-ছোক-পা যে রাস্তায়, সেই রাস্তায় মন্ত্র খোদাই করা এক বিরাট প্রাচীর। লোকালয় এবং ক্ষেত-খামার পাশাপাশি রয়েছে। বৃষ্টির জল রাস্তা ভাসিয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। গম এবং জৌ (বার্লি) ক্ষেত বৃষ্টির জলে নেয়ে অনাবিল সবুজ হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন বহুদূর বিস্তৃত সবুজ গালিচা। অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পাটকিলে রঙের একখানা বিশাল বাড়ি। ওটি বৃটিশ দূতাবাস। এরপর চোখে পড়ল টেলিগ্রাফের তার—গ্যাংচী থেকে লাসা পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্যাংচী ছাড়িয়ে চোখে পড়ল ভোটীয় বা তিব্বতী ডাক বহনকারীদের।

গ্যাংচী থেকে রওনা হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার বৃষ্টি নামল। আমাদের এক সঙ্গী গ্যাংচীতে তার ফেলে আসা কুকুর আনতে আবার গ্যাংচী ফিরে গেলো। আমরা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। কিছুদূর উত্তর-পূর্ব দিকে চলবার পর দি-কি-টো-মো গ্রামে পৌছালাম। এখানকার একজন ধনী গৃহস্থের জন্য একখানা চিঠি বয়ে এনেছে খচ্চরওয়ালারা। চিঠি আনা-নেওয়া ওদের আর এক কাজ। ঝিরঝির বৃষ্টি চলছেই। দ্রুত তাঁবু খাটিয়ে চললাম ধনী গৃহস্থের বাড়ি। আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল বিশাল এক কালো কুকুর। দরজা পেরিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ির পাশেও তেমনি আর একটি কুকুর বাঁধা ছিল। তাদের তর্জন-গর্জন শুনে সেই বাড়ির একটি ছেলে এসে কুকুরের মুখ চেপে ধরলে আমরা ওপরে গিয়ে রান্নাঘরের গদীতে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চা, সত্তু এবং ঘোল এল। গৃহকর্তা আমার জন্মভূমি লাদাখ (?) সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বাড়িতে গৃহস্থের কল্যাণার্থে আগত কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গেও কথা হলো। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। আমরাও ফিরেছি, তার একটু পরেই আমাদের সঙ্গীটি তার কুকুর নিয়ে গ্যাংচী থেকে ফিরে এল। তাঁবুর

উত্তর দিক থেকে বয়ে চলেছে ছোট এক নদী এবং তাঁবুর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি স্তূপ স্থাপিত রয়েছে। পূর্বপরিচিত সেই গৃহস্থ সন্ধ্যার দিকে এক হাতে জপমালা এবং অন্য হাতে মাণী নিয়ে স্তূপটিকে পরিক্রমা করতে এলেন। ধীরে ধীরে দিনের আলোর চিহ্ন রইল না। সঙ্গীরা বেরিয়েছে। তাঁবুতে আমি একা। বৃষ্টির বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছিল। একা বসে ভাবছিলাম —একটি একটি করে সব বাধা টপকে এলাম। কত সহজে পেরিয়ে এলাম গ্যাংচী। তিব্বতের হৃৎপিণ্ড লাসা আর কয়েকদিনের পথ। নেপালের পথে কত লোক কত বিপদের কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তার কিছুই ঘটেনি। গোণাগুণতি ক'টা দিন। তার পরেই পৃথিবীময় নিষিদ্ধ নগরী বলে চিহ্নিত লাসার দরজা আমার সামনে খুলে যাবে। তার সব রহস্য উন্মোচিত হবে। দেশে ফিরে গিয়ে বলতে পারব —অযথা লোকে এই সুন্দর দেশে আসতে ভয় পায়।

পঞ্চম পর্ব

অতীত ও বর্তমান তিব্বত মূল্যায়ন

ভারত-তিব্বত পারস্পরিক সম্পর্ক

তিব্বতের মতো অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। সকলের সাধারণভাবে জানা আছে ভারতের উত্তর সীমান্তের ও পারে তিব্বত একটি দেশ। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরাও এ ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না। এক বন্ধুকে লেখালিখির জন্য কিছু কাগজ পাঠাতে লিখেছিলাম। জবাবে বন্ধুটি লিখলেন আমি যেন সত্বর আমার কাছাকাছি একটি তিব্বতী রেলষ্টেশনের নাম লিখে জানাই। এই হলো তিব্বত সম্পর্কে শিক্ষিতের জ্ঞানের বহর। ভারত সীমান্ত থেকে কুড়ি-বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে বেশ কয়েকটি চড়াই, উৎরাই, লা ইত্যাদি পেরিয়ে মাসখানেকের মধ্যে লাসা পৌছানো যায়। অবশ্য এ জন্য চাই ভারত এবং তিব্বত এই দুই সরকারের অনুমোদন। গ্যাংচীতে আছে বৃটিশ দূতাবাস, বৃটিশ ডাক বিভাগ। ওটি ভারতীয় ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমান পৃথিবী থেকে তিব্বত যে এ যাবৎকাল অপরিচিত থেকে গেছে, তার প্রধান কারণই হলো এ দেশটির প্রাকৃতিক দুর্গমতা। তিব্বতের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ঘিরে রয়েছে বিশাল হিমালয়। ঠিক এ রকম ভাবেই রাজধানী লাসা থেকে মাত্র একশো মাইল দূরত্বের মধ্যেই প্রায় সমগ্র উত্তর দিক জুড়ে রয়েছে এক বিরাট মরুভূমি যার নাম গোবি। ভৌগোলিক বিচারে এ দেশ বিশ্বের উচ্চতম জনপদ অধ্যুষিত উপত্যকা। এখানকার অধিকাংশ স্থানই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ষোল হাজার ফিটের ওপরে এবং বছরে আট মাস তুষারাচ্ছন্ন থাকে। ভারতবর্ষ থেকে এ দেশে আসার দুটি পথ আছে, একটি কাশ্মীর-লাদাখ হয়ে, অপরটি দার্জিলিং কালিম্পং হয়ে। দার্জিলিং থেকে লাসার দূরত্ব ৩৬০ মাইল।

বিপুল আয়তন তিব্বত রাজনৈতিকভাবে চীন সাম্রাজ্যের অধীন। অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। একই ধর্মবিশ্বাস সত্বেও এক অঞ্চলের জীবন ধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিশেষ মিল নেই। ধর্ম এ দেশের মানুষের সামাজিক জীবনে এক বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রধান ধর্মগুরু দলাই লামাকে এরা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার বলে মানে। তিব্বতীদের বিশ্বাস, যখনই কেউ দলাই লামা পদে অভিষিক্ত হন, তখনই ভগবান বুদ্ধের আত্মা তাঁর মধ্যে

আবির্ভূত হন। অসংখ্য মঠ, বিহার, গুম্ফা ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে সারা দেশ জুড়ে। লাসাতে এমন তিনটি মঠ আছে, যার প্রত্যেকটিতে পাঁচ হাজারেরও বেশী ভিক্ষু থাকে।

প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য তিব্বত পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ তারই ফলস্বরূপ এরা ভীষণ রকমের এক আত্মকেন্দ্রিক এবং সন্দেহপরায়ণ জাতিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণভাবে তিব্বতীরা খুব শান্ত এবং ভদ্র, সব সময় নিজেদের নিয়েই আছে। কিন্তু বিদেশী মাত্রেই এদের চোখে সন্দেহের পাত্র। নিজেদের প্রাচীন ধর্মের প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস তো আছেই, এ ছাড়াও সামাজিক রীতিনীতি, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই এরা পুরানো নিয়ম অনুসরণ করে। এর অন্যথা ঘটাবার কথা এরা চিন্তাও করে না। এভাবেই এদের জীবনযাত্রা চলে আসছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকরশ্মি এখনও এ দেশের দুয়ারে থমকে আছে। ভেতরে প্রবেশাধিকার কবে পাবে তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। বোধ হয় এই আশঙ্কাতেই এ দেশে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে এদের এত সতর্কতা। কিন্তু কোনোক্রমে যদি কেউ এ দেশে প্রবেশ করার অনুমতি সংগ্রহ করতে পারে, তা'হলে আর কোনো চিন্তা নেই। জাতি হিসাবে এ রকম অতিথি বৎসল, পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

পানীয় হিসেবে চায়ের চলন খুব বেশী। এ ছাড়া ছঙ (কাঁচা মদ)-এর চলনও কম নয়। অবসর সময়ে নাচগান করা এ দেশের মানুষের অতি প্রিয়। নাচিয়েদের দলে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেয়েরা নাচ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী নয়। তিব্বতে মেয়েরা স্বাধীন, আমাদের দেশের মতো পর্দার আড়ালে বাস করে না।

এ দেশে প্রবেশ করা খুবই কষ্টকর। বিশেষত লাসা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রবেশ করা যে কি কঠিন তা তিব্বত সম্পর্কে যাঁরা বইপত্র পড়েছেন তাঁদের আর নতুন করে কিছু বলার নেই। আমার নিজের কথাই ধরা যাক। আমি ৬ই ফাল্গুন ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করেছিলাম, আর আষাঢ় মাসের ১৩ই তারিখে লাসা পৌঁছেছিলাম। আমার এই দেশে আসাটা কোনো ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা মেটানো কিম্বা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেশে আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা হলো, এ দেশের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা সম্বলিত বইপত্র, ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তরক্ষিত থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় পর্যন্ত তিব্বত এবং ভারতবর্ষের (উত্তর ভারত) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। ভাষা, বর্ণমালা এবং ধর্ম এই তিনটি জিনিসই তিব্বত ভারতবর্ষ থেকে নিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিতেরা এ দেশে এসে সহস্র সহস্র গ্রন্থ সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষা থেকে

তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কাজ যে কি বিরাট পরিমাণে হয়েছিল তার একটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদের দুটি সংগ্রহ এখানে আছে যার একটির নাম কঞ্জুর ও অপরটির নাম তঞ্জুর। এই দুটি গ্রন্থে ২০ লক্ষের অধিক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত শ্লোক বর্তমান। কঞ্জুরে যে সমস্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সংগৃহীত আছে, তার সমস্ত কিছুই ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বলে তিব্বতীরা বিশ্বাস করে। কঞ্জুর মুখ্যত, সূত্র, বিনয় এবং তন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই কঞ্জুরের আর এক নাম হলো শতপুঁথি। তার কারণ এটি একশো বেষ্টনীতে বাঁধা। কিন্তু আলাদা করে গুণলে দেখা যাবে সাতশোরও কিছু বেশী গ্রন্থের সমন্বয়ে এটি প্রস্তুত। কঞ্জুরের মধ্যেকার কিছু গ্রন্থ আবার মূল সংস্কৃত থেকে প্রথমে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর তঞ্জুরের মধ্যে কঞ্জুর গ্রন্থাবলীর টীকা, ব্যাখ্যা ছাড়াও দর্শন, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো দুশো পুঁথিতে বাঁধা। এই বিশাল সংগ্রহের মধ্যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র আর্যদেব, দিঙ্‌নাগ, ধর্মরক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির মূল গ্রন্থাদির প্রায় সমস্তটুকুই সযত্নে রক্ষিত আছে, অবশ্যই ভাষান্তরিত হয়ে। অথচ ভারতে ঐ সব মহান্ দার্শনিকদের কীর্তির চিহ্নমাত্র বর্তমান নেই; কেবল তিব্বতী ভাষাতেই তাঁদের অমূল্য সৃষ্টি সযত্নে রক্ষিত আছে। আচার্য চন্দ্রগোমীর চান্দ্র ব্যাকরণ এবং তার সূত্র, ধাতু, টীকা ইত্যাদিও পাওয়া যাবে তঞ্জুরের মধ্যে। চন্দ্রগোমী প্রাচীন যুগের আট জন মহা বৈয়াকরণের একজনই শুধু ছিলেন না, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল যথেষ্ট। তঞ্জুরের মধ্যে সংগৃহীত পত্রী দেখে এই তথ্য আমরা জানতে পারি। অশ্বঘোষ, মতিচিত্র (মাতৃচেতা), হরিভদ্র, আর্যশূর প্রভৃতি মহাকবির রচিত কাব্যসম্ভারের অনেকাংশই আমাদের দেশে বিরল অথচ এখানে তার সবই সংগৃহীত আছে। তদুপরি কালিদাস, দণ্ডী, হর্ষবর্দ্ধন, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি আদি কবিরাও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন তঞ্জুরের মধ্যে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত অষ্টাঙ্গহৃদয়, শালিহোত্র লিখিত গ্রন্থ এবং তার টীকা-উপটীকা সহ এখানে বর্তমান। এ ছাড়াও মহারাজ কণিষ্ককে লেখা মতিচিত্রের পত্র, যোগীশ্বর জগদ্রবের মহারাজ চন্দ্রকে লেখা পত্র এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কার পাল-বংশীয় সম্রাট নয়পালকে লিখিত পত্রাবলীর অনেক প্রতিলিপিও এখানে সঙ্কলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ যোগী, অনেক অবধূত ইত্যাদির রচিত দোঁহা, বচন, আদি হিন্দী ভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকে সরাসরি অনূদিত হয়ে তঞ্জুরে স্থান লাভ করেছে।

এই দুই বিশাল গ্রন্থাবলী ছাড়াও নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, চন্দ্রগোমী, কমলশীল, শীল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মনীষীদের জীবনচরিতও তিব্বতী ভাষায় আলাদা গ্রন্থাকারে লিখিত আছে। তারানাথ,

বুতোন, পদ্মকরপো, বেদুরিয়া, সেরপো, কুন্‌গ্যাল প্রভৃতির অনেক ছোজুং (ধর্ম-ইতিহাস) এ দেশে রক্ষিত আছে যা আমাদের দেশের প্রচীন ইতিহাসের ওপরও যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই সমস্ত নম্‌থর, (জীবনচরিত) ছোজুং, কঞ্জুর এবং তঞ্জুর ছাড়া আরও এমন অনেক গ্রন্থ এ দেশে আছে, যা আমাদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও, প্রচীন যুগের ইতিহাস চর্চার জন্য পরিপূরক হিসেবে ভালো সহায়ক হতে পারে।

এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই কৈলাস-মানসসরোবরের কাছাকাছি থোলিং গুম্ফা (বিহার), মধ্য তিব্বতের সক্যা, সম-য়ে ইত্যাদি বিহারগুলিতে বসেই রচিত বা ভাষান্তরিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিহার থেকে আমরা সংস্কৃত বা অন্য ভারতীয় ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থগুলোকেও হয়ত পেতে পারতাম, যদি বিদেশী বর্বর হামলা-কারীদের হাতে সেগুলো নষ্ট না হতো। অনূদিত রচনাবলী তিব্বতের বহু জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে ওগুলো বিদেশী আক্রমণ সত্বেও টিকে গেছে। সঠিকভাবে খুঁজলে এখনও কিছু একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত পুঁথিপত্রের হদিশ মিলতে পারে বলেই আমার অনুমান।

আচার্য শান্তরক্ষিত

(আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

সম্রাট অশোকের সম্বন্ধে যেমন বলা যায় যে তিনিই ছিলেন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথিকৃৎ তেমনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের প্রধান রূপকার হিসেবে সর্ব প্রথমে যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন আচার্য শান্তরক্ষিত। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আচার্য শান্তরক্ষিতের এ দেশে আসার আগেই, সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো যখন এ দেশের শাসন-ক্ষমতায় আসীন, (৬১৮-৬৫০ খৃঃ.) সে সময় তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো নেপাল জয় করেন এবং তৎকালীন নেপাল-রাজ অংশুবর্মার কন্যাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি চীনের এক বিরাট অংশ নিজের রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ হন এবং চীনা রাজকুমারীর সঙ্গেও তাঁর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই প্রাচীন যুগের অবশিষ্ট দুটি মন্দির আজও লাসার কাছে দেখতে পাওয়া যায়, যার নির্মাণকাল সম্রাট স্রোঙ-চেন-স্‌গেম-পো-র আমল। মন্দির দুটির একটির নাম রমোছে অপরটির নাম চেরোম্পোছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম এ দেশে অনেক আগেই প্রবেশ করেছিল, তা'হলেও এ সময়ে তিব্বতে কোনো মঠ বা বিহারও ছিল না বা কোনো ভিক্ষুও ছিল না। আচার্য শান্তরক্ষিত এ দেশে বৌদ্ধধর্মের দৈন্যদশা ঘুচিয়ে তাকে সারা তিব্বতের সাধারণ মানুষের ধর্ম রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। আমাদের দেশ আচার্য শান্তরক্ষিতের মহৎ কীর্তিকে মনে রাখেনি কিন্তু এ দেশে তাঁর জীবন-

চরিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়। এই মহান্ পুরুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু ঘটনাপঞ্জী যা এ দেশের গ্রন্থাদি থেকে পেয়েছি, তা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

মগধের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশ (অধুনা মুঙ্গের-ভাগলপুর অঞ্চল) যা বিভিন্ন পালি এবং সংস্কৃত গ্রন্থে অঙ্গদেশ নামে বর্ণিত হয়েছে তার পূর্ব প্রান্তের অঞ্চল সমূহের নাম ছিল সহোর। তিব্বতীরা অবশ্য সহোরের উচ্চারণ করে জহোর। কোনো কোনো তিব্বতী গ্রন্থে আবার সহোরকে ভঙ্গল বা ভগল নামেও অভিহিত করা হয়েছে। সেই আদি ভগল নামের ছায়া নিয়ে আজও ভাগলপুর শহর বর্তমান। এইখানেই গঙ্গাতীরে বিখ্যাত পাল-বংশীয় সম্রাট ধর্মপাল এক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বিহারটির নাম নিকটস্থ গ্রাম বিক্রমপুরীর নামানুসারে বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিক্রমপুরী গ্রামের উত্তরে ছিল এই বিহারের অবস্থান। বিক্রমপুরীর অপর নাম হিসেবে বিক্রমপুর বা ভাগলপুরের উল্লেখও বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুরী গ্রামটি ছিল সে যুগের এক মাণ্ডলিক (সামন্ত) রাজ্যের রাজধানী। তিব্বতী ইতিহাসবেত্তাদের তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে প্রায় লক্ষাধিক লোক অধ্যুষিত ছিল এই অঞ্চল। যে রাজবংশে পরবর্তী যুগে আর একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিত এবং তিব্বতে ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণীর অন্যতম প্রধান প্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (জন্ম : ৯৮২ খৃঃ., মৃত্যু : ১০৫৪ খৃঃ.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই রাজ বংশেই সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে (আনুমানিক ৬৯০খৃঃ.) আচার্য শান্তরক্ষিতেরও জন্ম হয়।

অমিতাভ বুদ্ধের চরণ স্পর্শে বহুবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র হয়েছিল। একবার ভগবান তথাগত সম্পূর্ণ একটা বর্ষা ঋতু এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। এই নালন্দার খুব কাছেই একটি গ্রাম, যার নাম ছিল নালক, সেখানে বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ধর্মসেনাপতি সারিপুত্তের জন্ম হয়েছিল। এ সমস্ত তথ্যাবলীই প্রমাণ করে এ জায়গা কত পবিত্র। এখানে বুদ্ধের জীবিতকালেই প্রবারক শেঠ তাঁর আম্রবনটি তথাগতের চরণে উৎসর্গ করেন। তার ফলে সেই আম্রবনে ছোট একটি বিহার আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের যে তৃতীয় ধর্ম-সঙ্গীতি (মহাসভা) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সর্বাস্তিবাদী ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলিকে স্থবিরবাদীরা বহিষ্কৃত করেন। তারপর থেকে সর্বাস্তিবাদীরা নালন্দা গ্রামে (অধুনা পাটনা জেলার বড়গাঁও-এর কাছাকাছি) তাদের নিজস্ব অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং পরবর্তী কালে সেটিই তাঁদের স্থায়ী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এরপর মৌর্য-বংশকে সরিয়ে দিয়ে শুঙ্গ-বংশীয় রাজারা মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। মৌর্যরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক, আর শুঙ্গ-বংশীয়রা ছিলেন প্রচণ্ড বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী। যার ফলে সে সময় সমস্ত মত ও পথ অনুসরণকারী বৌদ্ধরাই তাঁদের

কেন্দ্র মগধের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। সর্বাস্তিবাদীরা মথুরার গোবর্দ্ধন পাহাড়ের ওপরে তাঁদের নতুন কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই নিজেদের পিটকের (শাস্ত্রগ্রন্থের) সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ইতিহাসে এই সর্বাস্তিবাদ আর্য-সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত। পরবর্তী যুগে, যখন কুষাণ বংশীয় সম্রাটগণ উত্তর ভারতের শাসক রূপে অধিষ্ঠিত হন। সে সময় আবার সর্বাস্তিবাদীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং তাঁরা রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। তখন তাঁদের কেন্দ্র মথুরা থেকে আবার রাজধানী গান্ধার অঞ্চলে চলে যায়। কাশ্মীর-গান্ধারের সর্বাস্তিবাদ মূল-সর্বাস্তিবাদ নামে খ্যাত। এই সর্বাস্তিবাদের পক্ষে সম্রাট কণিষ্ক এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন এবং সে জন্য তাঁকে দ্বিতীয় অশোক'ও বলা হয়। সম্রাট কণিষ্ক তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা স্তূপে "আচরিয়ণাং সর্ব্বতথবাদিনং পরিগাহে" (সর্বাস্তিবাদী আচার্যদের পরিগ্রহ ট্রাষ্ট) এই শব্দ কটি উৎকীর্ণ করে স্তূপটিকে তিনি সর্বাস্তিবাদীদের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে চতুর্থ বৌদ্ধধর্ম মহাসভা আহ্বান করেন এবং সেই মহাসভায় মূল-সর্বাস্তিবাদী মতানুযায়ী ত্রিপিটকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা টীকাকারে রচিত হয়। এই সামগ্রিক টীকা খণ্ডের নাম বিভাষা। আর এইজন্য মূল সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুই শাখার অন্যতম মহাযান মতের সৃষ্টি হয় এই মূল সর্বাস্তিবাদ থেকে। অতঃপর বৈপুল্য (পালি ভাষায় বৈতুল্য), অবতংসক ইত্যাদিরা আলাদা আলাদা সূত্রপিটক রচনা করেন। কেবল মাত্র বিনয় পিটকটি (ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ, বিনয়, সূক্ত এবং অভিধর্ম) যথাযথভাবে মূল সর্বাস্তি-বাদের অনুরূপ থেকে যায়। পরবর্তী কালে মহাযান থেকে বজ্রযান মতের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অন্তিম সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দী) সহজযান নামক এক ঘোর বজ্রযান মতেরও আবির্ভাব হয়। কিন্তু এত মতের ভেদাভেদ সত্ত্বেও নালন্দা, ওদন্তপুরী (অধুনা পাটনা জেলার বিহার শরীফের কাছে অবস্থিত ছিল। মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলজীর হাতে এই বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়) এবং বিক্রমশীলা মহাবিহারে মূল সর্বাস্তিবাদী বিনয় পিটককেই অনুসরণ করা হতো। তিব্বতী ভিক্ষুরা আজও এই বিনয় পিটক মেনে চলেন এবং যথেষ্ট গর্বভরে তাঁরা বলে থাকেন যে, বিনয় (মূল সর্বাস্তিবাদী বিনয়ী), বোধিসত্ত্ব (মহাযান) এবং বজ্রযান এই তিন শীলকেই তাঁরা ধারণ করে আছেন। যদিও কথাটা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। কারণ যার খুশী সে তিনটি কেন সহস্র শীলও ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরস্পর বিরোধী আলো এবং অন্ধকারের কি একই স্থানে বিরাজ করা সম্ভব? আলো এবং অন্ধকার দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার, ফলে একই সঙ্গে এবং একই স্থানে উভয়ের অবস্থান সম্ভব নয়, তেমনি বিনয় এবং বজ্রযান শীলের ন্যায় পরস্পর বিরোধী, দুই বা তিন শীল (মতবাদ) একজন মানুষ একই সঙ্গে

কখনই গ্রহণ করতে পারে না। যাই হোক, এগুলো হলো তিব্বতীদের কথা, আমরা ফিরে যাই আচার্য শান্তরক্ষিতের কাছে।

শান্তরক্ষিতের সময় নালন্দা মহাবিহারের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাত্র কিছুকাল আগে এখানে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-চাঙ অধ্যয়ন করে ফিরে গিয়েছেন। বজ্রযান কিম্বা তন্ত্রযানের তখন খুব প্রভাব। শান্তরক্ষিত গৃহত্যাগ করে আচার্য জ্ঞানগর্ভের নিকট থেকে মূল সর্বাস্তিবাদী বিনয় অনুসারে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা গ্রহণ করলেন ও শান্তরক্ষিত নাম গ্রহণ করেন। নালন্দায় গুরুর কাছেই তিনি ত্রিপিটকের আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করেন। এরপর তিনি বোধিসত্ত্ব মার্গীয় (মহাযানিক) গ্রন্থ অভিসময়ালঙ্কার ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্য আচার্য বিনয় সেনের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর কাছে মহাযান মার্গের বিস্তৃত এবং গম্ভীর এই দুই পর্যায়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি নাগার্জুনের (নাগার্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কোশলে [বর্তমান ছত্রিশগড়] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিরাট দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি ভারতীয় দর্শন, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক নূতন চিন্তার উন্মেষ ঘটান। মহাযান পন্থার প্রবর্তকও তিনি) মাধ্যমিক সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তী কালে তিনি এই বিষয়ের ওপর টীকা সহ 'কালঙ্কার' নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

আচার্য শান্তরক্ষিত যখন নালন্দায় ছিলেন, তখন সেখানে ই-চিঙ নামে জনৈক চৈনিক ভিক্ষুও অবস্থান করছিলেন। (কাশ্মীরী, পাঠান, নেপালী এবং তিব্বতের অধিবাসীরা আমাদের 'চ' শব্দটিকে 'স' এর মতো উচ্চারণ করে। যার ফলে চাংপো নদী সাংপো, হিউ-য়েন-চাঙ, হিউয়েন-সাঙ উচ্চারিত হয়)। যাই হোক সেই ই-চিঙ বা ই-সিঙ নামক চৈনিক ভিক্ষুর রচনার মধ্যে কিন্তু শান্তরক্ষিত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও তাঁর রচনার মধ্যে তৎকালীন যুগের অনেক ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। মনে হয় ভিক্ষু ই-চিঙ যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, শান্তরক্ষিতের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তখনও হয়ত পূর্ণ হয়নি। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে শান্তরক্ষিত নালন্দাতেই অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হরিভদ্র এবং কমলশীল উত্তরকালে যশস্বী লেখক হন। এঁদের বিভিন্ন গ্রন্থ মূল ভাষায় লুপ্ত হলেও ভোটীয় অনুবাদ রূপে তঞ্জুরে তাঁদের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য শান্তরক্ষিতও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র তত্ত্বসংগ্রহের ওপরে লিখিত গ্রন্থটি ছাড়া আর বাকী যা কিছু সংস্কৃত ভাষায় ছিল তা সবই বিনষ্ট হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। 'তত্ত্ব-সংগ্রহকারিকা' এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি' এই দু'খানা গ্রন্থ এখনও মূল সংস্কৃত ভাষাতে পাওয়া যায়, অন্য সমস্ত রচনাদির জন্য এখন আমাদের তিব্বতী অনুবাদই একমাত্র ভরসা।

ভারতবর্ষে থাকাকালীনই আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা

করেন। তিব্বত সম্রাট স্রোঙচেন-স্গেম-পো-এর পঞ্চম উত্তরাধিকারী ছিলেন খ্রি-স্রোঙ-ল্দে-বচন (টি-সোঙ-দে চোল, ৭১৯-৭৮০ খৃঃ.)। বালক বয়সেই তিনি তাঁর পিতা খ্রী-ল্দে-গ্চুঙ-বচন-এর মৃত্যুতে রাজ্য শাসনের ভারপ্রাপ্ত হন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকেই এ দেশের ধর্মাশোক বলা যায়। স্বভাবতই তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। সে সময় চীন এবং তিব্বত এই দুই রাজবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। অনেক চৈনিক বৌদ্ধভিক্ষু তখন লাসায় অধিষ্ঠান করতেন। কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যেও সম্রাটের ধর্ম পিপাসার তৃপ্তি হয়নি। তখন তিনি ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কোনো ভারতীয় আচার্যকে আনাবার ইচ্ছায় ভারতে দূত পাঠান। দূত প্রথমে বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) পৌঁছে, সম্রাটের পক্ষ থেকে মহাবোধির বেদীমূলে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে নালন্দায় উপস্থিত হলেন। নালন্দায় গিয়ে রাজদূত জানতে পারলেন, আচার্য শান্তরক্ষিত বিশেষ কার্যোপলক্ষে নেপালে গিয়েছেন। অতঃপর রাজদূতও নেপালে গিয়ে অবশেষে আচার্যের সামনে সম্রাটের পাঠানো উপহারসমূহ তাঁর পদপ্রান্তে রেখে, সম্রাটের প্রার্থনার কথা নিবেদন করলেন। আচার্য শান্তরক্ষিত সম্মত হওয়ায়, মহাসমারোহে তাঁকে রাজধানী লাসায় নিয়ে আসা হলো। তিব্বতের সামাজিক জীবনে আচার্য শান্তরক্ষিতের উপদেশাবলী যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়, বিশেষত তরুণ রাজা খুবই প্রভাবিত হন। কিন্তু রাজদরবারের কিছু পদস্থ আমলা এবং মুষ্টিমেয় কিছু লোক আচার্যদেবের এ হেন জনপ্রিয়তায় অসন্তুষ্ট হয়ে, সে সময় তিব্বতের কোনো কোনো স্থানে ব্যাধি, অজন্মা ইত্যাদির যে উপদ্রব শুরু হয়েছিল তা আচার্যদেবের শিক্ষার ফলে স্থানীয় দেবদেবীদের অসন্তুষ্টির জন্যেই ঘটছে বলে প্রচার করে। এই সমস্ত প্রচারে বিরক্ত হয়ে শান্তরক্ষিত নেপালে ফিরে এলেন।

আচার্যের নেপাল প্রস্থানের কিছুকাল পরেই চীনদেশের সঙ-শী প্রদেশ থেকে বেশ কিছু বৌদ্ধ পণ্ডিত এসে লাসায় বসবাস করতে থাকেন। সম্রাটের ওপর এই সব পণ্ডিতদের প্রভাব বেশ কিছুকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সে সময় রাজ দরবারেও এদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে রাজার আবার ভারতীয় মহাপণ্ডিতকে ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছে হলো। এইভাবে আচার্য শান্তরক্ষিত দ্বিতীয় দফায় আবার সম্রাটের আমন্ত্রণ পেয়ে ৭২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় লাসায় পদার্পণ করেন। তিব্বতী ঐতিহাসিকদের রচনানুসারে জানা যায় যে আচার্য শান্তরক্ষিত দ্বিতীয় দফায় এ দেশে এসে, এখানকার দেবদেবীদের যথেষ্ট ভয় পেতে থাকেন এবং উড়িষ্যার রাজবংশোদ্ভূত আচার্য পদ্মসম্ভবকে যথা সত্বর তিব্বতে নিয়ে আসবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করতে থাকেন। প্রবাদ আছে যে, পদ্মসম্ভবের জন্মও পরবর্তী যুগের ভক্ত কবীরের মতো এক পদ্মফুলের মধ্যে হয়েছিল। উড়িষ্যার বিখ্যাত বজ্রযান মতাবলম্বী রাজা ইন্দ্রমূর্তি ছিলেন পদ্মসম্ভবের পালক পিতা। মনে হয় পদ্মসম্ভব নামের জন্যই তাঁর জন্ম সম্পর্কে এ রকম একটি কাল্পনিক কাহিনীর প্রচলন হয়েছে।

কথিত আছে সহোরের রাজবংশে ইনি বিবাহ করেন এবং সেই সম্পর্ক ধরে পদ্মসম্ভব ছিলেন আচার্য শান্তরক্ষিতের ভগিনীপতি। তিব্বতীরা বিশ্বাস করে, আচার্য পদ্মসম্ভব অমর। আচার্য শান্তরক্ষিতের অনুরোধ মতো সম্রাট পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আসতে আমন্ত্রণ জানান। তিব্বতীরা বলে পদ্মসম্ভব এ দেশে এসেই নাকি তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের জোরে এ দেশের সমস্ত দেবদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, সর্পিণী-যক্ষিণী, ভূত-প্রেত, তাল-বেতাল সকলকে পরাস্ত করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। তারপর আচার্য শান্তরক্ষিত সম্রাটের সাহায্যে লাসা থেকে দু'দিনের পথ, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ব্যসম-য়স (সম-য়ে) বিহার নির্মাণের কাজ শুরু করেন (সময় অগ্নি-স্ত্রী-শশবর্ষ —আনুমানিক ৭২৭ খৃঃ.)। বিহার সম্পূর্ণ হতে প্রায় বারো বছর সময় লেগেছিল। ৭৩৮ খৃষ্টাব্দে বিহারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। সম-য়ে বিহারটি ভারতের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। এই বিহারের মধ্যে বারোটি অঙ্গন আছে। সম-য়ে বিহারই তিব্বতের প্রাচীনতম বিহার। বিহার নির্মাণের কাজ শেষ করা এবং বৌদ্ধধর্মের সম্যক প্রচার এই দুটো কাজই আচার্যদেব একই সঙ্গে খুবই সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর তিনি এ দেশের মানুষকে ভিক্ষুজীবনে দীক্ষা দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এ জন্য তিনি ভারতবর্ষ থেকে আরও বারো জন সর্বাস্তিবাদী পণ্ডিতকে তিব্বতে আনালেন এবং তাঁদের সহায়তায় জলমেষ বর্ষে (৭৬২ খৃঃ.) শেস-রঙ-পো (জ্ঞানেন্দ্র) প্রমুখ আরও সাত জনকে ভিক্ষু রূপে দীক্ষা দেন।

অতঃপর আচার্য শান্তরক্ষিত এবং তাঁর শিষ্যরা বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থকে তিব্বতী ভাষায় ভাষান্তরিত করার কাজ শুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে এক আধখানা তন্ত্র সম্পর্কিত বই ছাড়া অন্যগুলোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কথিত আছে, আচার্যদেব তাঁর নির্বাণের প্রাক্কালে প্রিয় শিষ্য এবং সম্রাট টি-সোঙকে বলেন যে, ভবিষ্যতে বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হলে তাঁর শিষ্য কমলশীলকে যেন এ দেশে ডেকে আনা হয়। কমলশীল এ দেশে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা করে দিতে সক্ষম হবেন। নির্বাণ কালে আচার্য শান্তরক্ষিতের বয়স হয়েছিল একশো বছর। এই সময়ে কোনো এক দুর্ঘটনায় তাঁরই নির্মিত বিহারে তাঁর যশস্বী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে (৭৫০ খৃঃ.)। তাঁর পবিত্র দেহাবশেষ আজও সম-য়ে বিহারের অভ্যন্তরে এক চৈত্যের মধ্যে রক্ষিত থেকে প্রমাণ দিচ্ছে সেই অতীতের এক জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতীয় আচার্যের সাহস, কর্তব্যবোধ আর অপূর্ব সংগঠনী ক্ষমতার। শান্তরক্ষিতের নির্বাণের পর তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ফলে গেলো। তিব্বতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হলো অন্তর্কলহ। সম্রাটও তাঁর প্রয়াত গুরুর উপদেশ অনুযায়ী ভারত থেকে আচার্য কমলশীলকে আনলেন। কমলশীল এ দেশে এসে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করে সমস্ত বিবাদের সমাধান করে দিলেন।

তিব্বতীরা আচার্য শান্তরক্ষিতকে তাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক রূপে স্বীকার করলেও তাঁর স্মৃতির প্রতি বিশেষ মর্যাদা দেখায় না বা স্মরণে কোনো উৎসব পালন করে না। অথচ সিংহলবাসীরা কিন্তু সে দেশে বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক রাজকুমার মহেন্দ্রর স্মৃতিতে আজও নানাবিধ উৎসব পালন করে থাকে। অবশ্য এই বৈপরীত্যের কারণ খুঁজতে বেশী দূর যাবার প্রয়োজন হয় না। তিব্বতে বুদ্ধের মধুর, হৃদয়গ্রাহী এবং মানুষের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করে, এমন উপদেশাবলীর মর্যাদা ততটা নেই, যতটা ভূত-প্রেত, যাদুমন্ত্রের আছে। যদিও আচার্য শান্তরক্ষিত নিজেও তন্ত্র সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তথাপি তার বিষয়বস্তু ছিল যথেষ্ট গম্ভীর এবং একান্তভাবেই দর্শনশাস্ত্র আশ্রিত, সুতরাং তাতে ভূত-প্রেত যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের আগ্রহের নিবৃত্তি ঘটেনি। মনে হয় পদ্মসম্ভব সেই আগ্রহের অনেকটাই মেটাতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর একান্ত অনুগামীরাও এ কাজে যথেষ্ট অগ্রণী ছিলেন। এই কারণেই কয়েকটি বড় বিহার বা গুম্ফা ছাড়া আর কোথাও আচার্য শান্তরক্ষিতের মূর্তি বা প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ গুরু রেম্পোছে বা লোবন রেম্পোছের (পদ্মসম্ভবের তিব্বতী নাম) মূর্তি বা প্রতিকৃতি এ দেশে ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম চারটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক। বৈভাষিকদের মূল দার্শনিক গ্রন্থের নাম 'জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্র'। এই গ্রন্থের রচনাকার হিসেবে কাত্যায়ণী পুত্রেরই নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ছটি ভাগে বিভক্ত। এ ছাড়াও একটি পরিপূরক গ্রন্থও আছে, সেটি হলো বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ-এর উত্তরে সঙ্ঘভদ্র কর্তৃক লিখিত 'ন্যায়ানুসার'। সৌত্রান্তিক-দের প্রধান গ্রন্থ বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ'। বৈভাষিক দর্শনের গ্রন্থ বর্তমানে আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, একমাত্র চীনা ভাষায় এই গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ গ্রন্থটি কিছু টীকা সম্বলিত অবস্থায় এখন তিব্বতী ভাষাতেও পাওয়া যায়। (বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ' গ্রন্থটিকে পুনরায় সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং সম্পাদনা করার দুরূহ কাজ লেখক নিজে সম্পন্ন করেন এবং আচার্য নরেন্দ্রদেবের কাশী বিদ্যাপীঠ সেটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই কারণে প্রাপ্ত অগ্রিম অর্থে লেখক তিব্বতে আসতে সক্ষম হন —অনুঃ)। যোগাচারিগণ বিজ্ঞানবাদী এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদী। যোগাচারের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন আচার্য বসুবন্ধুরই বড় ভাই আসাদ। তিনি পেশোয়ার বা পুরুষপুরের অধিবাসী। পণ্ডিত নাগার্জুন ছিলেন শূন্যবাদের প্রধান প্রবক্তা। শেষোক্ত এই দুই মতবাদ মহাযানের মধ্যে পড়ে। চীন-জাপানের বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের ঝোঁক এই যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদের দিকে, আর তিব্বতীরা অধিকতর শূন্যবাদে বিশ্বাসী। শূন্যবাদের সঙ্গে যেহেতু বজ্রযানের বহু ক্ষেত্রে মিল আছে সেই কারণেই এ দেশে এর

প্রচলন এত বেশী। আচার্য বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ' নামক বিরল গ্রন্থটিকে চীনা ভাষা থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন বেলজিয়াম নিবাসী বিখ্যাত প্রাচ্য-শাস্ত্র-বিশারদ ডঃ. বাজেল দিলায়ুসিন।

আচার্য শান্তরক্ষিত যদিও মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর 'মধ্যমালঙ্কার' নামক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তবুও তাঁকে বিজ্ঞানবাদীই বলা যায়। তিব্বতী ভাষায় লিখিত তাঁর গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহ' থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থখানি একটি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর নিজের কালের এবং তাঁর পূর্বসূরী দার্শনিকদের মতামত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে ৩,৬৪৬ শ্লোক ও ২৬টি অধ্যায় বা পরীক্ষায় ভাগ করা আছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন আচার্যেরই প্রিয় শিষ্য শ্রীকমলশীল। অধ্যায়গুলির ভাগ এ রকম :

১॥	প্রকৃতি পরীক্ষা	(অধ্যায়) (সাংখ্য মত খণ্ডন)
২॥	ঈশ্বর পরীক্ষা	(নৈয়ায়িক মত খণ্ডন —আবিদ্ধকর্ণ, প্রশস্তমতি, উদ্যোতকর প্রভৃতির মতবাদকে খণ্ডন)
৩॥	প্রকৃতি ঈশ্বর	(উভয় পরীক্ষা) (যোগ মত খণ্ডন)
৪॥	স্বাভাবিক জগৎবাদ	(পরীক্ষা)
৫॥	শব্দ-ব্রহ্ম পরীক্ষা	(বৈয়াকরণ মতবাদ খণ্ডন)
৬॥	পুরুষ পরীক্ষা	(উপনিষদ মত খণ্ডন)
৭॥	আত্ম পরীক্ষা	(বৈশেষিক-নৈয়ায়িক মত খণ্ডন —উদ্যোতকর, শঙ্কর স্বামী প্রভৃতির মতবাদের বিরোধিতা)
৮॥	স্থিরভাব পরীক্ষা	(অক্ষণিকবাদ খণ্ডন)
৯॥	কর্মফল সম্বন্ধ পরীক্ষা	(কুমারিল ভট্ট ইত্যাদির মতের বিরোধিতা)
১০॥	দ্রব্য-পদার্থ পরীক্ষা	(বৈশেষিক মতবাদের খণ্ডন)
১১॥	গুণ পদার্থ পরীক্ষা	ঐ
১২॥	কর্ম পদার্থ পরীক্ষা	ঐ
১৩॥	সামান্য পরীক্ষা	ঐ
১৪॥	বিশেষ পরীক্ষা	ঐ
১৫॥	সমবায় পরীক্ষা	ঐ
১৬॥	শব্দার্থ পরীক্ষা	(ভামহ, কুমারিল ভট্ট, উদ্যোতকর প্রভৃতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা)
১৭॥	প্রত্যক্ষ লক্ষণ পরীক্ষা	(সুমতি, কুমারিল ভট্টের মতবাদ খণ্ডন)
১৮॥	অনুমান পরীক্ষা	(বৈশেষিক, অবিবিক্ত —উদ্যোতকর, আবিদ্ধকরণ প্রভৃতির মতকে খণ্ডন)

১৯॥ প্রমাণান্ত পরীক্ষা
২০॥ স্যাদ্বাদ পরীক্ষা (জৈনমত খণ্ডন)
২১॥ ত্রৈকাল্য পরীক্ষা (বৌদ্ধাচার্য, বর্মত্রাত, ঘোষক, বুদ্ধদেব, বসুমিত্রের মতবাদের বিরোধিতা)
২২॥ লোকায়ত পরীক্ষা (চার্বাক দর্শনের বিরুদ্ধে)
২৩॥ বহিরর্থ পরীক্ষা (বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক মতবাদের বিরোধিতা)
২৪॥ শ্রুতি পরীক্ষা (মীমাংসা মত খণ্ডন এবং কুমারিল ভট্টের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান)
২৫॥ স্বতঃপ্রামাণ্য পরীক্ষা . ঐ
২৬॥ অতীন্দ্রিয়দর্শী পুরুষ পরীক্ষা ঐ

আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

তিব্বতের বিদ্যানুরাগী এবং ধর্মানুরাগী মানুষের কাছে আচার্য শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। আচার্য দীপঙ্কর তাঁর নিজের নামের চেয়ে এই দেশে 'অতিশা' (অতিশ) 'জোবো' (স্বামী) কিম্বা 'জোবো-জে' (স্বামী ভট্টারক) ইত্যাদি নামে অধিক পরিচিত। আচার্য শান্তরক্ষিত এবং আচার্য দীপঙ্কর উভয়েই সহোর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যদিও উভয়ের কালের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। বাঙালী বিদ্বজ্জনেরা দীপঙ্করকে বাঙলাদেশের মানুষ বলে থাকেন। 'বৌদ্ধগান এবং দোঁহা' নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙলা সাহিত্যকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নিয়ে যাবার জন্য ভুসুকু, জালন্ধরী, কান্হ, সরহ ইত্যাদি কবিদেরও বাঙালী আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। কান্হ, সরহ ইত্যাদি চুরাশী সিদ্ধরা হিন্দী ভাষারই প্রাচীন কবি। যেভাবে আমরা ঐ চুরাশী সিদ্ধদের মধ্যে গোরখনাথ ইত্যাদি সামান্য কয়েকজন ছাড়া আর সকলের নামই প্রায় বিস্মৃত হয়েছি, তেমনিভাবেই তাঁদের রচিত কবিতাগ্রন্থও হারিয়ে গেছে আমাদের পরম্পরা থেকে। এ বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল।

সহোরের ভৌগোলিক অবস্থান প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে নয় বিহারে। সহোর এবং বিক্রমশীলা বিহারের অবস্থিতি প্রায় একই জায়গায় ছিল। এখনও পর্যন্ত বিক্রমশীলা বিহারকে কেউ বাঙলাদেশে তুলে নিয়ে যেতে সাহসী হননি, অথচ তারই দক্ষিণে 'নাতিদূর' অবস্থিত নগরী কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হতে পারে! মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বিহার প্রদেশের সুলতান গঞ্জকেই প্রাচীন বিক্রমশীলা বিহারের সঠিক স্থান বলে নিশ্চয় করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করি। মুসলমান আমলের আগে বিক্রমশীলা অঞ্চল (ভাগলপুর জেলার দক্ষিণ অংশ) সহোর অথবা ভাগল নামে পরিচিত ছিল। সহোর

একটি মাণ্ডলিক বা সামন্ত রাজ্য ছিল, এর রাজধানী কহলগাঁও কিম্বা তার কাছাকাছি কোথাও ছিল। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কল্যাণশ্রী এ রাজ্যের শাসক ছিলেন। সে সময় সমস্ত বিহার এবং বঙ্গদেশে পাল-বংশের বিজয় পতাকা উড্ডীন ছিল। রাজা কল্যাণশ্রী ছিলেন পাল-বংশের অধীনস্থ এক সামন্ত নৃপতি বা মাণ্ডলিক। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল বিক্রমপুরী (ভাগলপুরী বা ভাগলপুর) এবং সহোর রাজপ্রাসাদটির নাম ছিল 'কাঞ্চনধ্বজ'। সেই প্রাসাদে রাণী প্রভাবতী দেবীর গর্ভে তিব্বতী জল-পুরুষ অশ্ববর্ষে (৯৮২ খৃঃ.) এক পুত্ররত্নের জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনিই ইতিহাসে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রাজা কল্যাণশ্রী-র পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ এবং শ্রীগর্ভ এই তিন পুত্রের মধ্যে দীপঙ্কর ছিলেন মধ্যম। তিন বছর বয়সে কুমারের লেখাপড়া শেখা শুরু হলো এবং এগার বছর বয়সের মধ্যেই তিনি হস্তলিপি, ব্যাকরণ, গণিত ইত্যাদি পাঠ সাঙ্গ করেন।

প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে কুমার চন্দ্রগর্ভ ভিক্ষু হয়ে নিশ্চিন্ত মনে লেখাপড়া করার সংকল্প করলেন। একদিন ভ্রমণকালে জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়ে গিয়ে শুনলেন, সেখানে এক কুটিরে মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিত জেতরি বাস করেন। জেতরি কুমার চন্দ্রগর্ভকে তাঁর কুটিরে প্রবেশ করতে দেখে প্রশ্ন করলেন —তুমি কে? কুমার বললেন —আমি এখানকার রাজপুত্র। কুমার চন্দ্রগর্ভের এই উত্তরের মধ্যে কিছুটা অহংকারের ভাব ছিল। উত্তর শুনে জেতরি বললেন —আমার কোনো রাজা নেই অতএব রাজপুত্র থাকারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমার কোনো প্রভু নেই, আমিও কারও প্রভু নই। তুমি রাজপুত্রই হও আর পৃথিবীর অধিপতিই হও তোমার কাছে আমার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং আমার কাছেও তোমার কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মহা বৈরাগী জেতরি সম্পর্কে অনেক কিছুই কুমারের আগে থেকে জানা ছিল, তার ওপর এ রকম উত্তর শুনে নিজের মনোভাবের জন্য লজ্জিত বোধ করলেন। অতঃপর বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন এবং প্রয়োজন হলে গৃহত্যাগ করতেও প্রস্তুত বলে জানালেন। জেতরি কুমারকে তখন নালন্দায় যেতে পরামর্শ দিলেন।

বৌদ্ধধর্মের বিধানানুযায়ী মা বাবার অনুমতি ছাড়া কেউ শ্রমণ বা ভিক্ষু হবার জন্য সংসার ত্যাগ করতে পারে না। কুমার চন্দ্রগর্ভ অতি কষ্টে অনুমতি নিয়ে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গে নালন্দার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। নালন্দা বিহারে প্রবেশের আগে সেখানকার রাজাকে দর্শন করতে গেলেন তাঁরা। নালন্দার রাজা সহোরের রাজকুমারকে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, তারপর বললেন —কুমার তোমার বাড়ির কাছেই তো বিক্রমশীলার মতো মহাবিহার ছিল, সেখানে না গিয়ে তুমি এতদূরে নালন্দার ছাত্র হতে চাইছ কেন? উত্তরে কুমার চন্দ্রগর্ভ নালন্দার বিশাল ব্যাপ্তি, প্রাচীনত্ব এবং সর্বোপরি ঐতিহ্যের কথা বলে রাজাকে সন্তুষ্ট করলেন। নালন্দারাজ কুমারের জন্য বিহারের মধ্যে সুন্দর আবাসের বন্দোবস্ত

করে দিলেন। কুড়ি বছর বয়সের আগে ভিক্ষু হওয়া যায় না, কিন্তু কুমার সে সময়ে বারো বছর বয়সের বালক মাত্র। সে জন্য আচার্য বোধিভদ্র কুমারকে বৌদ্ধ নিয়মানুযায়ী শ্রমণ রূপে দীক্ষা দিলেন। কুমার চন্দ্রগর্ভ দীক্ষান্তে হলুদ বস্ত্র পরিধান করলেন এবং তখন থেকে তাঁর নাম হলো দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

সে সময় আচার্য বোধিভদ্রের গুরুদেব অবধূতীপাদ (মতান্তরে অদ্ধয়বজ্র বা অবধূতীপা বা মৈত্রী গুপ্ত বা মৈত্রীপা) রাজগৃহের কালশিলার দক্ষিণ প্রান্তে নির্জন বাস করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত পুরুষ এবং সিদ্ধ যোগী। আচার্য বোধিভদ্র তাঁর নূতন দীক্ষিত শ্রমণ দীপঙ্করকে অবধূতীপাদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য সেখানেইদীপঙ্করকে রেখে এলেন। বারো বছর থেকে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত দীপঙ্কর অবধূতীপাদের কাছে থেকে সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন

দীপঙ্করের বয়স যখন আঠার, তখন তাঁর বাসনা হলো, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করবেন। সে জন্য তিনি সেই সময়ের বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের পণ্ডিত, চুরাশী সিদ্ধের অন্যতম এবং বিক্রমশীলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপণ্ডিত নারোপা-র (নাড়পাদ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছেই শিক্ষালাভ করলেন। দীপঙ্কর ব্যতীত প্রজ্ঞারক্ষিত, কনকশ্রী এবং মণকশ্রীও (মানিকাশ্রী) নারোপা-র শিষ্য ছিলেন। এ ছাড়া তিব্বতের মহাজ্ঞানী এবং কবি জে-চুন-মিলারে-পা-র গুরু মরবা-লোচবাও ছিলেন নারোপা-র শিষ্যদের অন্যতম।

ঐ সময় বুদ্ধগয়ার মহাবিহারেও একজন ভিক্ষু বাস করতেন। তাঁর নাম নিশ্চয়ই কিছু ছিল, কিন্তু বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) বাস করার জন্য লোকে তাঁকে বজ্রাসনীয় (দোর্জে-দন-পা) নামেই জানত। নারোপা-র কাছে শিক্ষা সমাপনান্তে দীপঙ্কর বুদ্ধগয়ার মতিবিহার নিবাসী মহাস্থবির, মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের কাছে গিয়ে তাঁকে গুরু করে উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) গ্রহণ করলেন।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সেই দীপঙ্কর তন্ত্রশাস্ত্রের একজন অগ্রণী পণ্ডিত হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত না হওয়ায় তিনি ঠিক করলেন সুবর্ণদ্বীপে (সুমাত্রা) যাবেন। সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মপালের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। মহাপণ্ডিত রত্নাকর শান্তি (শান্তি-পা চুরাশী সিদ্ধদের অন্যতম), জ্ঞানশ্রী মিত্র, রত্নকীর্তি প্রভৃতি সে যুগের খ্যাতিমান বিদ্বজ্জনেরাও ছিলেন আচার্য ধর্মপালের ছাত্র। শিষ্যবর্গের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিই গুরু ধর্মপালকে এ দেশের জ্ঞানপিপাসুদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল। দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপে গিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করবেন বলে স্থির করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বুদ্ধগয়া ত্যাগ করে সমুদ্রপথে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে চৌদ্দমাস পরে সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছালেন।

কিন্তু সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছালেও দীপঙ্করের সমস্যার সমাধান হলো না। আচার্য ধর্মপালের কাছে পৌঁছানোই মুস্কিল, তারপরে তো অধ্যয়নের কথা। দীপঙ্কর প্রথমে ধর্মপালের সঙ্গে সাক্ষাতের বৃথা চেষ্টা না করে এক বছর একান্ত বাস করেই

কাটালেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় কিছু ভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো এবং তাঁরাও ওঁর কাছে মাঝে-মধ্যে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সেই ভিক্ষুদের মাধ্যমে দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এ রকমভাবে একদিন তাঁর কথা আচার্য ধর্মপালের কানেও উঠল। অবশেষে দীপঙ্করের মনোবাসনা পূর্ণ হলো, তিনি আচার্যের ছাত্রদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হলেন। সুবর্ণদ্বীপে দীপঙ্কর বারো বছর ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর আচার্যের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ নেন। তবে দর্শনশাস্ত্রেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। 'অভিসময়ালঙ্কার', 'বোধিচর্যাবতার' প্রভৃতি ছাড়া আরও বহু মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে, দীপঙ্কর রত্নদ্বীপ প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ ঘুরে অবশেষে স্বদেশে ফিরে এলেন। ভারতে ফিরে তিনি বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বহুমুখী জ্ঞানের জন্য বিক্রমশীলা বিহারের একান্ন জন পণ্ডিতের ওপরে তাঁর স্থান নির্ধারিত হলো এবং সর্বোপরি তিনি একশো আটটি দেবালয়েরও ভার পেলেন। দীপঙ্করের আচার্যগণের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের দিক্‌পাল পণ্ডিত ডোম্বীও ছিলেন একজন। এ ছাড়া ভূতিকোটিপাদ, প্রজ্ঞাভদ্র, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি আচার্যের কাছেও দীপঙ্কর বিভিন্ন সময়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। দীপঙ্করের গুরু অবধূতীপাদ ছিলেন সিদ্ধাচার্য ডমরুপা-র শিষ্য। আবার গুরু ডমরুপা ছিলেন সিদ্ধ জ্ঞানী এবং কবি কান্‌হপা ও তাঁর গুরু জালন্ধরীপা উভয়েই ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত চুরাশীজন সিদ্ধপুরুষের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কান্‌হপা-র আর একটি পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন তখনকার আমলের হিন্দী ভাষার বড় একজন ছায়াবাদী (সাংখ্যবাদী) কবি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের যেমন মর্যাদার আসন, তেমনই মর্যাদা এবং খ্যাতির অধিকারী ছিলেন পাল-বংশের সম্রাট ধর্মপাল। গঙ্গার তীরে ছোট একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহার তিনিই নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী নৃপতির আনুকূল্য থাকায় এই বিহার অল্পদিনেই বিশাল রূপ ধারণ করে। নালন্দা মহাবিহারের মতো তাকে দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে খ্যাতির সোপান অতিক্রম করতে হয়নি। বিক্রমশীলাতে তখন আট জন মহাপণ্ডিত ও একশো আট জন পণ্ডিত এবং বহু দেশী-বিদেশী ছাত্র ছিল। দীপঙ্করের সময়ে বিক্রমশীলা বিহারে সংঘস্থবিরের পদে ছিলেন রত্নাকর শান্তি। আট জন মহা-পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন —শান্তিভদ্র, রত্নাকর শান্তি, মৈত্রীপা ডোম্বীপা, স্থবিরভদ্র, স্মৃত্যকার সিদ্ধ (কাশ্মীরী) ও অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ। বিহারের একেবারে মাঝখানে একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি স্থাপিত ছিল। আর সেই মন্দিরকে বেষ্টন করে আরও তিপ্পান্নটি ছোট বড় তান্ত্রিক দেবালয় ছিল। যদিও সে সময় নালন্দা, ওদন্ত-পুরী এবং বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) এই তিন জায়গায় আরও তিনটি প্রাচীন বিহার বর্তমান ছিল, তবু বিক্রমশীলা বিহারটিই পাল রাজবংশের বিশেষ কৃপাদৃষ্টির কেন্দ্র

ছিল। সেই ঘোর তান্ত্রিক যুগে এই বিহারটি তন্ত্রমন্ত্রের বেশ বড় গোছের আখড়া হয়ে উঠেছিল। চুরাশী সিদ্ধের প্রায় সকলেই পাল-বংশের রাজত্বকালে উদ্ভূত এবং তাঁদের অধিকাংশই এই বিহারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিব্বতী লেখকদের মতে এখানকার সিদ্ধপুরুষেরা তাঁদের বশীভূত দেবতা এবং যক্ষের সাহায্যে তুর্কী হামলা-বাজদের বহুবার এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিব্বত সম্রাট স্রোং-চন-গম্বো ও ঠি-স্রোং-ল্দে-চন এবং তাঁদের উত্তরপুরুষেরা প্রায় সকলেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম যাতে প্রসার লাভ করতে পারে, সে জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে সম্রাট ঠি-কি-দে-জীমা-গোন লাসার পরিবর্তে ঙংরী প্রদেশে (মানসসরোবর থেকে লাদাখের সীমানা পর্যন্ত অঞ্চল) রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। তাঁর পৌত্র সম্রাট মং-ছ-খোরে-হুয়া নিজের দুই পুত্র দেবরাজ এবং নাগরাজ সহ ভিক্ষু হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র ল্হ-লামা-য়েশো-র অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এ সমস্ত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ঘটনা। সম্রাট য়েশো লক্ষ্য করেছিলেন যে, নানা কারণে তাঁর প্রজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যদি এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করতে না পারেন, তা'হলে তাঁর পূর্বপুরুষেরা বৌদ্ধধর্মের যে আলোকশিখা জ্বালিয়েছেন তা নিভে যাবে। এ সমস্ত চিন্তা করে সম্রাট য়েশো, রত্নভদ্র (রিন-ছেন-সঙ-পো পরবর্তী কালে লো-ছন-রিম্পোছে) ইত্যাদি একুশ জন বালককে দশ বছর নিজের দেশে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য কাশ্মীরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তারা আচার্য রত্নবজ্রের কাছে অধ্যয়ন করতে থাকে। কিন্তু ঐ একুশ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র দু'জন ছাত্র রত্নভদ্র এবং সুপ্রজ্ঞই (লেগ-প-শো-রব) কোনোক্রমে জীবিত অবস্থায় দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ব্যাপার দেখে সম্রাট য়েশো খুব নিরাশ হয়ে পড়লেও একেবারে হাল ছেড়ে দেননি। তিনি ভাবলেন, যখন ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তিব্বতীদের বেঁচে থাকা মুস্কিল, তখন ভারত থেকে কোনো উপযুক্ত শিক্ষককে আনাই শ্রেয়। সে সময় সম্রাট কোনোভাবে জানতে পারেন যে, ভারতের বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যাপক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানই হচ্ছেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যাঁকে তিব্বতে নিয়ে এলে এ দেশে ধর্মের স্রোতকে আবার ফেরানো দুরূহ হবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন দূতকে প্রচুর স্বর্ণ দিয়ে বিক্রমশীলায় পাঠালেন। দূতেরা আচার্যের সামনে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের অভিপ্রায় জানান, কিন্তু দীপঙ্কর সবিনয়ে সম্রাটের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট য়েশো কিন্তু এতেও নিরাশ হলেন না, তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন যে আরও বেশী সোনা উপহার দিয়ে যদি অন্য কোনো শাস্ত্রীয় পণ্ডিতকে ভারত থেকে আনাতে পারেন। সে সময় সম্রাটের ভাণ্ডারে যথেষ্ট সোনা মজুত ছিল না, সে জন্য

তিনি সোনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু লোকবল নিয়ে নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে গেলেন। সেখানে সম্রাটের প্রতিবেশী গরলোগ অঞ্চলের অধিপতি তাঁর লোকবলের স্বল্পতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বন্দী করলেন। পিতা বন্দী হয়েছেন শুনে লহা-লামা-চং-ছুপ-ও (বোধিপ্রভ) তাঁর মুক্তির উপায় খুঁজতে গরলোগ গেলেন। কথিত আছে তখন নাকি গরলোগ-রাজ সম্রাট য়েশো-র মুক্তিপণ হিসেবে প্রচুর সোনা দাবি করেন। রাজভাণ্ডারে যে পরিমাণ সোনা মজুত ছিল, গরলোগ রাজের দাবি ছিল তার চেয়েও কিছু বেশী। অতএব যুবরাজ চং-ছুপ আরও সোনা কিভাবে সংগ্রহ করা যায় তার উপায় ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তার আগে তিনি একবার কারাগারে তাঁর বন্দী পিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। শুনে বন্দী সম্রাট য়েশো পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে নিষেধ করে বললেন —আমি বৃদ্ধ হয়েছি, বড় জোর আর দশ বছর বাঁচব, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করতে যদি রাজকোষ শূন্য হয়, তবে ভারত থেকে কোনো পণ্ডিতকে এ দেশে আনা সম্ভব হবে না এবং ধর্মেরও সংস্কার হবে না। তার চেয়ে ধর্মের উন্নতির জন্য আমাকে যদি গরলোগের কারাগারে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাও শ্রেয়। বরং তুমি আমার বন্দীত্বের কথা ভুলে গিয়ে সংগৃহীত সোনার বিনিময়ে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা কর। তা'ছাড়া এ রাজাকেই বা বিশ্বাস কি, সে যদি মুক্তিপণ নিয়ে পরে আমাকে মুক্তি না দেয় ? তাই পিতা হিসাবে তোমার কাছে শেষ অনুরোধ —তুমি কালবিলম্ব না করে আবার অতিশার (দীপঙ্কর) কাছেই লোক পাঠাও। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের অবস্থা এবং আমার এই বন্দীত্ব ইত্যাদি সব কিছু তাঁকে সম্যকভাবে বোঝাতে পারলে তিনি নিশ্চয় এ দেশে আসতে রাজী হবেন। যদি কোনো কারণে অতিশাকে একান্তই না পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় কোনো পণ্ডিতের সন্ধান করবে। আমার জন্য কোনো চিন্তা কর না, ভগবান তথাগতের যা ইচ্ছা তাই হবে।

এরপর সম্রাট য়েশো পুত্রকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। যুবরাজ চং-ছুপ সজল নয়নে বন্দী পিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

চং-ছুপ রাজ্যভার গ্রহণ করেই ভারতবর্ষে পাঠাবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। উপাসক গুং-থং-পা, এর আগে বছর দু'য়েক ভারতবর্ষে কাটিয়ে এসেছিলেন। নবীন সম্রাট তাঁকেই এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। গুং-থং-পা তাঁর সঙ্গী হিসেবে নম-ছো নিবাসী ভিক্ষু ছুল-ঠিম-গ্যল-বা (শীলবিজয়) এবং আরও কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে নেপালের পথ ধরে একদিন বিক্রমশীলা (ডোম-তোন রচিত গুরু গুণ-ধর্মাকর ; পৃষ্ঠা ৭৭-এ এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়) বিহারের কাছে পৌছালেন। যে সময় তাঁরা বিক্রমশীলা বিহারের বিপরীত দিকে গঙ্গার অপর তীরে এসে উপস্থিত হলেন, তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। ঘাটে নৌকায় যাত্রী বোঝাই থাকায় তিব্বতী যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হলো না। নৌকার মাঝি ফিরে এসে তাঁদের ওপারে নিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৌকা ছেড়ে

দিলো। নদীর তীর থেকেই ওপারে বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রাচীর, দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল এবং তা দেখতে পেয়েই তিব্বতীরা তাঁদের এত দিনের পথকষ্টের কথা সবই প্রায় ভুলে গেলেন। নৌকার ফিরতে দেরী হচ্ছিল দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ হলো, মাঝি আর বোধ হয় সে দিন ফিরবে না। নির্জন নদীতীরে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণরাজি নিয়ে ভয় হতে লাগল। সুতরাং তাঁরা বালুকাময় প্রান্তরে সমস্ত স্বর্ণ লুকিয়ে রেখে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, এমন সময় মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরে এল। তিব্বতীরা মাঝিকে তাঁদের সন্দেহের কথা বলায় সে বলল —আপনাদের ঘাটে ফেলে রাজাজ্ঞা অমান্য করে কি করে চলে যেতে পারি? নৌকায় মাঝিদের কাছেই তাঁরা জানতে পারলেন যে, বিহারের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখস্থ ধর্মশালায় তাঁরা রাত্রিবাস করতে পারেন। তিব্বতী যাত্রীরা মাঝিদের পরামর্শ অনুযায়ী ধর্মশালাতেই এসে আশ্রয় নিলেন এবং রাত্রিবাসের জন্য ব্যবস্থাদি করতে করতে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপও করছিলেন। এমন সময় বিহারের পশ্চিম দ্বারের ঠিক ওপরের ঘরে তিব্বতী ভিক্ষু গ্য-চোন-সেঙ তাঁদের কথাবার্তা শুনে স্বদেশবাসী বুঝতে পেরে, তাঁদের এখানে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। কথাবার্তায় তাঁরা অতিশাকে তিব্বতে নিয়ে যেতে এসেছেন শুনে ভিক্ষু গ্য-চোন পরামর্শ দিলেন যে, তাঁরা যেন প্রথমে শিক্ষার্থী রূপে বিহারে প্রবেশ করেন। কেন না তাঁদের উদ্দেশ্য এখনই যদি কেউ জেনে ফেলে তা'হলে অতিশাকে নিয়ে যাওয়া দুরূহ হবে। তিনি আরও বললেন যে, পরে সুযোগ বুঝে তিনি তিব্বতী দূতের সঙ্গে অতিশা-র সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন।

ভিক্ষু গ্য-চোন-এর নির্দেশানুযায়ী তিব্বতীরা শিক্ষার্থী রূপে বিক্রমশীলা বিহারে স্থান লাভ করার কিছু কালের মধ্যেই সেখানে সমস্ত পণ্ডিতদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ভিক্ষু গ্য-চোন তাঁর দেশবাসী সতীর্থদের সেখানে সমবেত সমস্ত পণ্ডিতকে দর্শন করিয়ে দিলেন। তিব্বতী ছাত্ররাও লক্ষ্য করলেন যে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য দীপঙ্করের স্থান কত উঁচুতে। এরপর একদিন সুযোগ-মতো গ্য-চোনের সহায়তায় তাঁরা দীপঙ্করের সামনে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তাঁরা সেই মহাপ্রাজ্ঞ আচার্যকে প্রণাম জানালেন, তারপর তাঁর পদপ্রান্তে সঙ্গে আনীত সমস্ত সোনা নিবেদন করে নিজেদের এ দেশে আসার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁরা তিব্বত সম্রাট য়েশো-র বন্দী হওয়ার কাহিনী এবং তাঁর শেষ ইচ্ছার কথাও আচার্য দীপঙ্করকে জানালেন। সমস্ত কিছু শুনে দীপঙ্কর অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—নিঃসন্দেহে রাজা য়েশো বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পুরণ করব না এমন কথা আমি ভাবতেও পারছি না, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমার ওপর একশো আটটি দেবালয়ের ভার ছাড়া আরও অনেক দায়িত্বভার ন্যস্ত আছে। এই সমস্ত কিছুর যথোপযুক্ত কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে আমি কিভাবে যেতে পারি? এ সমস্ত কিছুর

ব্যবস্থা করতে আমার মাস আঠার সময় লাগবে, তারপর আমার যেতে কোনো বাধা থাকবে না। এখন এই সমস্ত সোনা তোমাদের কাছেই থাক।

তিব্বতীরা অতঃপর অধ্যয়নের অছিলায় বিহারেই থেকে গেলেন। আচার্য দীপঙ্করও তাঁর প্রতিশ্রুতি-মতো বিহারের কাজের দায়িত্বভার একে একে হাল্কা করতে লাগলেন। তারপর একদিন সঙ্ঘস্থবির রত্নাকরপাদকে সব কিছু জানালেন। রত্নাকর কিন্তু এত সহজে দীপঙ্করকে ছেড়ে দেবার পক্ষে মত দিতে পারলেন না। একদিন তিনি তিব্বতীদের ডেকে বললেন —আয়ুষ্মান! যদিও আপনারা বিদ্যার্থী পরিচয়ে এখানে এসেছেন এবং বাস করছেন, কিন্তু আপনাদের এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য নাকি অতিশাকে আমাদের কাছ থেকে আপনাদের দেশে নিয়ে যাওয়া। আপনারা হয়ং জানেন না যে আচার্য দীপঙ্কর শুধুমাত্র বিক্রমশীলা মহাবিহারের নয়, সমস্ত দেশের মানুষের নয়নের মণি। তা'ছাড়া দেখছেন না পশ্চিমে তুরস্ক বাহিনী বার বার আমাদের দেশের সীমান্ত আক্রমণ করছে, এ সময় দীপঙ্কর এ দেশ ছেড়ে চলে গেলে ভগবান তাথাগতের ধর্মসূর্যও অস্তমিত হবে। (এই সময়ে গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়েছে এবং মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংঘাত চলছিল)।

অনেক সাধ্যসাধনা করে সঙ্ঘস্থবিরের অনুমতি পাওয়া গেলো। দীপঙ্কর তিব্বতীদের এ বার সোনা আনতে বললেন। সোনা আনা হলে, দীপঙ্কর সমস্ত সোনা চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ রইল পণ্ডিতদের সম্মান-দক্ষিণার জন্য, এক ভাগ বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) নিত্য পূজার জন্য, তৃতীয় ভাগ বিক্রমশীলা বিহারের জন্য রত্নাকরপাদের হাতে এবং অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ লৌকিক ও ধার্মিক কাজকর্মের জন্য রাজাকে দিলেন। এরপর তিনি নিজের কয়েকজন অনুগামী এবং পুঁথিপত্র তিব্বতীদের সঙ্গে নেপালে পাঠিয়ে দিলেন। পরে নিজে লোচ্‌বা (দোভাষী) সহ বারো জন সহযাত্রী নিয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে যাত্রা করলেন। বুদ্ধগয়া এবং তার আশপাশের তীর্থস্থান সমূহ দর্শন শেষ করে পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ প্রমুখ আঠার জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশা ভারত সীমান্তের কাছে ছোট একটি বিহারে এসে উঠলেন। (আচার্যের শিষ্য ডোম-তোন তাঁর গুরু-গুণ ধর্মাকর বইয়ে লিখেছেন —আচার্য দীপঙ্কর যখন তিব্বত যাত্রা করেন, তখন এ দেশে (ভারতে) বৌদ্ধ শাসন প্রায় অস্তাচলগামী)। সীমান্তের কাছে আচার্য তিনটি অনাথ কুকুরের বাচ্চা দেখতে পান। সেগুলোকে দেখে সেই ষাট বছর বয়সের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত কেমন যেন আবেগাপ্লুত হয়ে মাতৃভূমির চিহ্নস্বরূপ আপন চীবরে সেগুলোকে তুলে নিলেন। কথিত আছে ওই কুকুরের প্রজাতি আজও তিব্বতের ডাঙ প্রদেশে বিরাজ করছে।

ভারতসীমা পার হয়ে অতিশা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নেপালে প্রবেশ করলেন এবং সে দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। নেপালের রাজা পরম

সমাদরে এবং প্রচুর সম্মানের সঙ্গে এই মহান্ অতিথিকে স্বাগত জানালেন এবং আচার্য দীপঙ্করকে নেপালে থাকবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। রাজার আগ্রহ লক্ষ্য করে দীপঙ্কর এক বছর কাল সে দেশে রইলেন। সেখানে দীপঙ্কর ধর্ম শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও একজন রাজপুত্রকে ভিক্ষু-দীক্ষা দিয়েছিলেন। নেপাল থেকে তিনি তৎকালীন গৌড়াধিপতি পাল-বংশের রাজা নয়পালকে এক পত্রও লিখেছিলেন যার অনুবাদ আজও তিব্বতে তঞ্জুরের মধ্যে পাওয়া যায়। নেপাল থেকে অগ্রসর হয়ে দীপঙ্কর তাঁর অনুগামী সহ এসে উঠলেন থুঙ্ বিহারে। এখানে এসে তাঁরা আটকা পড়ে গেলেন কারণ সঙ্গী ভিক্ষু গ্য-চোন-সেঙ এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো গেলো না। গ্য-চোন শুধুমাত্র একজন নামকরা পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি উঁচু স্তরের দোভাষীও ছিলেন। আচার্য দীপঙ্করের বড় প্রিয় ছিলেন গ্য-চোন। তাঁর মৃত্যুতে দীপঙ্কর খুবই ভেঙে পড়লেন। নিরাশ হয়ে তিনি বললেন —এখন আমার তিব্বত যাওয়া বৃথা, কারণ দোভাষী ছাড়া সে দেশে গিয়ে কি করব? শীলবিজয় এবং আরও কয়েকজন অনুগামী শিষ্য তাঁকে দোভাষীর জন্য কোনো অসুবিধাই হবে না ইত্যাদি বলে আশ্বস্ত করলেন।

বৃদ্ধ আচার্যের পথকষ্ট নিবারণের জন্য তিব্বত-রাজ চং-ছুপও নিজ রাজ্যে ভালো রকমের ব্যবস্থাদি রেখে ছিলেন। তিব্বতের সাধারণ মানুষও এই মহান্ ভারতীয় আচার্যকে দর্শনেচ্ছায় উন্মুখ হয়েছিল। চলার পথের দু'ধারের জনপদবাসীদের ধর্মপথ ব্যাখ্যা করতে করতে আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতী জল-পুরুষ অশ্ব বর্ষে (চিত্রভানু সম্বৎসর, ১০৪২ খৃঃ.) তিব্বতের পশ্চিম প্রান্তের ঙংরী প্রদেশে পৌঁছালেন। তখন তাঁর বয়স একষট্টি বছর। রাজধানী থোলিং পৌঁছাবার আগেই রাজা নিজে এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। অত্যন্ত সমাদরে এবং সমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো থোলিং বিহারে। এই বিহারে আচার্য দীপঙ্কর প্রায় একমাস কাটালেন। এ সময় তিনি ধর্মোপদেশ বিতরণ করা ছাড়াও কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা এবং কিছু অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বোধিপথপ্রদীপ' এই থোলিং বিহারে বসেই লেখা।

তিন বছর দীপঙ্কর ঙংরী প্রদেশে ছিলেন। এই তিন বছরে বহু অমূল্য গ্রন্থাদি রচনার কাজ তিনি সমাপ্ত করেন। তিব্বতী কাষ্ঠ-পুরুষ বানর বর্ষে (হেমলম্ব, ১০৪৪ খৃঃ.) তিনি পুরঙ-এ উপস্থিত হন। এখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রিয় গৃহস্থ শিষ্য ডোম-তোন-এর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকে আচার্যের নির্বাণ কাল পর্যন্ত ডোম-তোন তাঁর গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ করেননি এবং দীপঙ্করের মহাপ্রয়াণের পর ডোম-তোন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুরু-গুণ ধর্মাকর' রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অতিশার (দীপঙ্করের) পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত পাওয়া যায়। তিব্বতে আচার্য কিন্তু কখনই কোথাও স্থায়ী ভাবে বাস করেননি, সততই বিচরণশীল ছিলেন বলা যায়। কিন্তু

তাঁর এই অবস্থার মধ্যেও গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদের কাজ কখনো থেমে থাকেনি। অগ্নি-পুরুষ শুকর বর্ষে (সর্বজিৎ, ১০৪৭ খৃঃ.) তিনি সম-য়ে বিহারে এবং লৌহ-পুরুষ ব্যাঘ্র বর্ষে (বিকৃত, ১০৫০ খৃঃ.) বে-এর-বাতে গেলেন। মোট চৌদ্দ বছর দীপঙ্কর তিব্বতে ছিলেন। ক্রম-পুরুষ অশ্ব বর্ষে (জয়, ১০৫৪ খৃঃ.) কার্তিক-অঘ্রান মাসে ঢে-থঙ-এর তারা মন্দিরে তিয়াত্তর বছর বয়সে আচার্য দীপঙ্করের মহাপ্রয়াণ ঘটে। প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন তখনও তাঁর কাছেই ছিলেন। ২৫শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে, লাসা থেকে ফেরার পথে আমি এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করে ধন্য বোধ করি। দীপঙ্করের তিরোধানের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই মন্দিরটির তেমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন সাধন হয়নি। মন্দিরের অভ্যন্তরে বিশাল রক্তচন্দনের স্তম্ভ সে দিনের স্মৃতিসম্ভার নিয়ে আজও বর্তমান রয়েছে। এখনও ঐ মন্দিরে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, ধর্মকারক (কমণ্ডলু) দণ্ড, ইত্যাদি রাজমুদ্রা-অঙ্কিত একটি স্থানে সুরক্ষিত থেকে অতীত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়কে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান তিব্বতের চারটি ধর্মীয় গোষ্ঠীই কিন্তু আচার্য দীপঙ্করকে তাঁদের পরম পূজনীয় জ্ঞান করে। দীপঙ্করের মহানির্বাণের পর তাঁর গৃহস্থ শিষ্য ডোম-তোনের নেতৃত্বে এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ও পরবর্তী কালে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হন চোঙ-খ-পা। এই চোঙ-খ-পা-র অনুগামী হলুদ টুপীধারী লামারাই বর্তমান তিব্বতের রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। এরা নিজেদের অতিশার শিষ্য এবং তাঁর উত্তরাধীকারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

আচার্য দীপঙ্করের বহু রচনা যা তাঁর মাতৃভাষায় কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় ছিল, তার সমস্ত কিছুই বর্তমানে অবলুপ্ত ; কিন্তু তাঁর বহু গ্রন্থের অনুবাদ আজও তিব্বতে দেখতে পাওয়া যায়। দীপঙ্কর তাঁর চৌদ্দ বছরের প্রবাস-জীবনে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ছিল সত্তরেরও কিছু বেশী। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই লোচবাদের (দোভাষীদের) সাহায্যে অনূদিত হয়েছিল। এখনও এগুলির অধিকাংশই কঞ্জুর এবং তঞ্জুর নামক দুটি সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

তিব্বতের শিক্ষাব্যবস্থা

বহুকাল ধরে এ দেশের জনজীবনে দুটো ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। একটি গৃহী অপরটি ভিক্ষু। তিব্বতের শিক্ষাব্যবস্থাও এই দুই ধারার মধ্যে সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে। ভিক্ষুদের শিক্ষাদানের জন্য হাজার খানেকেরও বেশী ছোট-বড় মঠ বা বিদ্যালয় আছে। কখনও কখনও গৃহী ছাত্ররাও ব্যাকরণ, সাহিত্য, চিকিৎসা-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অবশ্য এ

ব্যবস্থার সুযোগ মুষ্টিমেয় ধনী এবং অভিজাত বংশের ছাত্ররাই শুধু নিতে পারে। তবে অনেক ভিক্ষু লেখাপড়া শেষ করে আবার গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসে। তখন তার অধীত বিদ্যার সুফল গৃহস্থ লোকেরাও কিছু কিছু ভোগ করার সুযোগ পায়। মঠে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুরা আবার কখনও কখনও কোনো গৃহস্থের বাড়িতে ছেলেদের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়। কিন্তু দেশের বড় বড় বিহারগুলো, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে ধনী-দরিদ্র বা অভিজাত, কোনো গৃহী ছাত্রেরই প্রবেশাধিকার নেই। এ দেশকে প্রধানত ভিক্ষুদের দেশ বলা চলে। ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রধানগণ এবং বড় বড় মঠের আচার্যরাই এ দেশ পরিচালনা করেন। তা'ছাড়া দেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ গৃহত্যাগী ভিক্ষু-জীবন যাপন করে। এ দেশে এমন কোনো গ্রাম নেই যে, দু'একজন ভিক্ষু এবং গ্রামের প্রান্তসীমায় পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটি ছোট মঠ বা বিহার দেখা যাবে না। যে সব ছেলেরা ভিক্ষু হতে ইচ্ছুক, আট থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যেই তাদের মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবতারী লামাদের (প্রসিদ্ধ কোনো ধর্মগুরু বা বোধিসত্ত্বের অবতার রূপে লোকে যাদের মান্য করে) অবশ্য এর চেয়েও কম বয়সে মঠের বাসিন্দা হতে হয়। ছোট ছোট মঠে গুরুর কাছে ভিক্ষু হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটে। প্রথম থেকেই সুন্দর হাতের লেখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ছাত্ররা দাঁড়ি এবং দাঁড়িবিহীন (উচেন এবং উমেদ) এই দুই প্রক্রিয়াতেই হাতের লেখা অভ্যাস করে। যেহেতু পাঠ্য বিষয়ের প্রথমেই থাকে হাতের লেখার উৎকর্ষতা সাধন, তাই এ দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই হাতের লেখা সুন্দর। পড়ার বিষয়টি আলাদা। ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় এবং ধর্ম বিষয়ক যা কিছু পাঠ তা সবই শ্লোকবদ্ধ। সে জন্য পড়া অর্থে শ্লোক মুখস্থ করা এবং তার অর্থ বুঝে হৃদয়ঙ্গম করাটাই প্রধান বলে বিবেচিত হয়। শ্লোকবদ্ধ পাঠ্যবস্তু মনে রাখতেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। সাধারণ গণনার অতিরিক্ত উচ্চ কোনো গণিত শিক্ষার প্রচলন এখানে নেই। যে সমস্ত ছাত্র জ্যোতির্বিদ্যা কিম্বা ভবিষ্যতে সরকারী দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে চায়, কেবল তারাই বিশেষভাবে গণিত শিক্ষা করে। শিক্ষাদান কালে বেতের ব্যবহার প্রায়শই হয়ে থাকে এবং শিক্ষকদের ধারণা এটি শিক্ষাদানের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। একমাত্র অবতারী লামা ভিন্ন আর সমস্ত রকম ছাত্রকেই অধ্যাপকদের কোনো না কোনোভাবে সেবা করতে হয়। আবার এমন অনেক অধ্যাপকও আছেন, যাঁরা নিজের ছাত্রদের ভরণ-পোষণ এবং ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

প্রাথমিক স্তরে পড়া এবং লেখা এ দুটো আয়ত্ত হয়ে গেলে, ছাত্রদের ব্যাকরণ এবং কিছু ধর্মশাস্ত্র পড়তে হয়। এই শিক্ষাক্রমে পাঁচ বছর সময় লাগে। এরপর ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সোপানে পা রাখার সময় আসে। যদি মঠে উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকে তা'হলে ছাত্রদের অন্য বড় কোনো মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষালাভে আগ্রহী এ রকম ছাত্রদের মধ্যম শ্রেণীর মঠে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষার ধাপ অতিক্রম করা প্রয়োজন। এ সময় ছাত্রদের বৌদ্ধদর্শন, তর্ক বা ন্যায়শাস্ত্র এবং কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভিক পাঠ নিতে হয়। মুখস্থ বিদ্যাই ছাত্রদের গুণগত মান নির্ণয়ের একমাত্র কষ্টিপাথর। যদিও ছাত্ররা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে অধ্যয়ন করে তবে এখানে কোনো ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার নেই। এর পরিবর্তে ছাত্ররা দুই কি ততোধিক দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে পঠিত বিষয় নিয়ে আলোচনা, তর্ক ইত্যাদি সংগঠিত করে এবং অধ্যাপক ছাত্রকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে পারলে ছাত্রটিকে দণ্ড পেতে হয় এবং তাকে নতুন পাঠক্রম দেওয়া সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। যে কোনো একটি বিষয় ভালোমতো আয়ত্ত হয়ে গেলেই, সে বিষয়ের উচ্চতর গ্রন্থ পড়ানো হয় এবং যদি কেউ চিত্রাঙ্কন,ভাস্কর্য কিম্বা কাঠ খোদাই ইত্যাদি কোনো বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চায়, তবে তাকে তার সুযোগও করে দেওয়া হয়। এ সমস্ত চারুকলা সম্পর্কিত শিক্ষালাভের সুযোগ প্রায় সব বিহারেই আছে। তিব্বতে চারটি বিহার আছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হলো গন-দন (লাসা থেকে দু'দিনের পথ), দ্বিতীয় ডে-পুং (লাসার কাছাকাছি, ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত), তৃতীয় সে-রা (এটির অবস্থানও লাসার কাছে, নির্মাণ কাল ১৪১৯ খৃঃ.) এবং চতুর্থ টশী-লুন-পো (চাঙ প্রদেশে, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ই মধ্য তিব্বতে অবস্থিত। সম-য়ে তিব্বতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিহার। আচার্য শান্তরক্ষিতের হাতে এর স্থাপনা হয়েছিল। অতীতে এক সময় এই বিহারটি এ দেশে নালন্দার ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে সম-য়ে বিহারের সেই পূর্বগৌরব আর নেই। পূর্বোল্লিখিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পূর্ব তিব্বতে তের-গী (স্থাপিত ১৫৪৮ খৃঃ.) এবং চীন সীমান্তবর্তী অম-দো প্রদেশের স্কু-বুম (স্থাপিত ১৫৭৮ খৃঃ.) এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে —যদিও এ দুটির খ্যাতি অত বহুলপ্রচারিত নয়। তিব্বতে এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যুষিত বিহারের নিজস্ব জায়গীর আছে। তা'ছাড়া তীর্থ যাত্রীরাও সাধ্যানুসারে এ সমস্ত বিহারে দান করাটাকে ধর্ম মনে করে। ভালো ছাত্রদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে, কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা মুখন-পো (প্রধান অধ্যাপক —ডীন) ঐ রূপ ছাত্রকে খুবই স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে দেখেন এবং তার উন্নতিতে নিজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অনুভব করেন। সাধারণ ছাত্রদের অবশ্য নিজের পরিবার কিম্বা পারিবারিক গুরুদেব যে বিহারে থাকেন, সেই বিহারের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে পড়াশুনা করতে হয়।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যুষিত বিহারগুলি আয়তনে বিশাল। বহু দূর অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থীরা এ সব জায়গায় আসে। ডে-পুং বিহার বর্তমানে এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই বিহারের মোট ছাত্র সংখ্যা সাত হাজার সাত শতেরও বেশী।

সে-রা মঠের ছাত্র সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী। গন-দন এবং টশী-লুন-পো এই দুই মঠ বা বিহারের ছাত্র সংখ্যা তিন হাজার তিনশো। টশী লামা দেশত্যাগী হওয়ায় শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-ডাক খানিকটা এখন কম এবং ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরে সাইবেরিয়া, পশ্চিমে আস্ত্রাখান (দক্ষিণ রুশ) এবং চীনের জেহোল প্রদেশের বহু ছাত্রদের দেখা মেলে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিশাল ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী এবং দেবালয়ও আছে। প্রত্যেক ছাত্রাবাসেরই কিছু না কিছু নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার এ দেশে বেশ কদর আছে। তবে, শিক্ষা অর্থেই এ দেশে গ্রন্থাদি মুখস্থ করা বোঝায়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ন্যায় কিম্বা দর্শন বিষয়ক বিতর্ক খুবই প্রিয়, ঠিক যেমন আমাদের দেশের ছাত্রদের কাছে ক্রিকেট অথবা ফুটবল। এ সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যিনি মুখন-পো (ডীন) পদে নিযুক্ত হন, তাঁকে এ দেশের বিদ্বজ্জনদের মধ্যে সর্বোচ্চ মানে অবশ্যই পৌছাতে হয়, যদিও কার্যক্ষেত্রে তাঁকে অধ্যাপনার কাজ বিশেষ করতে হয় না। সে দায়িত্ব প্রধানত থাকে গের-গেন (লেকচারার) এবং গে-শে৷ (প্রফেসর) এই দুই শ্রেণীর হাতে। সর্বোচ্চ পাঠক্রম শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সুপারিশ সাপেক্ষে ছাত্রদের লহ-রম-পা বা ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। এরপর ছাত্ররা নিজ নিজ মঠে ফিরে যায় এবং যাদের পঠন পাঠনে আগ্রহ থাকে তারা গের-গেন বা গে-শে৷ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েই থেকে যায়।

তিব্বতে কিছু কিছু মঠ আছে যা একান্তভাবেই ভিক্ষুণীদের জন্য নির্দিষ্ট। সেই মঠগুলিতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ আছে। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট মঠগুলি, ভিক্ষু-মঠ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। তবে এই মঠগুলোতে শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই দেওয়া হয়। এ সমস্ত মঠে উচ্চশিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষুদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়াশুনা করার কোনো সুযোগও এ দেশে ভিক্ষুণীদের দেওয়া হয়নি। মেয়েদের শিক্ষা প্রধানত, সামান্য কিছু কাব্য সাহিত্য পাঠ, ধর্মশাস্ত্রের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান এবং পূজাপাঠের নিয়ম-কানুন ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আগেই বলেছি এখানে গৃহস্থদের শিক্ষালাভের সুযোগ ভিক্ষুদের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু মঠে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রের গৃহস্থ বাড়িতে শিক্ষকতা করায় কোনো বাধা নেই। যে কোনো গৃহস্থ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে গিয়ে বই, পুঁথিপত্র ইত্যাদি পড়তে পারে। কিন্তু আবাসিক ছাত্র হতে গেলে ভিক্ষু হওয়া অপরিহার্য। এ সমস্ত বিধি-নিষেধের জন্যই এ দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন খুব বেশী একটা হয়নি। এ দেশে সমস্ত সরকারী পদই অর্ধেক গৃহস্থ এবং অর্ধেক ভিক্ষুদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষিত ভিক্ষুদের চাকুরীক্ষেত্রে ভালো চাহিদা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে

গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে গিয়ে একটা ভালো দরের সরকারী চাকরী বাগিয়ে নিয়েছে, এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। তিব্বতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের সরকারী পদই থাকে একজোড়া করে, একটিতে গৃহী, অন্যটিতে ভিক্ষু। উদাহরণ স্বরূপ লাসার টেলিগ্রাফ অফিসটির কথা বলতে পারি এখানে দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে একজন আমার বন্ধু ভিক্ষু কুশো-অন-দর। ধনী ঘরের ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে শিক্ষক রেখে কিছু লেখাপড়া, হাতের লেখা ইত্যাদি শিখতে পারে, মেয়েদের এরপর ছুটি। যদি ভিক্ষুণী হয়, তা'হলে পূর্বে বর্ণিত কোনো মঠের মাধ্যমে আর একটু অগ্রসর হবার সুযোগ পায়। সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার পাঠ নেই বললেই চলে। লাসা এবং শীগচীতে অবশ্য কিছু অধ্যাপককে দেখেছি যাঁরা নিজেদের প্রাইভেট স্কুল খুলেছেন। এই ধরনের স্কুলে পড়তে গেলে ছাত্রদের কিছু খরচ যোগাতে হয়। এ ধরনের স্কুলের শিক্ষাদানের পদ্ধতি মঠেরই অনুরূপ, তবে দর্শনশাস্ত্র এবং ন্যায়শাস্ত্রের গম্ভীরতম আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। সম্প্রতি লাসাতে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে হিসাব-নিকাশ, বুক-কীপিং ইত্যাদি শেখানো হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকেই সরকারী আমলা বাছাই করা হয়। বছর কয়েক আগে তিব্বত সরকার গাংচীতে একটা ইংরেজী স্কুল খুলেছিলেন। অনেক অভিজাত এবং ধনী ঘরের ছেলেরা সেই স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু এই দূর দেশের দুর্গম অঞ্চলে যাঁরা শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের বেতনের খরচ যোগাতেই তিব্বত সরকারের প্রায় ফতুর হবার যোগাড়। যাই হোক স্কুলটি বেশী দিন চলেনি সরকারও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ঐ স্কুলের পাশ করা কিছু ছেলেকে বৃত্তি দিয়ে সরকার বিলেত পর্যন্ত পাঠিয়ে ছিলেন কিন্তু তারও ফল খুব আশানুরূপ না হওয়ায়, সরকার সাবেকী আমলের শিক্ষা পদ্ধতিই পুনঃপ্রবর্তন করেন। তবে চিরকাল কি আর এ রকম অবস্থা চলবে ? এ দেশের মানুষের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা খুবই প্রবল, ফলে নতুন যুগের হাওয়া একদিন না একদিন এ দেশে পৌছাবেই।

তিব্বতী আহার-বিহার ও বেশ-ভুষা

তিব্বত বিশাল এক দেশ এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দেশ। তদুপরি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থানের ফলে বাতাস এখানে হাল্কা এবং বনজ সম্পদও দেশটির আয়তনের তুলনায় খুবই সামান্য। ঠাণ্ডা যে এখানে কি রকম, তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় মে-জুন মাসেও লাসার চারপাশের পাহাড় বেষ্টনীর মাথাগুলো সাদা বরফে ঢাকা। হিমালয় নামক বিশাল প্রাচীর অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের মৌসুমী বায়ুর এ দেশের আকাশে স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ সম্ভব হয় না, সে জন্যই বৃষ্টি-

পাতের পরিমাণও খুব কম। কিন্তু সেটা সুদে-আসলে পুষিয়ে দেয় তুষারপাতের মাধ্যমে। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা যে কি জিনিস তা এ দেশে এলে হাড়ে হাড়ে মালুম হয়।

জলবায়ুর এই অতি কঠোরতার জন্য এখানকার মানুষ খুব পরিশ্রমী এবং সাহসী। সিংহলের মতো একটি সারং (লুঙ্গী জাতীয় পোশাক) এ দেশের আবহাওয়ায় নিতান্তই বেমানান। এখানে গরম কালের জন্যও প্রয়োজন হয় মোটা পশমী পোশাক, শীত কালে তো তার ওপরেও আর এক দফা পোস্তীন চাপাতে হয়। সাধারণ লোকে ভেড়ার চামড়ার লোমশ দিকটা ভেতরের দিকে রেখে পরে। ধনী লোকেদের জন্য অবশ্য রয়েছে নেকড়ে, নেউল প্রভৃতির চামড়া যা ফার নামে পরিচিত —তার তৈরি পোশাক। পায়েও পশমী মোজা এবং বুট অবশ্যই পরতে হয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। এর ওপরে আছে মাথায় ফেল্ট টুপী। এই ফেল্ট হ্যাট ফ্যাশনটি নেহাৎই হাল আমলের আমদানী। ছেলে-বুড়ো, ধনী-গরীব, কৃষক, পশুপালক (চরবাহ) সকলের মাথাতেই দেখি এই টুপী। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুরানো ফেল্ট টুপী ধোলাই হয়ে কলকাতায় আসে। কলকাতা থেকে আবার এ দেশে চালান আসে সেই সব টুপী। এ দেশে এগুলো বেশ সস্তাতেই বিক্রী হয়।

মেয়েরাও এখানে শোম্পা (জুতো) পরে। মেয়েদের পরনের ছুপা হাতা বিহীন হয়। ছুপার নীচে থাকে পুরো-হাতার সুতি কিম্বা আসামের এণ্ডির জামা। কোমরের নীচে সামনের দিকে অ্যাপ্রন জাতীয় একটা কাপড় থাকে যেটা সাধারণত ঝাড়নের কাজ করে। মেয়েদের শরীরের সাজগোজের চেয়ে মাথার সাজগোজের বাহারই বেশী। যদি এ কথা কেউ বলে যে তিব্বতী গৃহস্থের সম্পত্তির অধিকাংশই থাকে তাঁর গৃহিণীর মাথায়, তা'হলে সেটা অতিশয়োক্তি মনে হলেও মিথ্যা নয়। তা'ছাড়া তিব্বতী মেয়েদের কে কোন প্রদেশের বাসিন্দা সেটাও চেনা যায় তাদের শিরোভূষণ দেখে। টশী লামার অঞ্চল যাকে চাং প্রদেশ বলা হয়। সেখানকার স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ হয় ধনুকাকৃতির। এই ধনুকটি তৈরি হয় কাঠ বাঁকিয়ে তার ওপরে কাপড় জড়িয়ে। এর গায়ে ফিরোজা আর মুগার কাজ করা থাকে। ধনী গৃহিণীরা অবশ্য তাঁদের শিরোভূষণে আসল মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদিও ব্যবহার করে থাকেন। লাসা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা আবার ত্রিকোণাকৃতির এক ধরনের শিরোভূষণে নিজেদের সজ্জিত করেন। এই ত্রিকোণটিও কাঠের তৈরি এবং ব্যবহারকারিণীর সাধ্যানুসারে সজ্জিত। অধিকন্তু এটির নীচে কৃত্রিম চুল খোলা অবস্থায় থাকে। এ ধরনের কৃত্রিম চুল চীন দেশ থেকে এ দেশে আমদানী করা হয়। এ রকম পরচুলার পেছনে পঞ্চাশ-একশো টাকা খরচ করা এ দেশের মহিলাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। লাসা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের জীবনযাত্রাতে তথাকথিত নগর জীবনের ছাপ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

সে জন্যই এখানকার মেয়েদের মধ্যে সাজসজ্জার আড়ম্বরও অন্য অঞ্চলের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। তিব্বতের বাকী অঞ্চলের জীবনযাত্রা এখনও কয়েক শতাব্দী পিছনে পড়ে আছে। চুল ছাড়া কর্ণভূষণ গলায় চৌকো তাবিজসহ হারও মেয়েদের একটি অতি আবশ্যক গয়না। এই তাবিজের ভূমিকা অবশ্য ভূত-প্রেত তাড়ানো। মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর সমস্ত তিব্বতী মেয়েই ডান হাতে শঙ্খ পরে। শঙ্খটি বালার মতো, তবে তার বৃত্তটি খুবই ছোট, কোনো মতে হাতে গলে মাত্র।

উল বা পশমই হলো এ দেশের প্রধান উৎপাদন। এখান থেকে উল, ফার, কস্তুরী বিদেশে চালান যায়। তিব্বতের রপ্তানি বাণিজ্যের বেশীর ভাগই হয় ভারতবর্ষের পথে। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে গম ছাড়া, বার্লি, মটর, যব, সরষে এগুলো কিছু কিছু জন্মায়। বছরে একবারই চাষ হয়। তবে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উর্বরতার তারতম্য বিশেষে একই ফসল রোপণের সময়েরও কিছুটা হেরফের হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ফসল কাটার কাজ শেষ হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের শুরু থেকে গাছের পাতা হল্‌দে হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে। অর্থাৎ শরতের পদধ্বনি শোনা যায়।

প্রচুর পরিমাণ গম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিব্বতীরা রুটি খায় না। গম, যব সব কিছুকেই আগে এরা ভেজে নেয় তারপর তাকে পিষে সত্তুতে পরিণত করে। এ দেশে সত্তুর নাম হলো চম্বা। রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে নিতান্ত হত দরিদ্র লোকেরও এটাই হলো প্রধান আহার। নুন, মাখন, মিছরি এবং গরম চা পেয়ালায় ঢেলে তার মধ্যে চম্বা মিশিয়ে এরা খেয়ে থাকে। বাড়িতে প্রত্যেক লোকের জন্য আলাদা আলাদা পেয়ালা নির্দিষ্ট থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পেয়ালাগুলো কাঠের তৈরি। এই পেয়ালাই এ দেশে একাধারে, থালা, বাটি, গেলাস ইত্যাদির কাজ করে। খাবার পর জিভ দিয়ে ভালো করে চেটে-পুটে পেয়ালা সাফ করে বুকের ভেতরকার ঝোলার মধ্যে ওরা রেখে দেয়। খাবার পর মুখ হাত ধোবার ব্যাপারটা কদাচিৎ হয়, এমন কি বিহারের ভিক্ষুদের মুখেও এক পোঁচ ময়লা হামেশাই দেখতে পাওয়া যাবে। তিব্বতে অতি সহজেই এমন মানুষের দেখা পাওয়া যেতে পারে যে জীবনে শরীরে কখনও জল ছোঁয়ায়নি। চা এবং চম্বা ছাড়া মাংস এদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। মাংস বেশীর ভাগ সময়েই কাঁচা অথবা শুকনো অবস্থায় এরা খায়। মসলা সহযোগে মাংস রেঁধে খাওয়াটা এখানে বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। ইদানীং চীনা কিম্বা নেপালী কর্মচারী, সওদাগর ইত্যাদিদের প্রভাবে পড়ে একমাত্র শহরাঞ্চলেই মসলা দিয়ে মাংস রান্না চালু হয়েছে। চীনাদের মতো এরাও দুটো কাঠিকে (চপষ্টিক) খাবার সময় চামচের মতো ব্যবহার করে। সম্প্রতি চীনাদের কাছ থেকে আটার তৈরি কিছু কিছু খাবার তৈরি করা এরা শিখেছে। চা-এর ব্যবহার এখানে অত্যধিক। চীন

দেশ থেকে এখানে চা আমদানি হয়। চা পাতাকে চাপ দিয়ে ইটের মতো বানিয়ে তারপর সেগুলো এ দেশে চালান আসে। চীন থেকে এখানে চা আসতে তিন মাস সময় লাগলেও ভারত থেকে আমদানি করা চায়ের তুলনায় দামে অনেক সস্তা পড়ে। আমাদের দেশের মতো এখানে চায়ে দুধ, চিনি ইত্যাদির ব্যবহার এ দেশে নেই। প্রথমে গরম জলে চা এবং তার সঙ্গে নুন ও কিছুটা সোডা দিয়ে ফোটানো হয়, তারপর সেই ফুটন্ত জলে কিছুটা মাখন ফেলে দিয়ে কাঠের মন্থনী দিয়ে খুব করে মন্থন করে চা তৈরি করা হয়। চায়ের রঙ আমাদের দেশের দুধ মেশানো চায়ের মতোই হয়। শুকনো মাংস, চা এবং কাঁচা মদ (ছঙ) এই তিনটি জিনিস দিয়ে তিব্বতীরা অতিথি আপ্যায়ন করে থাকে। যব কিম্বা বার্লি পচিয়ে ঘরেই তৈরি করা হয় এই ছঙ এবং সকলেই নির্দ্বিধায় এটা পান করে। অল্প কিছু হলুদ টুপীধারী গে লুক-পা ভিক্ষু সম্প্রদায় ছাড়া তিব্বতের আপামর জনতাই মদ্য পানে খুব অভ্যস্ত। এমন কি গে লুক-পা পন্থী ভিক্ষুরাও পুজো-আচ্চার সময় বুড়ো আঙুলের মাথা ডোবে এমন পরিমাণ ছঙ দেবতার প্রসাদ মনে করে গ্রহণ করে থাকে। অন্যথায় দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন বলে তাদের বিশ্বাস। পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় এ রকম মদ্যবিলাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দেখা মিলবে না।

তিব্বতের পশমী কাপড় খুব মজবুত এবং বর্ণবৈচিত্র্যে মনোহর। কিন্তু কাপড় বোনার বেলাতেও এরা প্রাচীন পন্থার অনুসারী। খুবই কম বহর থাকে এখানকার তৈরি বস্ত্রের। এ দেশের পশম গুণগত মানেও সর্বোচ্চ পর্যায়ের। লক্ষ লক্ষ টাকার পশম এখান থেকে আমাদের দেশে রপ্তানি হয়। ভারতের পশমী বস্ত্র ও পোশাক তৈরির কারখানাগুলোকে তিব্বতী পশমই শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সচল রাখে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। পশমী বস্ত্রের দাম আমাদের দেশের তুলনায় বেশ সস্তা। আগে এ দেশে মোজা, দস্তানা ইত্যাদি বানাবার রেওয়াজ ছিল না। সম্প্রতি নেপালী ব্যবসায়ীদের শিক্ষায় এবং আগ্রহে লাসা অঞ্চলে এ সমস্ত জিনিস কিছু কিছু তৈরি হচ্ছে।

তিব্বতীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিম্বা আধুনিক শিক্ষার নিরীখে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে হয়ত অনেক পশ্চাদপদ অবস্থায় আছে কিন্তু শিল্পকলা বিষয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধরনের সচেতনতা বর্তমান তা বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। লাসার পর-লে প্রদেশে প্রচুর আখরোট গাছ জন্মায়। আখরোট কাঠ খুব শক্ত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য তাতে খোদাইয়ের কাজ খুব সুন্দর হয়। প্রতিটি বিহার বা মঠে, কিম্বা একটু সচ্ছল গৃহস্থ বাড়িতে এ রকম কাঠের ওপর খোদাই করা সুন্দর সুন্দর নানা রকমের কারুকাজের সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলো এ দেশের মানুষের শিল্পনৈপুণ্য এবং রুচির পরিচয় বহন করে। সম্পূর্ণ ত্রিপিটক অথবা অট্ঠকথা আগে আখরোট কাঠের ছোট ছোট তক্তায় খোদাই করে ব্লক তৈরি করে নিয়ে পরে কাগজে নিজেরাই বাড়িতে ছেপে নেয়।

ডুক্‌পা লামার সঙ্গে থাকার সময় এ রকম ছাপার কাজ দেখেছিলাম। এখানকার চিত্রকলা সিংহলের সেগেরিয়া কিম্বা ভারতবর্ষের অজন্তা গুহার শুদ্ধ আর্য চিত্রকলার সমসাময়িক। আর রঙের বিচিত্র সমাবেশ বা সংমিশ্রণও খুবই সুন্দর। তবে সম্প্রতি বিদেশী রঙ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিত্রকলার স্থায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এ দেশের চিত্রকলার ধারাটি ভারতের নালন্দা এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার থেকে আমদানি। অবশ্য সমস্ত রকম চিত্রকলাই এখন একটা বিশেষ ধরনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তাই আগের মতো মৌলিকতার দিক থেকে অভি-নবত্বও আর নেই। তা'ছাড়া বর্তমানে এখানকার চিত্রশিল্পীরা কল্পনাশক্তির ব্যবহার খুব কমই করছে মনে হলো। এমন কি নিসর্গ দৃশ্যের ছবি আঁকতেও খুব কমই দেখা যায়। এ সমস্ত সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চারুকলা শিল্পে এরা আমাদের দেশ বা সিংহল থেকে এখনও অনেক এগিয়ে আছে। এখানে চিত্রশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সর্বজনীনতা। এ দেশের চিত্রশিল্পীরা যা কিছু সৃষ্টি করে, তাকে বোঝবার জন্য, তার রসাস্বাদনের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করেই সৃষ্টি করা হচ্ছে। চিত্রশিল্প ছাড়া ধাতু বা মাটির মূর্তি নির্মাণও এ দেশের একটি বিশেষ শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্মটি শেখার জন্য আগ্রহী ছাত্রকে এখনও প্রাচীনকালের মতো গুরুগৃহে বাস করে, সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে গুরুর মনস্তুষ্টি ঘটিয়ে তবে আয়ত্ত করতে হয়। কারণ খুব দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ব্যতিরেকে এই শিল্প আয়ত্ত করা খুব কঠিন। যদি আমাদের দেশের প্রাচীন এবং লোকশিল্পকে আমরা আবার জাগিয়ে তুলতে চাই সে ক্ষেত্রে তিব্বতের কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেতে পারি। তিব্বতী জনগণের জীবনযাত্রার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে শিল্পবোধ। প্রতিটি বাড়ি এখানে সুন্দর করে সাজানো। কাপড়ের ঝালরে মানানসই রঙের সমাবেশ, ছাদ কিম্বা জানলার গায়ে মাটির টবে ফুলের গাছ। জানলায় কাপড় কিম্বা কাগজের জালিদার পর্দা, ঘরের দেয়ালে সুন্দর করে আঁকা রেখাচিত্র। পেয়ালা রাখবার ছোট্ট কাঠের জল চৌকিটি পর্যন্ত নানা রঙে চিত্রিত।

খাদ্য বস্তুর মধ্যে মাখন ও মাংস এবং পরিধানের পশমী বস্ত্র, এই কয়টা জিনিস এ দেশে জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য। সে জন্যই এরা চাষ-বাসের চেয়ে পশুপালনকে বেশী গুরুত্ব দেয়। ভেড়া, ছাগল, চমরী (ইয়াক) এখানকার দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান জিনিস। ছাগল, ভেড়ার সাহায্যে অতি দুর্গম অঞ্চলে মাল পরিবহণের কাজও কিছুটা হয়। চমরী থেকে মাংস, চামড়া, মাখন এবং দুধ পাওয়া যায়। এদের শরীরের কালো এবং দীর্ঘ লোম থেকে দড়ি তৈরি হয়। জুতো, ব্যাগ ছাড়া আরও অনেক কাজে চমরীর চামড়ার ব্যবহার আছে। চমরীরা সাধারণত ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে সে জন্য মে, জুন, জুলাই এবং অগস্ট এই চার মাস যখন এ দেশের

আবহাওয়া কিছুটা উষ্ণ থাকে, তখন চরবাহরা (পশুপালক) চমরীর পাল নিয়ে পাহাড়ের আরও ওপরে চিরস্থায়ী শীতল আবহাওয়ায় চলে যায়। আঠার কুড়ি হাজার ফিট উচ্চতা, যেখানে বাতাস পাতলা হবার ফলে ঘোড়া, খচ্চর-জাতীয় প্রাণীরাও পিঠে মাল নিয়ে চলতে কষ্ট বোধ করে সেখানেও চমরী এক পিঠ বোঝা নিয়ে নিজস্ব মন্দ গতিতে অনায়াসে পথ চলে। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই পথে এগুলোর চলা দেখলে সত্যি আশ্চর্য লাগে। সে জন্য এ দেশে ভেড়ার পরই চমরীর স্থান। ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার সংখ্যাও এখানে প্রচুর। রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী এমন কি গোরুরগাড়ীও এ দেশে নেই, সে জন্য মালপত্র চলাচলে পশুর প্রয়োজন খুব বেশী। এ দেশের ঘোড়াগুলো আকৃতিতে কিছুটা খাটো, টাট্টু জাতীয়, কিন্তু এগুলোকে খুব সুন্দর দেখতে এবং খুব উচ্চতা না হলে, সাধারণ পাহাড়ী রাস্তায় চলার পক্ষে উপযুক্ত। খচ্চর তিব্বতের প্রাণী নয়, এগুলো আসে মঙ্গোলিয়া এবং চীনের সী-লিং অঞ্চল থেকে। ছাগল বা ভেড়া যারা পালে তাদের পক্ষে কুকুর পোষা খুব বেশী প্রয়োজন। বড় জাতের তিব্বতী কুকুর, অধিকাংশের রঙই কালো, চোখ নীল এবং দেখতে ভীতিপ্রদ। কুকুরগুলোর গায়ে যে রকম বড় বড় লোম থাকে, হঠাৎ দেখলে ভালুক বলে ভুল হয়। আকারে এগুলো নেকড়ের চেয়ে বড়। কুকুরগুলো ভীষণ হিংস্র স্বভাবের। বাড়িতে এ রকম কুকুর একটা থাকলেই, বাড়ির সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। তিব্বতীরা মাংসের হাড় পর্যন্ত গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলে, তাই বেচারা কুকুরগুলোর বরাতে জোটে সকালবেলা খানিকটা গরম জলে গোলা চম্বা। এই সামান্য খাবার খেয়েই প্রভুভক্ত কুকুরের দল দিনমানে লোহার শেকলে বাঁধা থেকে বাড়ি পাহারা দেয় আর রাত্রিকালে ছাড়া থাকে। খাঁচার বাইরে শিকলে বাঁধা বাঘের কাছে যাওয়াও বোধ হয় এদের কাছে যাওয়ার তুলনায় নিরাপদ। এ রকম বড় জাতের কুকুর ছাড়া আরও দু'এক রকমের কুকুর এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে লাসার কাছে, মুখে বড় বড় লোমওয়ালা এবং লোমহীন, এই দুই ধরনের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর কুকুর পাওয়া যায়। এখানে এগুলোর এক একটার দাম হয়ত দু'তিন টাকা পড়ে, দার্জিলিংয়ে সত্তর-আশী টাকায় বিক্রি হয়। তবে এ ধরনের সৌখীন কুকুর একটু অবস্থাপন্ন লোকেই পুষে থাকে।

তিব্বতের নেপালী

নেপাল এবং তিব্বত, এই দুই দেশের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে তিব্বতের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময়ও এই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল, এমন প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর তিব্বত সমস্ত দিক থেকেই উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। সে সময় তিব্বত সম্রাট

স্রোঙচেন নেপালে তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন করে, নেপালের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তৎকালীন চীন সাম্রাজ্যেরও অনেকাংশ দখল করে, চীন সম্রাটকেও বাধ্য করেছিলেন তাঁকে কন্যা দান করতে। কথিত আছে সম্রাট স্রোঙচেন-এর রাজত্বের আগে তিব্বতী ভাষায় কোনো লিপি ছিল না। সম্রাট স্রোঙচেন, সম্ভোটা নামে জনৈক ব্যক্তিকে অক্ষর লিপি শেখার জন্য নেপালে পাঠিয়ে ছিলেন। সম্ভোটা নেপালী অক্ষর লিপি শিখে, তিব্বতী হরফের জন্ম দেন। নেপাল রাজদুহিতাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আসেন। আর এভাবেই এক সময় রাজনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ীরা ধর্ম ক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে। আজও নেপালের সেই রাজকন্যা তারা দেবী সারা তিব্বতে অবতার-জ্ঞানে পূজা পেয়ে আসছেন। এ দেশে সভ্যতা, সংস্কৃতির বিস্তারে নেপালের ভূমিকাই প্রধান। তা'ছাড়া নেপাল উপত্যকার প্রাচীন বাসিন্দা নেওয়ারীদের সঙ্গে তিব্বতী ভাষার এক অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদেরা নেওয়ারী ভাষাকে তিব্বতী-বর্মী ভাষার একটা শাখা বলে মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ কোনো তিব্বতী যদি বলে সেউ-মারী (কেউ নেই) সে ক্ষেত্রে নেওয়ারী ভাষায় তা হবে সু-মারো। এ সমস্ত তথ্য দুই দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসা ঘনিষ্ঠতারই প্রমাণ। সম্রাট স্রোঙচেনই লাসাকে রাজধানী করেন। সম্রাট স্রোঙচেন-এর রাজত্ব কালের একশো বছর পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে সম্রাট স্রোঙ-ল্দে-বচন ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের জন্য আচার্য শান্তরক্ষিতকে নালন্দা মহাবিহার থেকে এ দেশে আনিয়ে ছিলেন। সে সময় ভারতীয় পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারকদের জন্য এ দেশের দরজা সদা উন্মুক্ত ছিল। ভারতবর্ষে ইসলামবিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার আগে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ রকম অবস্থা বজায় ছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিহারগুলোর মাধ্যমেই প্রধানত এই যোগাযোগ রক্ষিত হতো। বর্তমান দার্জিলিং-লাসা পথটি তখন অজানা ছিল। সেই কারণে তখন ভারত ও তিব্বতের যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল নেপালের মধ্য দিয়ে। ভারত এবং তিব্বত এই দুই দেশের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল নেপালের অবস্থান। এটা যেমন ভৌগোলিক দিক থেকে সত্য ছিল, তেমনই সত্য ছিল, ধর্ম শিক্ষা এবং বাণিজ্য সম্পর্কে। তিব্বতের জিনিস ভারতে আবার ভারতের জিনিস তিব্বতে এই আদান-প্রদানের কাজ নেপাল করে আসছে হাজার বছর ধরে।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থাদির তিব্বতী অনুবাদের কাজে নেপালী পণ্ডিতদের খ্যাতি ভারতীয় কিম্বা কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সমতুল্য নয় তথাপি এ বিষয়ে তাদের অবদানও বড় কম নয়। শান্তিভঙ্গ, অনন্তশ্রী, জেতকর্ণ, দেবপুণ্যমতি, সুমতিকীর্তি, শান্তিশ্রী প্রমুখ নেপালের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় নবম এবং দশম শতাব্দীতে বহুবিধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, বিশেষত তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তবে এ ধরনের কাজে নেপালী পণ্ডিতদের ভূমিকা ততটা উল্লেখযোগ্য নয় কেন না তখন ভারতবর্ষের

বিভিন্ন বিহার থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সহজেই পাওয়া যেত। যেদিন থেকে লাসা তিব্বতের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে প্রায় সে দিন থেকেই নেপালী ব্যবসায়ীরাও তিব্বতে রয়েছে। তবে তিব্বতের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। সে জন্যই ঐ সব গ্রন্থে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারাবাহিক তথ্যাবলী বিশেষ পাওয়া যায় না। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ক্যাপুচিন গোষ্ঠীয় পাদরীদের লিখিত গ্রন্থে নেপালী ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা সে সময় কিছু নেপালীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল এমন বিবরণও জানা যায়। ১৬৬১ থেকে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাপুচিন পাদরীরা লাসায় ছিল। সে আমলে প্রতিষ্ঠিত গীর্জার একটি ঘণ্টা ১৯০৪ সালে বৃটিশ মিশন লাসায় পৌঁছে দেখতে পেয়েছিল। ক্যাপুচিন সম্প্রদায়ের পাদরীরা লাসা ত্যাগ করে চলে যাবার কিছুদিন পরেই নেপালী ব্যবসায়ীদের অভিযোগের সূত্র ধরে নেপাল তিব্বত আক্রমণ করে।

বর্তমানে তিব্বতে নেপালী ব্যবসায়ীদের বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। এই অধিকারগুলো অবশ্য ১৭৯০ এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নেপাল-তিব্বত যুদ্ধের ফলশ্রুতি। প্রথম যুদ্ধে নেপালের সৈন্যবাহিনী লাসার পথের সমস্ত গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে লাসা থেকে সাত দিনের দূরত্বে শীগর্চি (টশী-লুন-পো) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সে সময় যদি চীন তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিব্বতের পক্ষে এগিয়ে না আসত, তা'হলে লাসার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। চীনা সৈন্যরা নেপালীদের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের তাড়াতে তাড়াতে কাঠমাণ্ডু অবধি নিয়ে যায়, অবশেষে নেপাল চীনের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে তিব্বত এবং নেপাল উভয়েই চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যুদ্ধ জয় উপলক্ষে চীন সম্রাটের একটা লেখ এখনও লাসার পোতলা প্রাসাদের সামনে বর্তমান রয়েছে। দ্বিতীয় নেপাল-তিব্বত যুদ্ধ শুরু হয় নেপালের বর্তমান রাণাশাহীর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের আমলে। এই যুদ্ধে অবশ্য নেপাল তিব্বত সীমার গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করতে পারেনি, তার আগেই চীন মধ্যস্থতা করে উভয় পক্ষের বিরোধের সাময়িক মীমাংসা ঘটিয়ে দেয়। মীমাংসার শর্ত অনুযায়ী তিব্বত নেপালকে বার্ষিক দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হয়। তা'ছাড়া অন্যান্য শর্তের মধ্যে ছিল: (১) সঙ্কটকালে নেপাল ও তিব্বত উভয় দেশই পরস্পরকে সাহায্য করবে; (২) এক দেশ অপর দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করবে না; (৩) লাসাতে নেপাল সরকারের একজন দূত থাকবে; (৪) তিব্বতে থাকাকালীন নেপালের প্রজারা কোনো অপরাধ করলে তাদের বিচার করবে নেপালের বিচারকেরা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সন্ধি-চুক্তির ফলে নেপাল তিব্বতে বহির্দেশীয় প্রভুত্বের অধিকার (Extra Territorial Right) লাভ করল। বর্তমানে যেমন ইউরোপীয় জাতিগুলো চীনে লাভ করেছে।

অবশ্য চীনের জনগণ এই বাইরের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

নেপাল-তিব্বত দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে লাসার নেপালী ব্যবসায়ীরা দশটি আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজন করে দলপতি নির্বাচিত হতো তার নাম ছিল 'ঠাকলী'। এই ঠাকলী আজও আছে তবে বর্তমানে এর সংখ্যা কমে গিয়ে সাতে দাঁড়িয়েছে। তা'ছাড়া ঠাকলীদের ক্ষমতাও কমে গেছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর পৃথক বৈঠকের জায়গাকে বলে 'পালা'। লাসাতে ব্যবসা-বাণিজ্যকারী নেপালীরা অধিকাংশই ধর্মে বৌদ্ধ। নেপালী বৌদ্ধরা আবার তান্ত্রিক মত অনুসরণ করে। এ জন্য প্রত্যেক পালাতে তান্ত্রিক বিধিমতো পূজাপাঠও হয়। ঐ সব পালাতে কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত আছে তার কয়েকটি শতাধিক বছরেরও বেশী পুরানো।

বর্তমানে নেপালের পক্ষ থেকে লাসাতে একজন রাজপ্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত, একজন ডীঠা বা বিচারক এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য রাখা আছে। লাসা ছাড়াও, গ্যাংচী, শীগর্চী, কুতী, কেরঙ প্রভৃতি জায়গাতে নেপালের প্রজাদের মামলা মোকদ্দমার বিচার করা এবং এ দেশে তাদের প্রাপ্য অধিকার ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখা, ইত্যাদির জন্যও একজন করে ডীঠা আছে। নেপালের প্রজা বলতে শুধুমাত্র যারা নেপালে জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরই বোঝায় না, তাদের তিব্বতী রক্ষিতাদের গর্ভজাত ছেলেদেরও বোঝায়। লাসায় বসবাসকারী নেপালীদের মোট সংখ্যা শ' দুয়েকের বেশী কোনো মতেই হবে না। কিন্তু এই নিয়মানুসারে নেপালের প্রজার সংখ্যা হবে হাজার কয়েক। তিব্বতী মেয়েদের গর্ভে নেপালী ঔরসে জন্মানো ছেলেদের এখানে বলে পরাখচ্‌রা। এ রকম ছেলেরা এ দেশে জন্মালেও নেপালের প্রজা বলেই গণ্য হয় কিন্তু পিতৃসম্পত্তিতে এদের বিন্দুমাত্র অধিকার থাকে না। দয়া করে পিতৃদেব যদি কিছু দেন তবে তাই নিয়েই এই পরাখচ্‌রা সন্তানেরা খুশী থাকে। এমনটিও হামেশা দেখা যায় যে, সন্তান জন্মাবার পর তার পিতৃত্ব অস্বীকার করে কিম্বা দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে নেপালী ব্যবসায়ী তার এ দেশীয় স্ত্রীটিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নেপালের আইন অনুসারে কোনো নেপালী তার স্ত্রীকে এ দেশে আনতে পারে না, সে জন্য এ দেশের মেয়েদের রক্ষিতা হিসেবে রাখা নেপালীদের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তা'ছাড়া তিব্বতী মেয়েদের বহুপতি গ্রহণের নিয়মের সুযোগ নিয়ে অনেক নেপালী আবার একটি তিব্বতী স্ত্রীলোকের দায়িত্ব নেওয়ার ঝামেলায়ও যেতে চায় না। তার চেয়ে কোনো তিব্বতী পুরুষের সঙ্গে ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে তাদের এজমালি স্ত্রীটিকে নির্দায়ে উপভোগ করে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে নেপাল এবং তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কয়েক সহস্রাব্দ ধরে চলে আসছে। এখানকার নেপালী ব্যবসায়ী এবং তিব্বতীদের ধর্মও

এক। এরা উভয়েই তান্ত্রিক পথ অনুসরণকারী বৌদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয় বাদ দিলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অমিল অপেক্ষা মিলই বেশী চোখে পড়ে। নেপালে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার খুব বেশী কিন্তু নেপালীরা এ দেশে ওসব আচার-বিচারের বিশেষ ধার ধারে না। আসলে ব্যাপারটা তখন গিয়ে দাঁড়ায় যস্মিন দেশে যদাচার পর্যায়ে। পানাশক্তিতে উভয় গোষ্ঠীই সমান—এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায়। এ দেশে বসবাসকারী অনেক নেপালীকে আমি চমরী বা ইয়াকের মাংসও খেতে দেখেছি। বললে, বলে—চমরী তো আর গোরু নয়, তাই খেতে কোনো দোষ নেই। অধিকাংশ নেপালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে তিব্বতী বৌদ্ধ পাচক, কিন্তু তা'বলে মুসলমানদের হাতে তৈরি রুটি খেতেও তাদের মোটেই আপত্তি দেখিনি। অথচ এ সমস্ত নেপালে বেশ ভারী ধরনের সামাজিক অপরাধ বলে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে একজন নেপালী যখন ব্যবসা উপলক্ষে এ দেশে আসে, তখন তিন-চার বছরের মধ্যে আর দেশে ফিরে যেতে পারে না। এই দীর্ঘ সময় এ দেশে বাস করার কালে স্বদেশীয় আচার-বিচার পালন করা তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তবে দেশে ফিরে তাদের এই আচার-বিচার থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত অর্থে কিছু মূল্য ধরে দেওয়া।

ব্যবসায়ী হিসেবে কিন্তু নেপালীরা খুবই সফল। আধুনিক শিক্ষার অভাবের জন্য এদের ব্যবসা পদ্ধতি কিছুটা প্রাচীন, তবুও এমন ধরনের একটি পিছিয়ে থাকা দেশে তারা বাণিজ্য করে যেখানে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী ইত্যাদি আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থা কিছুই নেই। নেপালী ব্যবসায়ীদের ব্যবসার আরও সম্প্রসারণ ঘটাবার যথেষ্ট সুযোগ এখানে আছে। কিন্তু অর্থনীতির ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবে সে দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি নেই। অধিকাংশ নেপালী ব্যবসায়ীর ব্যবসার একটি শাখা কলকাতাতে থাকে। কেউ কেউ গ্যাংচী, শীগর্চী, ফরিজোঙ, কুতী ইত্যাদি জায়গাতেও শাখাকেন্দ্র খুলে রেখেছে। কস্তুরী, ফার এবং পশম প্রধানত এই তিনটি জিনিসই এ দেশ থেকে বাইরে রপ্তানি হয়। বিনিময়ে আমদানির পাল্লা কিন্তু বেশ ভারী। মুগা, মুক্তা, ফিরোজা, প্রবাল, বারাণসী এবং চীনের রেশমী কাপড়, বিলাতী ও জাপানী সুতিবস্ত্র ছাড়াও কাচের জিনিসপত্র, খেলনা ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস বাইরে থেকে এখানে আমদানি করতে হয়। সমস্ত জিনিসপত্রের মূল উৎপাদনকেন্দ্র অথবা আগ্রহী ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় সমস্ত বেচা-কেনাটাই হয় কলকাতা মারফৎ। এর প্রধান কারণ আধুনিক ব্যবসাপদ্ধতি প্রয়োগের অভাব। নেপালী ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে এখনও খুব বেশী রকম রক্ষণশীল। এ ধরনের ব্যবসাতে উভয় পক্ষেরই লাভের চেয়ে লোকসান হয় বেশী। তবে নেপালীদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এটুকুই যে, ব্যবসা ক্ষেত্রে এখনও তাদের তেমন কোনো জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। লাদাখী মুসলিমদের মধ্যে

যারা এখানে ব্যবসা করে তাদের ব্যবসাপদ্ধতিও উচ্চ স্তরের নয়। চীনা প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চৈনিক ব্যবসায়ীদের স্বর্ণযুগেরও অবসান হয়েছে। আর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তো এটা নিষিদ্ধ দেশ, এ দেশে তাদের ঢোকাই বারণ। অতএব আরও কত বছর নেপালী ব্যবসায়ীরা তিব্বতে একচেটিয়া ব্যবসাধিকার ভোগ করবে তার উত্তর একমাত্র ভাবীকালই দিতে পারে। তবে নেপালীরা মোটামুটি ব্যবসায়িক সাধনা জানে। সে জন্য অল্প পরিশ্রমেই লাভের মুখ দেখতে পায়। আমার পরিচিত নেপালী ব্যবসায়ী ধর্মমান সাহুর কথাই ধরা যাক। লাসাতে তাঁর যে কুঠি আছে তার প্রায় দেড়শো বছর বয়স হয়ে গেলো। এই কুঠির শাখা ছড়িয়ে আছে যথাক্রমে গ্যাংচী, ফরী, কাঠমাণ্ডু, কলকাতা এবং লাদাখে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকার মাল তিনি এ দেশে আমদানি করেন এবং সমপরিমাণ জিনিস রপ্তানি করেন। ভদ্রলোকের মূলধনের পরিমাণও যথেষ্ট। চীন, জাপান, সিংহল, মঙ্গোলিয়া এবং চীনা তুর্কীস্থানের সঙ্গে খুব সহজেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগও তাঁর আছে। এ রকম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে ওই সমস্ত দেশের উৎপাদিত সামগ্রী সরাসরি কেনার ব্যবস্থা করা আর এ দেশের জিনিসকে সরাসরি তাদের দেশে বিক্রির ব্যবস্থা অনায়াসে করা যেত। কিন্তু ধর্মমান সাহুর এ বিষয়ে কোনো আগ্রহই নেই। আসলে ব্যবসায়িক শিক্ষার অভাবই এর প্রধান কারণ। তবে ব্যবসায়ী হিসেবে নেপালীরা মোটামুটি সৎ। ক্রেতাদের সঙ্গে এদের ব্যবহারও মধুর। ধর্ম এক হওয়ার জন্য এরা স্থানীয় মঠের লামাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং মূল্যবান পূজা, ভেট ইত্যাদি চড়ায়। এই সমস্ত কারণে তিব্বতের নেপালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সিংহলের গুজরাটী মুসলিম ব্যবসায়ী কিম্বা আমাদের দেশের মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের তুলনা করা চলে। তা'ছাড়া নেপালীদের একটা বিশেষ গুণ তারা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই যাক না কেন, খুব তাড়াতাড়ি সেই সব দেশের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নেপালীরা আপন দেশে সাধারণত ভাত খেয়ে থাকে, কিন্তু তিব্বতে এসে তারা পরমানন্দে স্থানীয় অধিবাসীদের মতো সত্তু বা চম্বা চালিয়ে যায়। তবে সেটা এক বেলার জন্য। রাত্রিতে তাদের দেড়-দুই মাসের পথ অতিক্রম করে আসা চালের ভাত অবশ্যই চাই। যদিও আধুনিক তরুণ নেপালীরা হ্যাট-কোট-বুট শোভিত, তবুও বেশীর ভাগ নেপালীই কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী।

তিব্বত ও ভুটান

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিশন এ দেশে আসার পর থেকে কালিম্পঙ-লাসা সড়ক পথটি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। তিব্বতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান অংশটাই এ পথ ধরে হয়ে থাকে। গ্যাংচী পর্যন্ত এই পথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বৃটিশ

সরকারের। গ্যাংচীতে বৃটিশ সরকারের ডাক ও তার বিভাগের কেন্দ্র আছে আবার গ্যাংচীর পর থেকে লাসা পর্যন্ত তিব্বত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের আওতায় পড়ছে। এ পথে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থাও আছে। এই কারণেই আমদানি-রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই এই পথটি ইদানীং বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। কেবল মাত্র চা এবং সামান্য পরিমাণ চীনা রেশমের আমদানি ভিন্ন পথে হয়। এই কালিম্পঙ-লাসা সড়কের এক দিকে পড়ে নেপাল আর অন্য (পূর্ব) দিকে ভূটান। ভূটানীদের সঙ্গে তিব্বতীদের মিল সর্ব ক্ষেত্রেই নেপালীদের চেয়ে বেশী। উভয় দেশের ভাষার পার্থক্যও খুবই সামান্য। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মাচরণ-পদ্ধতিও দুই দেশের একই রকমের। ভূটান থেকে লাসার দূরত্ব নেপালের চেয়ে অনেক কম। এ ছাড়া তিব্বতে প্রধান বাণিজ্যিক সড়কটি প্রায় ভূটানের গা ঘেঁসে গিয়েছে। ভূটানীদেরও সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আছে যা নেপালীরা এ দেশে ভোগ করে। তথাপি সর্বক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় নেপালীদের কাছে এরা হেরে গিয়ে সরে আসছে। এর কারণ ভূটানীরা ব্যবসায়ী জাতি নয় এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে তাদের কুশলতার অভাব পদে পদে চোখে পড়ে। ভূটানীদের প্রধান ব্যবসাই তিব্বতের সঙ্গে, কিন্তু লাদাখী মুসলিম কিম্বা নেপালীদের মতো এত দোকান, কুঠি ইত্যাদি তাদের এ দেশে নেই। এরা নিজেদের দেশের বিক্রয়যোগ্য জিনিস নিয়ে রোজকার হাটে এসে বসে এবং সে সমস্ত বিক্রি করে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সওদা করে ফিরে যায়। ভূটানীরা প্রধানত আনে আসামের এণ্ডি এবং তাদের দেশের রেশম —বিনিময়ে নিয়ে যায় প্রধানত পশম।

শীতকালে লাসার বাজারে দেশ-বিদেশের লোক দেখা যায়। উত্তর দিক থেকে আসে সাইবেরিয়া আর মঙ্গোলিয়ার লোক। পূর্ব দিকে চীন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এবং পশ্চিমের লাদাখ অঞ্চলের লোকে এ সময়ে লাসা ভরে ওঠে। এ ছাড়া তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক তো আছেই। তদুপরি এ সময় ভূটানীরাও বেশ বড় সংখ্যায় এসে হাজির হয়। তাদের বিশাল দেহ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মুণ্ডিত মস্তক। পরনে চোগা, অধিকাংশেরই খালি পা ইত্যাদি চিহ্ন দেখে দূর থেকেই তাদের সনাক্ত করা যায়। তিব্বতী ভাষায় ভূটানের নাম ব্রুগ-ইয়ুল আর ভূটানীদের বলে ব্রুগ-পা (উচ্চারণ ডুক্-পা)। তিব্বতীদের মধ্যে আবার ডুক্-পা নামে একটি সম্প্রদায়ও আছে। এ দেশে আসার সময় আমি যার সাহায্য নিয়েছিলাম সেই ডুক্পা লামা ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন অবতারী লামা। ভূটানীরা ঘোর তান্ত্রিক বৌদ্ধ। লাসাতে ভূটানের দূতাবাস আছে। সেখানে একজন রাজপ্রতিনিধি এবং কিছু সৈন্যও আছে। তবে এ দেশে বসবাসকারীদের মধ্যে ভূটানীদের সংখ্যা কম হবার ফলে তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ও কম। সে জন্যই ভূটানী দূতাবাসকে কখনও নেপালী দূতাবাসের মতো ব্যস্ত দেখা যায় না।

তিব্বত-নেপাল দ্বন্দ্ব : যুদ্ধের আশঙ্কা

যদিও তিব্বত-নেপাল সম্পর্ক অনেক কালের, তবুও তিক্ত ঘটনাও কিছু কিছু ঘটেছে। তিব্বতের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ের সম্রাট স্রোঙচেন-সগেম-পো নেপালরাজ অংশুবর্মার কন্যা তারা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সে বিবাহও ছিল যুদ্ধের ফলশ্রুতি, সন্ধির অন্যতম শর্ত। অবশ্য তারা দেবীর সঙ্গেই তিব্বতে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রবেশ করেছিল। তারপর অনেক শতাব্দী ধরে দুই দেশ পাশাপাশি মিত্রতার সঙ্গে বাস করেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে নেপালের রাণাশাহীর প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গবাহাদুর তিব্বতের বিরুদ্ধে যে জঙ্গটি অনুষ্ঠিত করেছিলেন, চীন যদি সে সময় মাঝখানে ঝাঁপিয়ে না পড়ত তা'হলে হয়ত রাণা জঙ্গবাহাদুর সপ্তম শতাব্দীর রাজা অংশুবর্মার পরাজয়ের শোধ নিতে পারতেন, যদিও সে ইতিহাস তিনি জানতেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক চীনের মধ্যস্থতায় একটা সন্ধি হলো যার শর্তগুলোর অধিকাংশই নেপালের পক্ষে। তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় নেপালী বিচারক গ্যাঁট হয়ে বসলেন নেপালের প্রজাদের বিচারের জন্য। এ ছাড়া বার্ষিক কর ইত্যাদি আরও অনেক কিছু ছিল যা অনেকটা পরাজিত পক্ষের শর্তের মতো, তবুও সেই সন্ধিচুক্তি মেনেই তিব্বত চলছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালে, কতকগুলো ঘটনা নিয়ে আবার নতুন করে উভয় দেশের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলো। অবশেষে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়ে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য করে তুলল। নেপালী প্রজাদের বক্তব্য ছিল যে, তিব্বতী রাজকর্মচারীরা তাদের খামোখা হয়রান করে। (১) নেপালের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে ধনকুটা গ্রামে কিছু তিব্বতী নাগরিক বাস করছিল। তারা নাকি তিব্বতী রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিল। তিব্বতের সৈন্যবাহিনী নেপাল সরকারকে কোনো কিছু না জানিয়েই সীমান্ত লঙ্ঘন করে নেপালে প্রবেশ করে ঐ গ্রাম লুট ও সেখানকার নতুন এবং পুরানো সকল বাসিন্দাদের ওপর জোর-জুলুম চালায় (২) গ্যাংচীর নেপালী দূতাবাসে জনৈক সিপাহীকে তিব্বতীরা খুন করে। বারংবার বলা সত্ত্বেও তিব্বত সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। (৩) তিব্বতে বসবাসকারী নেপালীদের মধ্যে প্রায় সকলেরই তিব্বতী স্ত্রী আছে এবং নিজেদের সাধ্যানুসারে প্রত্যেকেই তাদের স্ত্রীকে যথাসম্ভব সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু লাসার সরকারী কর্মচারীরা স্থানীয় নেপালীদের উত্যক্ত করার জন্য কোনো কারণ না দর্শিয়ে যখন-তখন তাদের স্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে আর তাদের বাড়ি তৈরি করার জন্য পাথর ভাঙার বেগার শ্রমে লাগিয়ে দিচ্ছে। (৪) নেপালের উত্তরাঞ্চলে অনেক নেপালী প্রজা বাস করে যাদের ভাষা তিব্বতী। তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে

তিব্বতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানেই বসতি করে আছে। চুক্তি অনুযায়ী তিব্বতে নেপালী প্রজাদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা, তা থেকে এদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, তিব্বতী রাজকর্মচারীরা তাদের সর্বদাই তিব্বতী বলে। লাসার ব্যবসায়ী শর্বা-গল্লো এ রকম ঘটনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। লাসার নেপালীরা বলত শর্বা নেপালের প্রজা। শর্বা ছিল একজন ধনী এবং সফল ব্যবসায়ী। সে নিজেকে নেপালের প্রজা বলে জানত, তাই কথায় কথায় তিব্বত সরকারের বড় বড় আমলাদের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। কথায় কথায় তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করত। সমস্ত কিছুই আরও পল্লবিত হয়ে সরকারী আমলাদের কানে পৌছাত এবং বলা বাহুল্য তারা প্রায় প্রত্যেকেই শর্বার ওপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিছুদিন পর তারা একযোগে দলাই লামার কাছে নালিশ করল যে শর্বা মহামান্য তিব্বত সরকারের সম্পর্কে প্রকাশ্যে নানা ধরনের নিন্দামন্দ করে বেড়াচ্ছে। এ দিকে আবার ঐ সব আমলার দল শর্বার জন্মস্থান থেকে তার কিছু শত্রুকে লাসায় নিয়ে এল এবং তাদের দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ালো যে, শর্বা কোনো মতেই নেপালের প্রজা নয় সে তিব্বতেরই প্রজা। ফলে শর্বা তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়ে তিব্বত সরকারের কারাগারে চালান হয়ে গেলো। শর্বার গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে লাসাস্থিত নেপালী রাজদূত এ বিষয়ে তিব্বত সরকারকে বোঝাতে অসমর্থ হওয়ায়, নেপাল-সরকার স্বয়ং জানান যে, শর্বা নেপালের নাগরিক, অতএব তাকে যেন অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিব্বত সরকার জানালেন যে বিষয়টি একান্তভাবেই তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার। কারণ তাঁরা শর্বার তিব্বতী নাগরিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অতএব এ ব্যাপারে নেপাল সরকারের নাক গলানোর কোনো অধিকারই নেই। নেপাল সরকার এরপর দুই সরকারের যৌথ তদারকীতে শর্বার নাগরিকত্ব নির্ণয় করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিব্বত সরকার নানা রকম টালবাহানা করে অযথা সময় কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শর্বার প্রায় দু'বছর কারাদণ্ড ভোগ করা হয়ে গেলো। ১৯২৯ সালে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি যখন লাসাতে গিয়ে পৌছাই, তখন শর্বা জেলে। অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাহারাদারের অসাবধানতার সুযোগে শর্বা জেল থেকে পালিয়ে যায় এবং নেপালী দূতাবাসে আশ্রয় নেয়। ১৪ই অগস্ট ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেপালী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লম্বা-চওড়া চেহারা, ফর্সা রঙ, মুণ্ডিতমস্তক একজনকে দূতাবাসের প্রাঙ্গনে পায়চারি করতে দেখেছিলাম। পরে জানলাম সে বিতর্কিত নাগরিকত্বের অধিকারী শর্বা-গল্লো। শর্বার জেল থেকে পালানোর খবরে লাসাতে খুব হৈ চৈ পড়ে গেলো। শর্বার বিরুদ্ধবাদী কর্মচারীরা এতে আরও অপমানিত বোধ করলেন। যাদের হেফাজত থেকে শর্বা পালিয়ে ছিল প্রথমেই তাদের খুব কঠোর সাজা দেওয়া হলো। তারপর দলাই লামার কাছে অভিযোগের পর অভিযোগ

যেতে লাগল, বিষয় সেই এক শর্বা-গল্পো। অবশেষে তিব্বত সরকার শর্বাকে তাঁদের হাতে সমর্পণ করার জন্য নেপালী রাজদূতকে বললেন। রাজদূতের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এ দিকে লাসাতে ছোট-বড় মিলিয়ে শ' দেড়েকের মতো নেপালী ব্যবসায়ীর দোকান আছে। এ সমস্ত ঘটনা ঐ সমস্ত দোকানদারদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছিল। তারা বলাবলি করতে লাগল যে শর্বাকে যদি তিব্বত সরকারের কথামতো তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তা'হলে সংঘর্ষ অনিবার্য। তিব্বতীরা যদি দূতাবাস থেকে জোর করে শর্বাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় তা'তেও সময় লাগবে। কারণ লাসার নেপালী দূতাবাসও একেবারে শক্তিহীন নয়। কিন্তু তার ফলে শহরের অন্যান্য জায়গাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেপালীদের জানমানের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। ২৩শে অগস্ট কুচকাওয়াজের সময় দু'দল তিব্বতী সৈনিক নিজেদের মধ্যেই লড়াই বাধিয়ে বসল। এ দিকে সারা শহরে রটে গেলো যে শর্বাকে গ্রেপ্তারের জন্য তিব্বতী বাহিনী নেপালী দূতাবাসে পৌঁছে গেছে। নেপালীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়ে গেলো। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকান-পাট বন্ধ করে সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল কখন তাদের দোকানে লুঠতরাজ শুরু হবে। সকলেই এক মহাপ্রলয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে শুধুমাত্র ক্ষণ গুণছে।

আমার অবস্থাও তখন সঙ্গীন। লাসাতে পৌঁছাবার পর আমার থাকা-খাওয়া নেপালীদের সঙ্গেই চলছিল। লাসাবাসীরা আমাকেও নেপালী বলেই ধরে নিয়েছিল। অতএব নেপালীদের এই উদ্বেগ আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছিল বেশ গভীরভাবেই। বেলা দুটোর সময় দোকান-পাট বন্ধ হয়েছিল আর সেই তখন থেকে শঙ্কার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলাম। যাই হোক সে রাত্রিটাও ভালোয় ভালোয় কেটে গেলো, কিছুই ঘটল না। পরদিন আবার সকালে সকলে দোকান খুলল। এই যখন-তখন বন্ধ করা আবার খোলা এ রকম করে আরও দু'দিন কেটে গেলো। ২৭শে অগস্ট বেলা বারোটা নাগাদ আমি ছু-শিং-সার কুঠিতে বসে আছি, এমন সময় দেখি দক্ষিণ দিক থেকে ঝপাঝপ সমস্ত দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে ফুটপাতে যারা পসরা সাজিয়ে বসেছিল তারা পড়ি কি মরি করে সমস্ত জিনিসপত্র জড় করছে এবং কোনো মতে সেগুলোকে কাছাকাছি বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলছে। কি হয়েছে তা কেউ জানে না, একজন আর একজনকে যা করতে দেখছে, নিজেও তাই করে চলেছে। কিছুক্ষণ পর একজন সরকারী কর্মচারীর কাছে জানতে পারলাম, যে এ বার সত্যি তিব্বতী বাহিনী শর্বাকে গ্রেপ্তারের জন্য নেপাল দূতাবাস অবরোধ করেছে। নেপালীরা বলাবলি করতে লাগল —এই বার শুরু হবে লুটপাট। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে তিব্বতে বসবাসকারী নেপালীরা গোর্খা বংশোদ্ভূত নয়, এরা নেওয়ারী জাতিগোষ্ঠীর লোক, নেপালের প্রাচীন অধিবাসী। এদের এবং তিব্বতীদের মধ্যে ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু

কিছুতেই অনেক মিল আছে। এ সমস্ত কারণে নেপালীদের সকলেরই প্রচুর এ দেশীয় বন্ধু-বান্ধব আছে বিপদে পড়লে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার উপায় আছে। কিন্তু লুটপাট তো করবে উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা এবং সমাজবিরোধীর দল। সাধারণ মানুষ কখনও লুটপাটে অংশ নেয় না। অতএব গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করার মতো সাহায্য স্থানীয় মিত্ররা দিতে পারবে কিনা, তাই নিয়ে প্রায় সকলের মনেই সন্দেহ ছিল। তা'ছাড়া রাজরোষের ঝুঁকি নিয়ে কেউ সাহায্য করতে এগোবে কিনা তাই ছিল ভাববার বিষয়। তবে সে রাত্রিটা আর দুশ্চিন্তায় কাটাতে হলো না, সন্ধ্যে নাগাদ খবর পাওয়া গেলো যে শর্বা গ্রেপ্তার হয়েছে। নেপালী রাজদূত শর্বাকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোনো বাধা সৃষ্টি তো করেনইনি বরং তিনি নিজে শর্বাকে তিব্বতী বাহিনীর হাতে সমর্পণ করেছেন। অতএব এ বার মাভৈঃ। পরে নেপালী রাজদূতের তিব্বত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার আরও বিস্তারিত খবর এল, অবশ্য আমাদের সে সবে কোনো প্রয়োজন ছিল না। সকলেই নেপালী রাজদূতের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর বাস্তববুদ্ধির জন্যই লাসার নেপালী ব্যবসায়ীরা লুটপাটের হাত থেকে বেঁচে গেলো। লাসার নেপালী দূতাবাসে পঁচিশ-তিরিশ জন সেপাই আছে এবং যে পরিমাণ বন্দুক, গোলাবারুদ তাদের জিম্মায় আছে তাতে তিব্বতী সৈন্যবাহিনীর হামলাকে বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারত। দূতাবাসটি লাসার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সে জন্য বড় রকমের আক্রমণ চালাতে গেলে আশপাশের বাড়ি-ঘরের ক্ষতি হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সর্বোপরি সৈনিক হিসেবে নেপালীদের দক্ষতা তিব্বতীদের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের। কিন্তু রাজদূতের কাছে প্রশ্ন ছিল একটাই। একজন শর্বাকে রক্ষার জন্য কয়েক হাজার নেপালীর জানমান, ধনসম্পত্তির ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কিনা। বস্তুত ও রকম পরিস্থিতিতে রাজদূত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই ছিল সর্বাংশে ঠিক। তাঁর বিবেচনাবোধ কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।

এ দিকে পরপর কয়েকদিন হঠাৎ-হঠাৎ বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নানা রকমের গুজব লাসার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতের সমস্ত জায়গায় আরক্ষা বিভাগের সুবন্দোবস্তও নেই। হাঙ্গামা বাধলে তাকে থামানো মুস্কিল। অনেক সময় পুলিশ বা সৈন্য বাহিনীর লোকেরাও হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। সে জন্য ২০শে অগস্ট লাসার শাসন কর্তৃপক্ষ নেপালী এবং তিব্বতী দুই শ্রেণীরই নাগরিকদের এক জমায়েত ডাকলেন। সেখানে বক্তারা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে বললেন আর কোনো ঝগড়া বিবাদ নয়, বাজার কোনো মতেই বন্ধ রাখা চলবে না। যদি কেউ গুজব ছড়ায় বা অনাবশ্যক কারণে দোকান বন্ধ রাখে, তা'হলে সেটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই বক্তৃতায় কাজ হলো। দোকান এরপর আর বন্ধ হয়নি। শর্বার খবর এইটুকুই পাওয়া গেলো যে, তার ওপরে বেত্রদণ্ডের বিধান হয়েছে।

ভুশো ঘা বেতের আঘাত সে মুখবুজে সহ্য করেছে। বেত তার শরীরের মাংস কেটে কেটে বসে যাবার পরও সে বিন্দুমাত্র কাতরোক্তি করেনি। ১৭ই সেপ্টেম্বর খবর পেলাম যে বেত্রাঘাতজনিত ক্ষত দূষিত হয়ে শর্বা মারা গেছে।

উপরোক্ত কারণেই যুদ্ধের আবহাওয়া কিন্তু টিকেই থাকল। দু'পক্ষেই সৈন্য সজ্জা এবং অন্যান্য সামরিক প্রস্তুতি জোর কদমে চলছিল। তিব্বতে খবরের কাগজ নেই, কোনো ছাপাখানাও নেই। গুজবই এখানে সংবাদ পত্রের বিকল্প। বিলেতের কাগজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, সে দেশের তুলনায় এ দেশের গুজবের তবু খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। ৩১শে অগস্টের রটনায় শুনলাম নেপাল এবং তিব্বতের বিরোধ মীমাংসার জন্য সিকিমের বৃটিশ রেসিডেন্ট এখানে আসছেন। পরদিনই আবার খবর পেলাম, না দলাই লামা বৃটিশ রেসিডেন্টকে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি দেননি। নেপালে যুদ্ধপ্রস্তুতি কি রকম চলছিল তার যথাথ বিবরণ দিতে পারব না কিন্তু তিব্বতের যুদ্ধপ্রস্তুতির অন্যতম সাক্ষী হিসেবে আমি তখন লাসাতে উপস্থিত। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন দর্জীর খোঁজ করতে গিয়ে শুনি সরকার বাজারের সমস্ত জিন কাপড় কিনে নিয়েছেন এবং সমস্ত দর্জী এখন তাঁবু সেলাই করার হুকুম পেয়েছে। এ রকম খবরও রটল যে চীন এবং রাশিয়া উভয়েই তিব্বতের সাহায্যের জন্য আসছে। নেপালের খবর এটুকুই মাত্র পেলাম যে ধনকুটা, কুতী, কেরঙ প্রভৃতি যে সমস্ত সীমানা দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করা যায়। সে সমস্ত জায়গার অধিবাসীদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে এবং সৈনিকদের প্রয়োজনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার গম তারা ভারতবর্ষ থেকে কিনেছে। রাস্তায় রাস্তায় টেলিগ্রাফের তার বসিয়ে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং সীমান্তে সেনা প্রস্তুত। লাসার কথা তো আর কহতব্য নয়। রোজ সকাল দশটায় শহরের প্রধান সড়কে সৈনিকদের প্যারেড শুরু হলো। তিব্বতী সৈনিকদের যুদ্ধ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে নানা মুখরোচক খবরও আসতে লাগল। শুনলাম প্রত্যেকটি সৈনিকই নাকি বন্দুক পেয়েছে, অবশ্য বন্দুক ইংরেজ সৈনিকদের হাত-ফেরতা ও পরিত্যক্ত। সেই অস্ত্রে সাজানো হলো তিব্বতের সেনাদের। তারা বন্দুক তাক করতে লাগল। অবশ্যই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। সামরিক কুচকাওয়াজে ছেলে ছোকরারা প্রভাবিত হলো। লেফট রাইট করা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেলো। ব্যক্তিগত কাজে কোথাও গেলেও সৈনিক লেফট-রাইট করা ছাড়ল না। এমন হবার কারণ—এদের শিক্ষকগণ গ্যাংচীতে ইংরেজ-শিবিরে তালিম নিয়ে ছিলেন এবং এই ব্যাপারটাকে মন্ত্রের মতো ব্যবহার করতেন।

নেপালীদের কাছে কলকাতা আর নেপাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাফ আসার হিড়িক শুরু হলো। বক্তব্য ছিল একটাই, তিব্বত ছাড়ো। আমার গৃহকর্তার বড় ছেলে লাসা ছাড়লেন। যাবার আগে ছোট ভাই এবং কর্মচারীদের একটি বিশেষ সঙ্কেত চিহ্ন বলে গেলেন। ওই সঙ্কেতসহ চিঠি পাওয়া মাত্র সকলে যেন

সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে। কেন না জান বাঁচানোই আসল কথা।

লাসার সর্বত্র টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপিত হলো। কংস্ত প্রদেশগত মঙ্গোল-মুসলিম ব্যবসায়ীদের সব ক'টি খচ্চর কিনল তিব্বত সরকার। সামরিক তাগিদেই এমনটি করা হলো। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে লোক গণনা শুরু হলো, কারণ সামরিক বাহিনীতে যোগদান প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই বাধ্যতামূলক। ৬ই অক্টোবর সঙ্কেত বহন করে চিঠি এল।

দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে লাগল। লাসা থেকে একটি সেনাবাহিনী নেপাল সীমান্তের দিকে যাত্রা করল। জমিদার, জায়গীরদারদের সম্পদ-সম্পত্তির পরিমাপে সেনাবাহিনীতে লোক পাঠানোর নির্দিষ্ট সংখ্যা ঘোষণা করা হলো। তিব্বতে সমস্ত কৃষিযোগ্য ভূমি জমিদার, জায়গীরদারদেরই করতলগত। আপৎকালে সরকারকে সৈন্য সরবরাহ তাদের অন্যতম কর্তব্য। ১৯০৪ সালে ইংরেজ-তিব্বত যুদ্ধে এরাই সৈন্য সরবরাহ করেছিল। তিব্বতী সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈনিকদের দেখে পুরাণ-বর্ণিত মহাদেবের বাহিনীর কথা মনে পড়ে। কেউ বা ষাট বছরের বৃদ্ধ, কেউ বা পনের-ষোলো বছরের ছোকরা। উর্দির ক্ষেত্রে কোনো মিল-বাছাই বিবেচনা আছে বলে মনে হয় না —এমনই বে-খাপ্পা।

৪ঠা নভেম্বর আরেকদল সৈন্যকে যেতে দেখলাম। প্রতি দশ জন সৈনিক পিছু একটি তাঁবু এবং একটি করে বড় সাইজের চায়ের পাত্র দেওয়া হয়েছে। পরিচিত এক সরকারী আমলা বলল —লাসায় এখন সেনা'র বান ডেকেছে। সকলেই ফ্রন্টে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জবাবে বললাম —অবশ্যই তাদের বীরত্ব, দেশপ্রেম এবং জাতীয় চেতনা প্রশংসার যোগ্য। সে মন্তব্য করল —আপনিও যেমন! এরা যেতে চাইছে কারণ লাসায় বড় ভিড়, খাওয়া থাকার বেজায় কষ্ট এবং কিছু কিছু নিয়মরীতি মেনে চলতে হয়। ফ্রন্টে যাওয়ার সুবাদে লাসা পেরোতে পারলেই আর পায় কে। বন্দুক-গোলাগুলি নিয়ে পগার পার হয়ে যাবে। কার সাধ্য খুঁজে বার করে। এখানে তো আর আপনাদের দেশের মতো গ্রামে গ্রামে পুলিশী ব্যবস্থা নেই। এত উত্তেজনার মধ্যেও হাসি পেল।

২০শে নভেম্বর সিংহল থেকে ভদন্ত আনন্দের চিঠি পেলাম। বিষয় তিব্বত পরিস্থিতি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ধর্মানন্দ মহাস্থবির আনন্দের কাছে জানতে চেয়েছেন —তিব্বতের গোলমেলে পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে কিনা। এ জন্য এরোপ্লেন পাঠানো যায় কিনা। উত্তরে লিখলাম এখানকার লোকজনকে রেলগাড়ী কি বোঝাতে গলদঘর্ম হয়ে বলেছিলাম —রেলগাড়ী হলো এক ধরনের ঘর-বাড়ি, যা চলে বা দৌড়ায়। এ হেন পরিস্থিতিতে এরোপ্লেন এলে আরব্য উপন্যাস কিম্বা রূপকথার শরণ নিলেও হালে পানি পাব না।

তিব্বত সরকার টেলিগ্রাফ-লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি ইত্যাদির জন্য ভারতীয় ডাক-বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করে। সে সময় এ দায়িত্বে লাসায় ছিলেন একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসার শ্রী রোজমেয়ার। তিনি বার কয়েক আমার কাছে এসেছেন। একদিন তিনি বললেন যে, ইংরেজ সরকার দুই মিত্র দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগতে দেবে না। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি বিপরীত হয়ে উঠছে। নেপাল সরকার তিব্বতীদের যথোচিত শাস্তি না দিলে ঘুমোতে পারছে না, বলে জানিয়েছে। আর তিব্বত সরকার আসন্ন যুদ্ধে চীন আর রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের এমন স্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্য বলেছিলাম —আপনাদের তো রাশিয়ার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ নেই। আপনাদের চিঠি পৌছাতে না পৌছাতেই নেপালী-সৈনিকরা সারা তিব্বতে দাপাদাপি করে সব তছনছ করে দেবে!

দিনরাত একটা যুদ্ধকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছিল। অন্যদিকে সন্ধি হয়ে গেছে প্রায় এমন রটনাও শোনা যাচ্ছিল। আসলে এই শেষেরটাই ছিল সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা। ২১শে নভেম্বর ভারত-নেপাল সীমান্তের বীরগঞ্জ থেকে তার এল, 'নেপালের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো কারণ নেই, কাজ-কর্ম পূর্ববৎ চলুক'। কথায় কথায় এটা স্থানীয় নেপালীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ডুবন্ত মানুষ যেন হঠাৎ পায়ের তলায় মাটির খোঁজ পেল। দিন দশ-বারোর জন্য সবাই যেন আবার হাসিখুশী আনন্দের জগতে ফিরে এল। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিনটি থেকেই আবার হাওয়া ঘুরে গেলো। এ রকমই চলতে চলতে হঠাৎ সংবাদ পেলাম যে, নেপালের মহামন্ত্রী রাণা চন্দ্রসমশের-এর দেহান্ত ঘটেছে। রাণার মৃত্যু হয় ২৫শে নভেম্বর কিন্তু লাসার নেপালী মহল্লায় এই খবর এসে পৌছায় ২রা ডিসেম্বর। নেপালের মহামন্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে লামারা উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন —দেখলে তো কি রকম আমাদের মন্ত্র-তন্ত্রের জোর। দূর থেকেই শত্রু নিপাত করে দিলাম। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে দেখেছিলাম সৈনিকেরা সাধারণ মানুষের ওপরে অযথা অত্যাচার চালাত। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে দাম দিত না। অকারণে লুটপাট করত, তেমনই অবস্থার সূচনা এখানেও দেখতে পাচ্ছিলাম। ২৫শে ডিসেম্বর এক সৈনিক প্রবর কোনো একটি খাবারের দোকান থেকে খাবার খেয়ে বেরিয়ে আসছিল, বের হবার মুখে বেচারা দোকানদার অমন একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধার কাছে খাবারের দাম চাইবার ধৃষ্টতা দেখায়। ব্যস্, আর যায় কোথায়। সেই মুহূর্তে ধৃষ্ট দোকানদারের পেট শাণিত ছুরিকাঘাতে ফাঁসিয়ে দিয়ে তার এ হেন রাষ্ট্রবিরোধী কাজের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া হলো।

১৮ই জানুয়ারী ১৯৩০, এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পত্র নিয়ে একজন দূত এল লাসাতে। দূতকে স্বাগত জানাবার জন্য

তিব্বত সরকার চারশো সৈনিকের একটি বাহিনী এবং তার সঙ্গে নাচ-গানের একটি দল পাঠালেন। অতীতেও চীন সম্রাটের পত্রকে এভাবেই স্বাগত জানানো হতো। পত্রের বক্তব্য ছিল চীন এবং তিব্বতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন, সেই প্রাচীন সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য তিব্বত সরকার যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের এক প্রতিনিধি দল চীনের রাজধানী নানকিঙ-এ প্রেরণ করেন। এর পরের সপ্তাহেই একটি তিব্বতী কুমারী মেয়ে চীনের সাহায্যের আরও একটি বার্তা নিয়ে লাসায় এল। মেয়েটি জন্মসূত্রে তিব্বতী হলেও চীনেই বসবাস করত, বোধহয় চীনের রাজনৈতিক দল কুয়োমিনটাঙের সদস্যা ছিল। নিজেদের মোহনিদ্রা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালে তিব্বতীরা যে কি হয়ে উঠতে পারে, এই মেয়েটি ছিল তারই উদাহরণ।

চীনের এই ভূমিকায় বৃটিশ সরকারও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবীতে কোনো খবর পৌছাবার আগেই নেপাল যদি তিব্বত দখল করে নিত, তা'হলে সেটা হতো স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু এখন বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরেও জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এখন যদি নেপাল কিছু করে, আন্তর্জাতিক জনমত বলবে নেপালের ব-কলমে ইংরেজরাই তিব্বত আক্রমণ করেছে। অতএব এ রকম অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। ৭ই ফেব্রুয়ারী খবর পেলাম যে, দুই সরকারের মধ্যে পুনরায় আপোষ আলোচনা শুরু করবার জন্য বৃটিশ সরকারের তরফে সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা আসছেন। বিগত পাঁচ মাস ধরে এক নাগাড়ে যুদ্ধ এবং সন্ধির কথা আমরা শুনে আসছিলাম। তবে সন্ধির সর্বশেষ পাকা খবর বোধহয় লাসার নেপালীদের কাছে স্বয়ং তিব্বতী সরকারই পৌছেছিলেন! ১১ই ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই দেখতে পেলাম যে, লাসা থেকে বাইরে যাবার প্রতিটি সড়কের মুখেই পাহারাদার সেপাই খাড়া হয়ে গেছে এবং সর্বত্র হুকুম জারী হয়ে গিয়েছে যে, কোনো নেপালী প্রজা লাসার বাইরে এক পা-ও যেতে পারবে না। সন্ধির গুজব রটনার ব্যাপারে এতদিন যারা সবচেয়ে অগ্রণী ছিল, এই ঘটনায় তারা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এ যেন একেবারে শিরে সর্পাঘাত। গত পাঁচ মাস ধরে নেপাল এবং কলকাতা থেকে ক্রমাগত আসা চিঠি এবং টেলিগ্রামে 'চলে এস, সব ছেড়েছুড়ে' শুনেও যারা থেকে গিয়েছিল শুধু এই ভেবে যে, 'এত তাড়াহুড়োর কি আছে, সময় এলে ঠিক বেরিয়ে যাব, এত ধনসম্পত্তি ফেলে হুট করে চলে এস বললেই কি যাওয়া যায়' তারা এ বার দেখতে পেল যে লাসাতে তাদের যা অবস্থা তাতে তাদের স্বগৃহে অন্তরীণ বললেই ঠিক বলা হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে গ্যাংচী, শীগর্চী ইত্যাদি জায়গাতেও নেপালীদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহারই করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম তিব্বতী সৈন্যরা বন্দুক নিয়ে শহরের রাজপথে মার্চ করে বেড়াত, এ বার তারা কামান নিয়ে কুচকাওয়াজ করা আরম্ভ করল। সন্ধির পক্ষে এটাও একটা বড়

প্রমাণ ছিল বৈকি! তিব্বতী সরকারী কর্মচারীরা এ বার বুক ফুলিয়ে জোর গলায় বলে বেরাচ্ছিল, —আসুক না নেপাল, এখন আমরা আর একলা নই, চীনের দূত লাসা পৌঁছে গেছে। আবার এ দিকে বৃটিশ দূত লে-দন-লা সম্পর্কেও খবর এল যে তিনি ছু-শুর (লাসা থেকে দু' দিনের পথ) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু সর্দার বাহাদুর এলেই বা কি হবে। চারদিকের যা অবস্থা তাতে সন্ধির আশা সকলের মন থেকেই উবে গিয়েছে। সকলেরই স্থির বিশ্বাস, এ বার একটা কিছু হেস্তনেস্ত না হয়ে যায় না। গুজব শুনছিলাম যে মহাগুরু দলাই লামা নাকি কোনো কারণে আগে থেকেই সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা-র প্রতি বিরূপ, সে জন্যই তাঁর দৌত্যের সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এমন কি এ রকমও শোনা গেলো যে, দলাই লামা লে-দন-লাকে পত্রপাঠ ছু-শুর থেকেই বিদায় করে দিয়েছেন। তবে এ সমস্ত গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা লাসাতে এসে পৌঁছালেন। অনেকেই তাঁর আগমনে অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেল। সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা কিন্তু লাসায় পৌঁছেই তাঁর কাজ আরম্ভ করে দিলেন। মহাগুরু দলাই লামা এবং তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলতে লাগল। আলোচনার খবর নানাভাবে পল্লবিত হয়ে লাসার বাজারে উড়ছিল কিন্তু তার মধ্যে সন্ধি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাসও পাচ্ছিলাম না।

১লা মার্চ প্রতিপদে তিব্বতী নববর্ষ পড়ল কিন্তু কোথাও কোনো আনন্দ উচ্ছ্বাস চোখে পড়ল না। কি তিব্বতী, কি নেপালী সকলের মধ্যেই হতাশার কালো মেঘ। ১১ই মার্চ শুনলাম সর্দার বাহাদুরের সন্ধি প্রস্তাব তিব্বত সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে এবং এ বার তা নেপাল সরকারকে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু তার মাত্র কয়েকদিন পরেই ১৬ই মার্চ গুজব শোনা গেলো যে, সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। আবার ১৭ই মার্চ সর্দার বাহাদুরের ফিরে যাবার গুজবটি সমস্ত মহল থেকেই অসমর্থিত হলো। ১৮ই মার্চ আমি আমার ডায়েরীতে লিখেছিলাম —যুদ্ধের সম্ভাবনাই বেশী, তবে অভিজ্ঞ এবং আশাবাদীদের মত যেভাবেই হোক সন্ধি হয়ে যাবে। ১৯শে মার্চ কলকাতা থেকে আবার চিঠি এল সব ছেড়ে চলে যাবার বার্তা নিয়ে। কিন্তু এখন আর যাওয়া চলে না কারণ আমরা তো নজরবন্দী। ২২শে মার্চ দুপুরবেলা সরকারীভাবে সন্ধির খবর সমর্থিত হলো। তখন নেপালীদের খুশীর বহর না দেখলে বোঝানো যাবে না। প্রত্যেকেই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ৩১শে মার্চ লাসার পথ-ঘাট থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হলো।

তিব্বতের রাজনৈতিক আকাশে বিগত সাত মাস ধরে যুদ্ধের যে কালো মেঘ জমে ছিল এবং যে যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাকে শান্ত করার কৃতিত্ব একমাত্র সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা-র। প্রকৃতপক্ষে সর্দার বাহাদুর যে সময় লাসায় এসে পৌঁছেছিলেন, তখন রোগ প্রায় চিকিৎসার বাইরে চলে গিয়েছিল। কেউ আশাও

করতে পারেনি যে, সর্দার বাহাদুর তাঁর কাজে সফল হতে পারবেন। কিন্তু যেভাবেই হোক সফল তিনি হলেনই। তাঁর এই শান্তি-দূতের ভূমিকায় সফল হবার পেছনে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত তিনি নিজে জাতিতে তিব্বতী এবং ধর্মে বৌদ্ধ। তা'ছাড়া তিনি তিব্বতীদের রীতিনীতি, মানসিকতা খুব ভালো করেই বুঝতেন, সর্বোপরি তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম। তাঁর এই দৌত্য ব্যর্থ হলে, পরিণামে কি হতো জানি না, তবে লাসার জনমণ্ডলীর সামনে ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের প্রকাশ্যে শাস্তিবিধান করার নেপালী শর্ত, তিব্বত সরকার কখনই মেনে নিতেন না। সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা অনেক ধৈর্য ধরে সমস্ত ঘটনার গতিপ্রকৃতি এবং পরিণাম ও তার প্রতিক্রিয়া ভালো মতো সকলকে বোঝাতে পেরেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই তাঁর মতে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত যা ঘটনার প্রাত্যহিক বিবরণ দিলাম তা পড়ে কেউ যেন এ কথা ভেবে না বসেন যে, আমি সে সময় সংবাদ সংগ্রাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম। আসলে আর পাঁচ জনের মতো আমিও প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম, আর সে জন্যই বোধহয় আশপাশে যে আলোচনাই হোক না কেন, মন দিয়ে শুনতাম, যদি কিছু আশা করবার মতো খবর পাই। যাই হোক সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই কয়েক হাজার নেপালী প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা পেল। কে বলতে পারে যে নেপাল-তিব্বত যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য বৃহৎ শক্তির রাজনৈতিক দাবা খেলার আখড়ায় পরিণত হতো না এবং এই যুযুধান দেশ দুটি হয়ত দাবার বড়েতে পরিণত হতো। চীন তো মাঠে নেমে পড়েছিলই প্রায়, তার পেছন পেছন আরও যে কারা নেমে পড়ত তা এখন বলা না গেলেও কার্য ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। লে-দন-লা যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা যদি কোনো ইংরেজ কর্মচারীর দ্বারা হতো, তা'হলে তার কপালে যথেষ্ট খেতাব-টেতাব জুটে রাতারাতি তাকে সংবাদপত্রের শিরোনামে প্রতিষ্ঠিত করে দিত। অন্যান্য পুরস্কারের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু পরবর্তী কালে শুনেছি, লে-দন-লা-র এই কৃতিত্বের যতখানি কদর হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। পরাধীন জাতির এটাই দুর্ভাগ্য।

ষষ্ঠ পর্ব

লাসার ডায়েরী

তিব্বতী সাহিত্য অধ্যয়ন

১৩ই জুলাই ১৯২৯, আমি লাসা পৌঁছেছিলাম, আর ২৪শে এপ্রিল ১৯৩০, আমি লাসা ছেড়ে চলে আসি। এর মধ্যে আমার আসার কথা এবং এ দেশের যুদ্ধ নামক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত পরিবেশের কথা আগের অধ্যায়েই লেখা সারা হয়েছে। লাসা এক রহস্যময়ী নগরী, কত কথা লেখা যায় এর সম্বন্ধে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক কষ্ট করে অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ দেশে এসেছি, শুধু সেই বিষয়ের কথাই লিখছি। মহাগুরু দলাই লামার কাছ থেকে লাসাতে বাস করবার অনুমতি পেয়ে আমার মনে যে কি আনন্দ হলো তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। যে ঝুঁকি এবং বিপদ ঘাড়ে করে এ দেশে প্রবেশ করেছিলাম, দলাই লামার অনুমতি পেয়ে তা সার্থক হলো।

এ বার আমার লেখাপড়ার কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাতে পারি। আমার অধ্যয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি ছিল বেশ দীর্ঘ মেয়াদের। ঠিক করেছিলাম তিন বছর তিব্বতে থেকে লেখাপড়ার কাজ শেষ করে তারপর এখান থেকে চীন এবং জাপানে যাব। তিব্বতে আসার আগে বইপত্র দেখে সামান্য কিছু ভোট বা তিব্বতী ভাষা আমার শেখা ছিল। লাসায় আসবার পথে সর্বত্রই তিব্বতী ভাষাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করতে হয়েছে। তার ফলে এ দেশের ভাষার চলিত রূপটা এখন আমার মোটামুটি আয়ত্তে, কিন্তু আমার প্রয়োজন তো সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু অজানা সম্ভার অনূদিত রয়েছে। ঠিক করলাম প্রথমে সংস্কৃত এবং তিব্বতী এই দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে যে সমস্ত গ্রন্থ, পুঁথিপত্র তারই খোঁজ করব, এর ফলে আমার ভাষা শেখবার ব্যাপারটাও সহজতর হবে। আমার কাছে বোধিচর্যাবতারের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ মজুত ছিল। একদিন বাজারে গিয়ে দেখি বেশ কিছু লোক বিভিন্ন বইয়ের পৃষ্ঠা নিয়ে বসে আছে। শুনলাম এরা হলো পর-বা অর্থাৎ ছাপাওয়ালা। মুদ্রণ ব্যবস্থার আদি জন্মস্থান চীন দেশে। বর্তমানে যেভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে শীলমোহর ব্যবহার করা হয় আদি কালে ছাপার ব্যবস্থাও ঐ রকমই ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত সম্রাট স্রোঙচেন-সগেম-পো চীনের রাজকুমারীকেও বিবাহ করেছিলেন যুদ্ধে জেতার

শর্তানুসারে, আর তখন থেকেই তিব্বত এবং চীনের মিত্রতার যাত্রা শুরু হয়েছে যা আজও বর্তমান। চীন দু' দু'বার এই দেশকে নেপালের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এ দেশের লোকেরা বেশভূষা, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বহু বিষয়ে চীনের অনুকরণ করে থাকে। বস্তুত তিব্বত ব্যবহারিক জীবনে চীনের কাছে ততটাই ঋণী যতটা আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবর্ষের কাছে। মুদ্রণ শিল্প চীন দেশ থেকে কবে নাগাদ এ দেশে এসেছে তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়, তবে তিব্বতের ইতিহাসে এটুকু তথ্য পাওয়া যায় যে, পঞ্চম দলাই লামা সুমতি সাগরের সময়ে (১৬১৬—১৬৮১ খৃ:. পর্যন্ত) বিশ লক্ষ শ্লোক সম্বলিত মহাগ্রন্থ কঞ্জুর এবং তঞ্জুর (যেখানে অধিকাংশই ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ) ছাপার কাজ শেষ হয়েছিল। তারও আগে ছোট-বড় অনেক পুঁথিপত্র ছাপবার জন্য খোদাই করা কাঠের ফলক তৈরি হয়েছিল। আজকাল তো সমস্ত মঠেই এ ধরনের মুদ্রণ-ফলক রয়েছে। লাসার পর-বা গোষ্ঠী প্রয়োজন মতো নিজেদের কাগজ কালি খরচ করে মঠ থেকে পুস্তক ছাপিয়ে নিয়ে আসে। অবশ্য মঠের মুদ্রণ-ফলক ব্যবহার করার জন্য তাদের কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। এখানে যারা বই ছাপে, তারাই বই বিক্রী করে। জো-খঙ (লাসার প্রাচীনতম এবং প্রধানতম মন্দির)-এর উত্তর ফটকের বাইরে অন্তত বিশ জন এ রকম পুস্তক বিক্রেতার দেখা পাওয়া যাবে।

বোধিচর্যাবতারের তিব্বতী সংস্করণ সংগ্রহ করবার আগে আমার মাথায় অন্য একটা খেয়াল এসে বাসা বাঁধল। মনে হলো যদি সংস্কৃত ভাষায় বইটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বইতে ব্যবহৃত শব্দের তিব্বতী প্রতিশব্দ সংগ্রহ করে রাখি, তা'হলে ভবিষ্যতে তা থেকে তিব্বতী-সংস্কৃত অভিধান তৈরি করা অনেক সহজ হবে। ১৩ই অগস্ট থেকে আমার কাজ শুরু করেছিলাম। বেশ কয়েক মাসের চেষ্টার ফলে বোধিচর্যাবতার, স্রগ্ধরাস্তোত্র, ললিতবিসার, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, করুণাপুণ্ডরীক, অমরকোষ, ব্যুৎপত্তিঅষ্টসহস্রিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বইগুলো দেখা শেষ হলো। এর মধ্যে কিছু বইপত্র আমি নিজেই সংগ্রহ করেছিলাম, আর অবশিষ্ট কিছু বইয়ের হাতে লেখা সংস্কৃত অনুবাদ দু-শিঙ-সা-র মন্দিরে পেয়ে গিয়েছিলাম, এখনও আমার সূত্র, বিনয়, তন্ত্র, ন্যায়, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চাশটির মতো বই এবং একশোরও বেশী ছোট নিবন্ধ দেখা বাকী ছিল। আমি আমার অভিধানটির জন্য পঞ্চাশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ কারণে সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ, আমাকে আমার তিব্বত বাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সে দেশ ছেড়ে আসতে হয়। যাই হোক প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ওই অল্প সময়ের মধ্যে অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। আজ পর্যন্ত তিব্বতী-ইংরাজী অভিধানেও এটাই সর্বোচ্চ শব্দ সংগ্রহ।

শব্দকোষ তৈরির কাজ করতে গিয়ে আমার সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় কঞ্জুর এবং তঞ্জুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। লাসার মুরু নামের মঠটি এ সময় তাঁদের নিষ্ঠা এবং কাজকর্মের জন্য যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছিল। এই মঠটি চোঙ-খ-পা-র আসনের অন্যতম দাবিদার রিম্পোছের অধীনে। এখানে একটি হাতে লেখা তঞ্জুর ছিল। আমার সৌভাগ্য যে সহজেই সেটি দেখবার অনুমতি পেয়ে গেলাম। কয়েকদিন মঠে যাতায়াতও করলাম। মঠের ভেতরের কুঠরিগুলো অন্ধকার তার ওপর সে সময়টা অক্টোবরের মাঝামাঝি, ঠাণ্ডাও পড়েছিল প্রচণ্ড। ঠাণ্ডাতেই কাবু হয়ে পড়ছিলাম, পড়াশোনার আর অবকাশই পাচ্ছিলাম না, তখন বাধ্য হয়ে মঠের কর্তাদের কাছে গ্রন্থটি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে যাতে পড়তে পারি তার অনুমতি চাইলাম। ভাগ্য এ বারও সুপ্রসন্ন সন্দেহ নেই, কারণ এই প্রার্থনাটিও মঞ্জুর হলো। মুরু মঠের তঞ্জুর গ্রন্থটি তিন-চারশো বছর আগে লেখা। সেটি দেখে মনে হচ্ছিল, গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে কোনো মানুষের হাতের ছোঁয়া তাতে পড়েনি, কারণ পুঁথিটির বেষ্টনীর চারদিকে এক আঙুল পুরু ধুলো জমে ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম যে বইটি যেমন যেমন বেষ্টনীতে সাজানো আছে, তেমন তেমন ভাবেই পড়া শুরু করব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে দুশো পঁয়ত্রিশটি বেষ্টনীর মধ্যে কিছু কিছু আমি আগেই পড়েছি, সেগুলি বাদ দিতে পারি। অতএব সেগুলোকে আলাদা করে রাখবার জন্য সমস্ত বেষ্টনীই খুলে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে সাজিয়ে ফেলা প্রয়োজন। এই কাজের জন্য যতটা জায়গার প্রয়োজন, আমার ঘরে তা নেই। অগত্যা আমি নেপালী সাহুদের বৈঠক যেখানে হতো তার পশ্চিম দিকের একটি ঘরে চলে এলাম। এই ঘরটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভোর বেলাতেই ঘরের ভেতরে রোদ চলে আসে। এর ফলে ঘরটিকে আমার বাস কক্ষের চেয়ে বেশী গরম বোধ হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লাসার গুদড়ী বাজার থেকে মঙ্গোলিয়ান ছাটের পোস্তীনের লম্বা একখানা চোগা কিনে ফেলেছিলাম। নতুন ঘরটিতে আসবার আগে পর্যন্ত সাহুর অতিথি হিসেবেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম এখন আমাকে আরও অনেক দিন এ দেশে থাকতে হবে অতএব এটা আর ভালো দেখায় না। সাহুকে সে কথা বলতেই উনি খুবই দুঃখিত হলেন, কিন্তু আমার কথা না মেনেও তাঁর কোনো উপায় ছিল না। এমনিতেই এই ধর্মমান সাহুর পরিবার খুব অমায়িক সজ্জন এবং অতিথিবৎসল। তাঁদের কুঠির একখানা ঘর সর্বদাই অতিথি অভ্যাগতদের জন্য আলাদা করা থাকে। যাই হোক মাথায় পশমী কান ঢাকা টুপী, গায়ে পোস্তীনের মঙ্গোলিয়ান চোগা তার ওপরে আবার চুকটু ইত্যাদি চাপিয়ে যদিও কোনো রকমে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেলাম, কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখি হাত ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। অতঃপর মঙ্গোলিয়ান উটের লোমে তৈরি এক জোড়া দস্তানা কিনে ফেললাম। এরপর লাসাতে শীতের প্রকোপ

পরবর্তী মাসগুলোতে আরও বেড়েছে কিন্তু আমাকে আর কাবু করতে পারেনি। ১৪ই ডিসেম্বর দুপুরবেলা তাপমাত্রা ছিল চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, সেখানে ২০শে জানুয়ারী তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াল কুড়ি ডিগ্রীতে। দুপুর বেলাই যখন এমন অবস্থা তখন রাত্রিবেলার হাল সহজেই অনুমেয়। গাছের পাতা ঝরার মরশুম শুরু হয়ে যায় অক্টোবর মাসের প্রথম দিক থেকেই। নভেম্বর মাসে চারদিকে শুকনো কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে গাছগুলো। এ সময় কোথাও এক বিন্দু সবুজের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। রাত্রিতে ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে যেত। একদিন তো লেখার সময় দেখি কলম আর চলছেই না, প্রথমে কি যে হলো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি, পরে দেখি কলমের নিবের আগায় কালিও জমে বরফ হয়ে গেছে। কয়েকবার সেটিকে অন্য কিছু ভেবে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টাও করেছিলাম। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দোয়াত কলম ছেড়ে ফাউণ্টেনপেন ব্যবহার করতে শুরু করলাম। এরপর অবশ্য আর কোনো সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়নি।

তিব্বতের রাজনৈতিক মঞ্চ

লাসায় পৌঁছাবার পর আমি যে লাদাখী বা নেপালী নই, একজন ভারতীয় এই পরিচয় প্রকাশ পাবার পর ইংরেজদের গুপ্তচরেরা আমার সম্বন্ধে খানিকটা সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। আমার চিঠিপত্র প্রকাশ্যেই আদান-প্রদান করতাম। প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতাম যে আমার চিঠিপত্র এসে পৌঁছাতে অযথা বিলম্ব হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখি স্থানীয় ডাকঘরেই সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে আটক থাকছে। আমার বন্ধুরা কয়েকজন লোকের নাম করে বলে দিয়েছিলেন যে, এরা এরা ইংরেজের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে। একজন রায়সাহেব —নামটা এখন আর ঠিক মনে নেই, শুধুমাত্র এই গুপ্তচরবৃত্তি করবার জন্যই লাসাতে রয়েছেন। যদিও আমার নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত অবশ্যই ছিল বা আছে তবুও তখন কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়া আমার নিজের কাছেই অনধিকার চর্চা বলে মনে হতো। আমার কাজ ছিল কেবল এ দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। কিন্তু সরকারকে আবার এই সমস্ত ব্যাপার কবেই বা বোঝানো গেছে। তাদের যা ভাববার আগেই ভেবে নেবে। ২৭শে অক্টোবর স্বয়ং রোজমেয়ার সাহেব নিজে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। গ্যাংচী-গ্যাংটক টেলিগ্রাফ লাইনের একজন ইঞ্জিনীয়ার, এই ছিল তাঁর পরিচয়। সে বছর লাসা-গ্যাংচী টেলিগ্রাফ লাইনে কিছু খুঁটি বদলাবার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়, তিব্বত সরকার এঁকে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ধার স্বরূপ এখানে এনে রেখেছেন। এ হেন রোজমেয়ার সাহেবকে হঠাৎ আমার কাছে আসতে দেখে বুঝলাম, এ নিছক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার নয়, এর অন্তরালে আরও কিছু আছে। তবে

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভদ্রলোকের ব্যবহার খুবই অমায়িক। প্রথমেই আমি কি করছি-টরছি ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন করেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। যাই হোক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আমার কিন্তু একটা লাভই হয়েছিল। উনি সম্প্রতি প্রকাশিত মিঃ. ফার্সিবন লেণ্ডনের 'নেপাল' নামে বইটির দুটি খণ্ডই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বইটি আমি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়েছিলাম। নেপাল সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বইটির সমাদর তো হবেই, এবং বইটি ওই সময়ে আমার খুবই কাজে লেগেছিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা আপাতত দূর হলেও তিব্বত কিন্তু ইংরেজ, চীন এবং রুশ এই ত্রয়ীর রাজনৈতিক পাঞ্জা কষার আখড়া হয়েই থাকল। লাসার সে-রা, ডে-পুঙ ইত্যাদি মঠগুলো রুশ এলাকার মঙ্গোলে ভর্তি। অবশ্য এর দ্বারা আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি না যে, তাঁদের সকলেই রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িত। তবে যে হারে বিদেশী লোকেরা ঐ সমস্ত জায়গায় কতকটা আত্মগোপন করে থাকার মতো অবস্থায় রয়েছে, তা থেকে কেউ যদি ভেবে নেয় যে এরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এ দেশে এসেছে, তা'হলে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আমি একজন রুশী মঙ্গোলকে জানতাম, তাকে দেখতাম লাসাতেই খুব জাঁকজমকের সঙ্গে থাকতে, পরে জানলাম সে রুশী হলেও লাল (বলশেভিক) নয়, সে শ্বেত রুশ এবং তার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বর্তমানে চীনের সঙ্গেই বেশী।

মহাযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) কিছুকাল আগে তিব্বত চীনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে এবং সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে ইংরেজরা। এর আগে যখন দলাই লামা তিব্বত ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁকে যে সাহায্য করেছিলেন সেটা তিনি কখনই ভোলেননি। পরবর্তী কালে সুযোগ এলে, তিনি সেই উপকারের প্রতিদান দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলেই ইংরেজরা এ দেশে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিব্বতে ইংরেজদের খুবই রমরমা অবস্থা ছিল। চীনকে এ দেশ থেকে তাড়ালেও, তিব্বত সরকার এবং তার বন্ধুরা সকলেই জানেন যে, চীনের এই চলে যাওয়াটা চিরকালের জন্য নয়, নেহাৎই সাময়িক পশ্চাদাপসরণ। সুযোগ পেলেই সে আবার এ দিকে ফিরে তাকাবে এবং সে সময় তাকে বাধা দেবার জন্য আগে থেকে তৈরি থাকা চাই। তারই প্রস্তুতিস্বরূপ সামরিক বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা সে সময় দার্জিলিং পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন। তিব্বতে পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য তাঁকেই লাসা পাঠানো হলো। তার আগে লাসায় পুলিশী ব্যবস্থা বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। সর্দার বাহাদুর এসে প্রথমেই পুলিশ বিভাগে উর্দি এবং অন্যান্য নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করলেন। পুলিশের ব্যাপারটি কোনো

মতে ঢুকলেও, ঝামেলা বাধল সামরিক বিভাগকে নিয়ে। তিব্বত এক বিরাট দেশ, কাশ্মীর থেকে চীন, ব্রহ্মদেশ থেকে রুশ ও চীনা-তুর্কিস্থান পর্যন্ত এর সীমা বিস্তৃত। সুতরাং চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের কমে কোনো বাহিনী গড়া বৃথা। প্রথমত, সমস্ত সৈন্য বাহিনীর অর্ধেকের বেশী লেগে যাবে এই বিশাল সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দিতে। তিব্বতের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন জমিদার, ভূস্বামীরাই সৈন্য বাহিনীতে লোক যোগায়। সারা দেশটাই অবশ্য ছোট-বড় জমিদারদের মধ্যে ভাগ করা। তার মধ্যে সিংহ ভাগ আবার বড় বড় মঠের। সৈন্য বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার জন্য মঠগুলোর কাছে টাকা চাওয়া মাত্রই তারা পাল্টা এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করে দেখাল যে, কি কষ্টে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ কোনো ক্রমে পালন করে চলেছে। অর্থাভাবে মঠের ভিক্ষুদের জীবনধারনই এখন প্রাণান্তকর সমস্যা। এর ওপর উদ্বৃত্ত টাকা তারা কোথায় পাবে যে, সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজনে দেবে। সরকার থেকে এরপর যখন বলা হলো ওসব ফাঁকিবাজির হিসেব দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, আর অর্থাভাবের কাঁদুনি গাইলেও চলবে না, টাকা দিতেই হবে। তখন সমস্ত মঠাধিকারীই ধরে নিল, এ সমস্ত কূটবুদ্ধি ইংরেজরাই তাদের ধর্মপরায়ণ সরকারকে শিখিয়ে পরস্পরের সম্পর্ককে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। না হলে তাদের ঐ পবিত্র হিসেব পেশ করবার পরও অবিশ্বাস করার মতো কাজ দলাই লামা কখনই করতেন না। ব্যস, ইংরেজদের বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠতে শুরু করল। জমিদার, ভূস্বামীরাই দেশটাকে চালায়, আর দলাই লামা তো তাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি মাত্র। অতএব যখন ভূস্বামীরা বিরূপ হয়ে গেলো তখন থেকেই ইংরেজদের ভাগ্যরবিও অস্তাচলে যাত্রা শুরু করল। ইংরেজ প্রতিনিধি স্যর চার্লস বেল বৃথাই এক বছর লাসায় কাটিয়ে অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। তবে এই সমস্ত পরিকল্পনার নীট ফল হলো এই যে, কিছু সৈন্য লেফ্‌ট-রাইট করা শিখে ফেলল। তা'ছাড়া বৃটিশ সরকার কয়েক হাজার পুরানো বন্দুক দিয়ে তিব্বতী বাহিনীকে সাজিয়ে ছিল, বেচারা ইংরেজ, নেপোলিয়নের ভাষায় ব্যবসাদারের জাত, অথচ আজও পর্যন্ত তিব্বতীদের কাছ থেকে ওই বন্দুকের দাম আদায় করতে পারেনি, সবটাই তাদের লোকসান। টশী লুন-পো-র মঠের ওপর যখন টাকা দেবার জন্য সরকারী নির্দেশনামা এসে পৌছাল, টশী লামা খুব দৃঢ়ভাবে তার প্রতিরোধ করলেন। ফলে ঘটনা এমন দাঁড়াল যে দলাই লামার সঙ্গে টশী লামার বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাল। ফলে টশী লামা দেশ ছেড়ে চীনে পালিয়ে গেলেন। টশী লামা আজও দেশে ফিরে আসেননি, চীনেই থেকে গিয়েছেন। সৈন্য বাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ শুধু ব্যর্থই হলো না—গোটা দেশ জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। সর্দার বাহাদুরের পুলিশ বিভাগ মোটামুটি ঝামেলা এড়িয়ে বেশ চলছিল কিন্তু প্রতিরক্ষা বিভাগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এ বার পুলিশ বিভাগেও আছড়ে পড়ল। সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন এবং স্মার্ট দেখাবার জন্য পুলিশ বিভাগে বড় বড় চুল রাখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লাসাতে কোনো খবরের কাগজ না থাকায় জনমতের যথার্থ প্রতিফলন পাবার কোনো উপায় নেই কিন্তু দেখা গেলো কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি হয়ত জনগণের অসন্তোষের কারণগুলিকে ছড়ায় গেঁথে বাজারে ছেড়ে দিলো। ব্যস, আর যায় কোথায়, একদিনের মধ্যেই সেটা সারা শহরময় যেভাবে প্রচারিত হয়ে পড়ে, তা দেখলে আমাদের দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রও আশ্চর্য হবে। তারপর সেই ছড়া ছোট ছোট ছেলেদের মুখে মুখে ফিরতে থাকবে এবং মাস খানেকের মধ্যেই দেশের সুদূর প্রান্তে কিম্বা দুর্গমতম অঞ্চলেও পৌছে যাবে। এ রকম নজীর আছে, যেমন লাসার শো-গং বংশ খুব ধনী এবং অভিজাত। সেই বংশের বর্তমান প্রতিনিধি যিনি, তিনি আবার তিব্বত সরকারের একজন দে-পোন (জেনারেল)। ভদ্রলোকের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী এবং একটি সন্তান থাকা সত্বেও, একটি রক্ষিতায় আসক্ত ছিলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী এ সমস্ত সহ্য করতে রাজি হলেন না। তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করলেন। আদালত ভদ্রমহিলার পক্ষে শুধু বিচ্ছেদ মঞ্জুরই করেনি, ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য কিছু অর্থ এবং স্বল্প পরিমাণে সত্তু মাখন ঐ জেনারেলের জন্য বরাদ্দ করে দিয়ে বাকী সমস্ত সম্পত্তি ভদ্রমহিলাকে দিয়ে দেয়। এই নিদারুন ভাগ্য বিপর্যয়েও কিন্তু জেনারেল মহাশয় তাঁর রক্ষিতাটিকে ত্যাগ করেননি। নিজের বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছেড়ে, লাসার দরিদ্র মহল্লায় তিনি একটা ছোট বাড়ি নিয়ে বাস করতে থাকেন। কেউ হয়ত এই ঘটনার মধ্যেই চমকপ্রদ কিছু খুঁজে পেয়েছিল, কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনাটি ছড়াবন্দী হয়ে বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই লাসার সমস্ত ছেলে-ছোকরার দল শো-গং-এর দে-পোন-এর লু (গীত) মহানন্দে গেয়ে বেড়াতে লাগল। ফলে এমন হলো বেচারা দে-পোন বহু দিন ঘরের বাইরেই বের হতে পারেন নি। আমি যখন লাসায় পৌছাই তখন দে-পোন-এর ঘটনাটি পুরানো হয়ে গিয়েছিল তবু তখনও দু'চার জন ঐ ছড়াটি গাইত। সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা পুলিশ বাহিনীর বড় চুল ছোট করতে গিয়ে এ রকম ছড়া-গানের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। গানটির প্রথম দুটি লাইন এখনও আমার মনে আছে।

লে-দন লামা ম-বে। জু-নিশু ঢাবা ম-বে
য়া-মী গোম্বা ম-বে। টং-শার...

অর্থাৎ :

লে-দন কোনো লামা নন, পুলিশও তো ভিক্ষু নয়
য়া-মী (পুলিশ হেড কোয়ার্টার) ও কোনো মঠ নয়
তবে কেন চুল কাটব।

তিব্বতে একমাত্র ভিক্ষুরাই মুণ্ডিতমস্তক, বাকী সকলেই লম্বা চুল রাখতে অভ্যস্ত।

তিব্বতের বিদ্যালয়

লাসার ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ অফিস একই বাড়িতে অবস্থিত। এখন যে জায়গায় বাড়িটা বর্তমান, কিছুদিন আগেও নাকি স্তন-দ্গে-গ্লিং মঠটি ওখানে ছিল। ওটি ছিল লাসার চারটি বিখ্যাত মঠের অন্যতম। বাকী তিনটি মঠ হলো কুন-দে-গ্লিং, ছে-মা-গ্লিং এবং ছে-ম্ছোগ-গ্লিং। প্রথম মঠটির মোহান্তরা দলাই লামার নাবালক অবস্থায় তিব্বতের শাসনকর্তা ছিলেন। চীন এবং তিব্বতের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন ঐ মঠের প্রধান মোহান্তের সঙ্গে চীনের গোপন সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার ফলে মঠটিকে ধ্বংস করে তার প্রতিটি ইট পাথর পর্যন্ত খুলে ফেলা হয়, যাতে কোনো চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। বলা বাহুল্য, মোহান্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই স্তন-দ্গে-গ্লিং মঠের খালি জায়গাটিতেই বর্তমানে ডাক বিভাগের বাড়ি তৈরি হয়েছে। একদিন ওখানে গিয়ে শুনলাম পাশেই রাজপরিবারের (দলাই লামার) চিকিৎসক বাস করেন। তাঁর বাড়ি গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম, উনিও একজন ভিক্ষু। চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া উনি জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চাও করে থাকেন এবং প্রতি বছর তিব্বতী ভাষায় একটি পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন কাঠের ফলকে সে বছরের পঞ্জিকা খোদাই করা চলছিল। ভদ্রলোকের সংস্কৃত ভাষায় বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও দেখলাম সম্পূর্ণ চান্দ্র ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম প্রকরণ ঝটপট বলে দিচ্ছিলেন, রাজকীয় চিকিৎসক মশাই আবার এখানকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষও বটেন। চিকিৎসা বিদ্যালয়টির অবস্থান ছিল লাসার উঁচু পাহাড়ের ওপরে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে একমাস লাসায় ঘুড়ি-ওড়ানো উৎসব চলে। এই খেলাটি সম্ভবত নেপালীরাই এ দেশে এনেছে। তবে এই ঘুড়ি ওড়ানো উপলক্ষে প্রচুর হাঙ্গামাও হয়ে থাকে। একদিন দেখি কাটা ঘুড়ি ধরা নিয়ে জনৈক ঢাবা (ভিক্ষু) এবং একজন পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে। অবশেষে পুলিশ পুঙ্গব ঝগড়ার নিষ্পত্তির জন্য রাস্তা থেকে বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে ঢাবার মাথায় এমনভাবে আঘাত করল যে বেচারা ওখানেই মরে পড়ে রইল।

ডে-পুঙ মঠ আমার আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। এরপর সে-রা মঠ দেখতে যাওয়া স্থির করলাম। একজন মঙ্গোল পণ্ডিত গে-শো (অধ্যাপক) স্তন-দর আমার সঙ্গে ছিলেন। সে-রা মঠ লাসা থেকে উত্তরে প্রায় মাইল তিনেক দূরে। শহরের বাইরে বেরিয়ে সামান্য একটু কর্ষণযোগ্য ভূমি, তার পরই এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। ক্ষেতগুলো সবই শূন্য, কারণ ফসল কাটার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন চলছে মাড়াই-ঝাড়াই-এর কাজ। দেখলাম কাছের একটা গ্রামে এই কাজ

চলছিল। একদিকে মাখন চা তৈরি হচ্ছিল আর একদিকে চমরীর সাহায্যে চলছিল মাড়াই-এর কাজ। সকলেই কাজের মধ্যে গুনগুন করে গান গাইছিল। এ দেশের মানুষেরা বড় সরল এবং আবেগপ্রবণ। যে কোনো কাজেই, তা ভেড়া বা চমরী চরানোই হোক কিম্বা ক্ষেত-খামারের কাজই হোক অথবা সরকারী বেসরকারী বেগার মেহনৎ করাই হোক, কাজ করতে করতে ওরা গান গেয়ে থাকে। গ্রাম ছাড়িয়ে ক্ষেত-খামারের সীমানা পেরিয়ে দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। যখন এ দেশে চীনের প্রভাব ছিল তুঙ্গে সে আমলের বাড়ি ওটা। ওই বাড়িকে কেন্দ্র করে বিরাট চাষ-আবাদ হতো এখানে। সে সময় ওই বাড়িতে একজন চীনা ভিক্ষু থাকতেন। এখন অবশ্য ওটা ফাঁকাই পড়ে আছে। এরপর শুকনো বন্ধুর মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছে গেলাম। সামনেই সে-রা মঠ। ডে-পুঙ বিহারের মতো সে-রা মঠকে কেন্দ্র করেও পাঁচ-ছ' হাজার লোকের একটা ছোটখাট নগরীর পত্তন হয়েছে। ডে-পুঙ বিহারের মহান্ চোঙ-খ-পা-র শিষ্য জম-য়ঙ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে এই বিহার বা মঠটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। চোঙ-খ-পা-র অন্য আর একজন শিষ্য শাক্য-য়ে-শো ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে এই বিহারটিকে চালু করেন। ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত টশী-লুন-পো মঠটি তৈরি করেন তাঁর তৃতীয় শিষ্য এবং প্রথম দলাই লামা সেই গে-ছন-গ্যং-ছো। ছাত্র সংখ্যায় ডে-পুঙ বিহারের পরই সে-রা মঠের স্থান। বিহারে ভিক্ষুর সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশী। তিব্বতে এ ধরনের সমস্ত বড় বড মঠেরই নিয়ম-কানুন একই ধরনের। ছাত্ররাও নিজেদের অঞ্চল, দেশ অনুসারে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বাস করে। এই মঠে খন-পো (অধ্যক্ষ) আছেন পাঁচ জন কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি তিনটি ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে ড া-পা নামক বিভাগে শুধু তন্ত্রশাস্ত্র পড়ানো হয়ে থাকে। সে-রা মঠে ৩৪টি খম-সন্ আছে। এই খম-সনগুলি অনেকটা অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির মতো। জুনিয়র অধ্যাপকদের বলা হয় গের-গেন এবং সিনিয়র অধ্যাপকদের গে-শো বলা হয়। ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা এবং বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান করে। বিক্রমশীলা এবং নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসের দুশো বছর পর এই বিহার স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ। বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য সে যুগে তিব্বতী ছাত্ররা কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে যাতায়াত করেছে। সম-য়ে বিহারটি তো একেবারে ওদন্তপুরী বিহারের ছাঁচে তৈরি। তিব্বতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেখলে মনে হবে যেন আমাদের দেশের সেই বিখ্যাত নালন্দা বা বিক্রমশীলা বিহার। আজও এখানে পড়াবার সময় বসুবন্ধু, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতির কথা আলোচিত হয়। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, শিক্ষা ব্যবস্থার এই ধারাটা এরা পেয়েছে ভারতের সেই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির কাছ থেকে। তবে আলোর নীচেই তো অন্ধকারের স্থান। বর্তমানে যারা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাদের অধিকাংশই নিষ্কর্মা গোছের, কোনো মতে দিনগত পাপক্ষয় করে এখানে কাটাচ্ছে। তবে সামান্য কিছু ছাত্র এখনও আছে, শিক্ষা যাদের কাছে সত্যই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ছাত্ররা এখানে প্রবেশ করেই ড-ছুঙ-এ নাম লেখায়। নিয়মিত সম্মেলনে যোগদান করা এবং সেখানে চা-এর ব্যবস্থা করাটাও ছাত্রদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই বেশী উৎসাহ ঐ দিকে চলে যাওয়ায় পড়াশুনার ব্যাপারে কিছুটা ভাঁটা পড়েই। হয়ত কিছু অধ্যাপক পড়াতে এবং কিছু ছাত্র ঐ সমস্ত কাজ করেও শিক্ষালাভে আগ্রহী, তবে সে রকম ছাত্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ড-ছুঙ-এর যিনি প্রধান তিনিই খন-পো পদাভিষিক্ত হন। আগে যোগ্যতার ভিত্তিতে খন-পো বাছাই করা হতো, কিন্তু এখন যোগ্যতার চাইতেও সুপারিশের জোর বেশী। আমার লাসায় থাকাকালীন সময়েই সে-রা মঠে একজন খন-পো-র আসন খালি ছিল। পদটির জন্য প্রার্থীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। সে-রা মঠের ন্যায়শাস্ত্রের যিনি অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু সে-রা মঠে নয়, ডে-পুঙ বিহার, এমন কি সারা তিব্বত ছাড়িয়ে, সুদূর মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সর্বজন স্বীকৃত গে-শোকে তাঁর ছাত্ররা খন-পো পদের জন্য প্রার্থী হতে অনুরোধ জানাল। সাধরণত এ সমস্ত ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী থাকলে পরস্পরের মধ্যে, শাস্ত্র এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য গে-শো ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রার্থী হতে স্বীকৃত হলেন এবং শাস্ত্র বিচারের প্রতিযোগিতাতেও জয়ী হলেন। কিন্তু খন-পো নির্বাচনের শেষ রায় দেন স্বয়ং দলাই লামা এবং সেখান থেকে কোনো কিছু মঞ্জুর করিয়ে আনতে গেলে, দলাই লামার পারিষদদের প্রথমে সন্তুষ্ট করতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের। কারণ এমনিতে দলাই লামার পারিষদবর্গ যতই আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করুন না কেন, উৎকোচ ছাড়া এক পাও নড়েন না। খন-পো পদপ্রার্থী গে-শো ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রদের বললেন —যতক্ষণ যোগ্যতা এবং জ্ঞানের প্রশ্ন ছিল ততক্ষণ আমি আমার ভূমিকা পালন করবার যথাযথ চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখন ঘুস দিয়ে খন-পো হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, তা'ছাড়া ও রকমভাবে খন-পো পদে যেতে আমার বিবেকে বাধে। শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল জানি না, তবে লোকে বলাবলি করত, যে টাকা খরচা করতে পারবে সেই খন-পো পদ লাভ করতে পারবে, তার যথাবিহিত জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। আমি নিজে একবার ম্নদ ড-ছুঙ-এর খন-পো মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে ভদ্রলোকের উক্ত পদে আসীন হবার পেছনে উৎকোচের ভূমিকাটিই ছিল প্রধান। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন ছিল গৌণ।

কিছু কিছু দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই বিহার গুলোই সুদূর অতীত কাল থেকে আজও পর্যন্ত এ দেশে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা

ধরে রেখেছে। যদি এর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করা যায়, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার সুপরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা'হলে বিশ্বের অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এরা স্বচ্ছন্দে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে এগুলোকে ব্যবসার আখড়া বললেই ভালো হয়। প্রত্যেক বিহারের নিজস্ব জমিদারী আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ, আদায়, তহশীল ইত্যাদি করতে করতেই অধ্যক্ষ মহাশয়দের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। তা'ছাড়া দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই মঠগুলোর বেশ ভালো রকমের ভূমিকা থাকে। নানা রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক শলাপরামর্শের জন্য প্রথমে মঠাধ্যক্ষদেরই ডাক পড়ে। ডে-পুঙ-এর মতো সে-রা বিহারেও সোনা-রূপোর তৈরি বিশালাকৃতির প্রদীপ আছে যা সারা দিন রাতই জ্বালানো থাকে। দেবতাদের স্তূপ এবং ভূষণে সোনা, রূপো, মণি, মুক্তা, ফিরোজা, মুগা ইত্যাদির ছড়াছড়ি। এখানকার পাঠ্য বিষয় হলো পাঁচটি মূলগ্রন্থ যেমন (১) বিনয়কারিকা, (২) অভিসময়ালঙ্কার, (৩) অভিধর্মকোষ, (৪) মাধ্যমিক-কারিকা, (৫) প্রমাণবার্তিক এবং এর ওপর লিখিত আলোচনা। এ সমস্ত কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একটি ছাপাখানাও আছে।

১৩ই অক্টোবর, আমি তখন সে-রা মঠে, শুনতে পেলাম রে-ডিঙ মঠের অবতারী লামা এখানেই উচ্চ শিক্ষার জন্য রয়েছেন। আচার্য দীপঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান শিষ্য ডোম-তোন ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে এই মঠ স্থাপন করেন। প্রথমে আমাকে অনেকেই বলেছিল যে, ওখানে ভারতবর্ষ থেকে আনা বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র সংরক্ষিত আছে। পরে খোঁজ-খবর করে জেনেছিলাম যে বিহারটির লাগোয়া একটি পাহাড়ে কতকগুলো পাথর প্রকৃতির খেয়ালে এমনভাবে সাজানো আছে, যে দূর থেকে বই বলে ভুল হয়। লোকে সেই ভুলটিকেই প্রচার করে বেড়ায়। যাই হোক, এই সমস্যা সমাধানের জন্য রে-ডিঙ-এর অবতারী লামার কাছে গেলাম। ওর বয়স আঠার-উনিশ হবে এবং বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে মনে হলো। এ দেশে অবতারী লামাদের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের দেশের রাজকুমারদের মতোই বলা যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেও তাদের সেবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক চাকর-বাকর থাকে। অধ্যাপকদের সঙ্গেও এরা রাজকুমারদের মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে সুতরাং লেখাপড়া যে কতটা হয় তা সহজেই বোঝা যায়। বইপত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় সে বলল —বইপত্র তো বিশেষ কিছু নেই, তবে এক হাত লম্বা এবং প্রায় ঐ রকমই মোটা তালপাতার পুঁথির বাণ্ডিল আছে অনেকগুলো। শুনেছি ওগুলো নাকি আচার্য দীপঙ্করের নিজস্ব সংগ্রহ ছিল, পরে শিষ্য ডোম-তোন ওগুলোকে রে-ডিঙ মঠে নিয়ে আসেন। আমার পড়াশোনার পাট শেষ হতে এখনও দেড় বছর লাগবে, তারপর আমি রে-ডিঙ-এ ফিরে যাব, তখন আমার সঙ্গে দেখা করলে পুঁথিপত্র সব দেখাতে পারবে। অবতারী লামার কথা শুনে মনে হলো এ রকম হওয়া অসম্ভব নয়। আমি ঠিক করেছিলাম রে-ডিঙ মঠে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য-

বশত দেড় বছর শেষ হবার আগেই আমার দেশে ফিরে যাবার তাগিদ এল। যদি সত্যি সত্যি ঐ পুঁথির বাণ্ডিল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের হয়ে থাকে তবে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই বুদ্ধগয়া, সম-য়ে বিহার ইত্যাদিতে বসে লেখা কিছু হিন্দী কবিতা কিম্বা গীত অবশ্যই থেকে থাকবে।

* * *

২৪শে নভেম্বর তিব্বতী দশম মাসের নবমী তিথিতে সে-রা মঠের সংস্থাপক জম-য়ঙ-এর মৃত্যুদিন ছিল। সারা শহরে এবং আশপাশের পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলিতেও তাঁর স্মরণে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। পরদিন ছিল আবার চোঙ-খ-পা-র মৃত্যুদিন। সে দিনও আবার সর্বত্র দেওয়ালীর মতো প্রদীপ-সজ্জা। এ দেশে কোনো মনীষীর স্মৃতিকে এভাবে প্রদীপ জ্বেলে স্মরণ করাই প্রথা। শহরের দীপাবলীর সমারোহ নিঃসন্দেহে সুন্দর। কিন্তু দূরের পাহাড়ী গ্রামের কুটিরের এবং ছোট-খাটো মঠের দীপসজ্জা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। মন্ত্রী পরিষদেরও অনেকে রাস্তায় বেরিয়েছেন আলোকসজ্জা দেখতে। রাস্তায় প্রচুর লোকের ভিড়। কিন্তু এত ভিড় সত্ত্বেও পথে মহিলাদের নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব দেখতে পেলাম। সাধারণ শ্লীলতাহানির কথা বাদই দিলাম, তার চেয়েও গুরুতর অপরাধের সংবাদ পেলাম পরে। আসলে যুদ্ধের আশঙ্কায় শহরে জমায়েত সৈন্য দলই ছিল এ সমস্ত অসভ্যতার জন্য দায়ী।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একজন নতুন নেপালী ডীঠা (বিচারক) লাসায় এলেন। উনি ভালোই ইংরেজী জানতেন। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর ছেলেকে সংস্কৃত শেখাবার অনুরোধ করে বসলেন। সে অনুরোধ রাখতেই হলো। ছাত্রটি খুবই বুদ্ধিমান এবং চৌকস। তবে সংস্কৃত শেখার মতো বইপত্র কাছে না থাকায় সমস্তটাই প্রায় লিখে শেখাতে হতো। এর মধ্যে আমার আরও একটি ছাত্র জুটল। এই নতুন ছাত্রটি নেপালী নয়, চীনা। একেবারে বিশুদ্ধ চীনা আজকাল লাসায় বিরল। এ ছেলেটির বাবা চীনা, মা এ দেশীয়। এ ছেলেটি অন্য আধা-চীনা ছাত্রদের পড়ায় এবং সরকারী দপ্তরে চীনা ভাষায় কোনো চিঠিপত্র এলে তার অনুবাদের কাজও মাঝে মধ্যে করে থাকে। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হলো আমি ছেলেটিকে ইংরেজি শেখাব, পরিবর্তে সে আমাকে চীনা ভাষা শেখাবে।

তিব্বতে কোনো সংবাদপত্র নেই, তবে প্রতিসপ্তাহেই কোনো না কোনো ঘটনার বর্ণনা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেইসব খবর যথেষ্ট মুখরোচক হবার ফলে সকলেই বেশ আগ্রহ সহকারে শোনে। এমনই এক ঘটনার মাধ্যমে জানা গেলো যে জনৈক ভিক্ষু অফিসার এবং তার রক্ষিতা কঙছি লম্বরকে গ্রেপ্তার করে লাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ দেশের প্রচলিত প্রথা হলো, কোনো দলাই লামার মৃত্যু হলে পরে, সারা জীবনে তিনি যত সোনা, রূপো, রত্নাদি এবং অন্যান্য জিনিস ভেট পেয়েছিলেন, তার সবটাই পুঁতে রেখে তার ওপরে একটা স্তূপ তৈরি করা হয়।

প্রতি তৃতীয় বছরে ভিক্ষু অফিসারদের একজন এককভাবে এই স্তূপগৃহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পায়। যে ভিক্ষু অফিসারটি গ্রেপ্তার হয়েছে তার নাম চি-টুঙ। তিন বছর আগে তাকে সপ্তম দলাই লামার মৃত্যুতে নির্মিত স্তূপাগারের ভার দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম দলাই লামা সুমতিসাগর (১৬১৬-১৬৮১ খৃ:.) ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের শাসন-ক্ষমতায় আসেন। তখন থেকে বর্তমান একাদশ দলাই লামা মুনিশাসনসাগর (থুব-বস্তন-র্গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৮৭৪ খৃ:.) পর্যন্ত মোট আট জন দলাই লামা তিব্বতের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে সপ্তম দলাই লামা (ভদ্রকল্পসাগর) স্কল-বস-র্গ্যা-ম্ছো, জন্ম ১৭০৮ খৃ:. একমাত্র দলাই লামা যিনি পূর্ণমাত্রায় ভিক্ষু হয়েছিলেন। ইনি প্রাসাদ ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের ওপর এক ছোট কুটিরে বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে কোনো সেবক বা অনুচরও ছিল না। সপ্তম দলাই লামার স্তূপে রক্ষিত মহার্ঘ ধনরত্নাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গত তিন বছর থেকে চি-টুঙ-এর ওপর ন্যস্ত ছিল। দার্জিলিং থেকে আসা চার-পাঁচটি তিব্বতী সুন্দরী মেয়ে তখন লাসায় ছিল। আসলে এরা ছিল এক ধরনের বারবণিতা। লাসার লোকেরা এদের নামের পেছনে লম্বর (নম্বর) শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। কি কারণে দিয়েছিল জানি না। চি-টুঙ-এর রক্ষিতা কঙছি লম্বরও তাদেরই একজন। এদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল। লোকে দেখতে পেত যে কঙছি লম্বরের মতো একজন বারবণিতা মেয়ে পঁচিশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী দামের মুক্তোর শিরোভূষণ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতেও কারও সন্দেহ হয়নি যে চি-টুঙ স্তূপের মনিরত্ন বিক্রি করছে। সপ্তাহখানেক আগে যখন চি-টুঙ-এর কার্যকালের তিন বছর পূর্ণ হলো এবং তার অন্যত্র বদলির হুকুম এল, তখন সে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তার রক্ষিতা কঙছি লম্বর সহ ঘোড়ায় চড়ে চীন অভিমুখে পালাল। চি-টুঙ যদি চীনের পথে না গিয়ে দার্জিলিং-এর রাস্তা ধরত, তা'হলে দিন দশ-বারোর মধ্যেই সীমানা পার হয়ে যেতে পারত। কারণ লাসাতে তার খোঁজ পড়ল সে পালাবার তিন সপ্তাহ পরে। কিন্তু ওরা আরও নির্বোধের মতো প্রায় দু'সপ্তাহ লাসা এবং তার আশপাশের গ্রামে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, পান-ভোজন, স্ফূর্তি-টুর্তি করে কাটায়। যখন খবর শুনল, যে লাসায় সরকারী মহল থেকে তাকে খোঁজা হচ্ছে এবং সে জন্য তার নামে হুলিয়াও জারি করা হয়েছে তখন আত্মগোপন করার জন্য লাসা থেকে দু'তিন দিনের রাস্তা একটা নির্জন জঙ্গলে তারা দু'জনে লুকিয়ে রইল। কয়েকদিন ঐভাবে কাটলেও ক্ষুধার তাড়নায় তাদের বাইরে বেরোতেই হলো। খাবারের সন্ধানে কাছাকাছি লোকালয়ে যাওয়া মাত্রই তারা গ্রেপ্তার হলো। লাসায় ধরে এনে প্রথমেই তাদের দু'জনকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করা হলো। তখন চি-টুঙ তার সঙ্গে আরও যারা যারা জড়িত ছিল তাদের সকলের নাম প্রকাশ করতে শুরু করল। দামী জিনিসের অধিকাংশ ততদিনে কলকাতা হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে প্যারিসের কোনো অভিজাত

গৃহের সংগ্রহের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। বড় বড় মুক্তো দিয়ে তৈরি একটা মালা যে ব্যবসায়ীটির সহযোগিতায় তিব্বতের বাইরে পাচার করা হয়েছিল, সে তো ঝামেলা দেখে, একেবারে তিব্বত ছেড়ে নেপালে সরে পড়ল। কিছু কিছু ছোট-খাটো জিনিস চি-টুঙ আবার তার বন্ধু-বান্ধবদের দান-খয়রাতও করেছিল। ঐ সমস্ত জিনিস যাদের কাছে ছিল তাদের অনেকের পুরো সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো। চি-টুঙ এবং তার বান্ধবী অবশ্য প্রথমেই বন্ধু-বান্ধবদের ফাঁসাতে চায়নি। তবে মারের চোটে ভূত পালায় মানুষ তো কোন ছার। জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রচণ্ড মারধরের ফলে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে আরও কিছু নতুন স্বীকারোক্তি করল চি-টুঙ। এই স্বীকারোক্তির মধ্যে বেচারা মোতিরত্নের নামটিও ছিল। ৪ঠা এপ্রিল বিকেল তিনটে নাগাদ দেখি একদল ঘোড়-সওয়ার 'হঠ যাও' 'রাস্তা থেকে সরে যাও' বলে চিৎকার করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। আমি তখন ছু-শিঙ সা-র কুঠিতে বসে। ঘোড়-সওয়ার বাহিনীতে তিব্বত সরকারের কিছু অফিসার, সিপাহী ছাড়া মহাগুরু দলাই লামার সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী দো-লিং-ছেম্পো, তা-লামা এবং নেপালী রাজদূত ছিলেন। সমগ্র-বাহিনী আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে মোতিরত্নের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চি-টুঙ বলেছিল যে, সে এখানে একটি মূল্যবান পেয়ালা বিক্রি করেছে। তাকেও সঙ্গে করেই আনা হয়েছিল। সে নিজেই দোকানের কোন জায়গাতে পেয়ালাটি রাখা ছিল, সেটা দেখিয়ে দিলো। তল্লাশীতে পেয়ালাটি বেরিয়ে পড়ল। আরও জানা গেলো যে, চি-টুঙ লাসা ছেড়ে পালাবার আগে মোতিরত্নের দোকানে একটা বড় সিন্দুকের মধ্যে কয়েকরাত্রি কাটিয়ে গেছে। যাই হোক মোতিরত্নও গ্রেপ্তার হয়ে নেপালী হাজতে চলে গেলো। তিব্বতের মেয়েদের বহুপতিত্বের প্রথা অনুসারে একই মহিলা লাসার প্রধান পুলিশ কর্মচারী এবং মোতি-রত্নেরও স্ত্রী ছিল। ফলে সেই পুলিশ অফিসার এবং তার স্ত্রীও গ্রেপ্তার হয়ে হাজত-বাস করতে লাগল। বস্তুত বহু লোক এই স্তূপগৃহের সম্পত্তি তছরূপের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল এবং আমি তিব্বতে থাকাকালীন এ মামলার নিষ্পত্তি হয়নি।

আমার আর্থিক সমস্যা

আমার এ দেশে থাকা বা না-থাকার ব্যাপারে কিছু ঠিক করতে পারিনি। এর আগে শ্রীলঙ্কা থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে বইপত্র কেনবার জন্য কিছু টাকা পাঠাবার কথা ছিল। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল, যত সত্বর সম্ভব বইপত্র কিনে আমি যেন সিংহলে ফিরে যাই। প্রস্তাবটি মোটেই আমার মনঃপুত ছিল না। এত কষ্ট করে, কত ঝুঁকি নিয়ে এ দেশে এসেছি, আর এখন এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাব? কিন্তু গত চার মাস ধরে অনেক চেষ্টা করেও কোনো বিহারে থাকবার

ব্যবস্থা করতে পারলাম না। এ দিকে আবার নেপাল-তিব্বত যুদ্ধের সম্ভাবনাও দিনকে দিন বেড়ে চলছিল। এ দেশে থাকার জন্য যে খরচপত্র লাগবে তারও কোনো পাকা ব্যবস্থা তখনও করে উঠতে পারিনি। বাধ্য হয়ে শ্রীলঙ্কায় চিঠি দিয়ে জানালাম যে, প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করেই আমি এ দেশ ছাড়ছি। সময়ও কি বিচিত্র! যখন দুঃসময় আসে তখন মনে হয় এ যেন এক অন্তহীন কাল, চারদিকে শুধু নিরাশা। আবার যখন আশার আলো দেখতে পেলাম তখন চারদিক থেকেই শুধু সুসময়ের বার্তা আসতে লাগল। শ্রীলঙ্কায় চিঠি পাঠাবার পরই বন্ধুবর আনন্দের চিঠি পেলাম। তাঁর চিঠি থেকে জানতে পারলাম, এখান থেকে পাঠানো আমার রচনার প্রথম কিস্তি (সেই রচনার সঙ্কলিত রূপই বর্তমান গ্রন্থ) সিংহলের প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা দিনমনি'তে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা আমাকে পরবর্তী প্রতি কিস্তি লেখার জন্য পনের টাকা দক্ষিণা দিতেও স্বীকৃত হয়েছেন। পরবর্তী কালে দক্ষিণার পরিমাণ আরও বাড়বার সম্ভাবনা আছে। আমার পক্ষে এখন ওই পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে এক কিস্তি লেখা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, অথচ এর ফলে আমার আর্থিক সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। ইতিমধ্যে ১৯শে ফেব্রুয়ারী আচার্য নরেন্দ্রদেবের চিঠি পেলাম, তিনি লিখেছেন—কাশী বিদ্যাপীঠ আমার এ দেশে থাকা-খাওয়ার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং বইপত্র কেনার জন্য দিচ্ছেন আরও পনেরশো টাকা, আমি যেন এ দেশে থেকে আমার সব কাজ সাঙ্গ করে তবেই দেশে ফিরি। আমারও তো তেমনই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সিংহলে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি অতএব কি আর করা যাবে! এ রকম একটা দোটানার মধ্যে যখন আমার দিন কাটছে তখন টেলিগ্রাম পেলাম যে, শ্রীলঙ্কা থেকে পাঠানো দু'হাজার টাকা ছু-শিঙ-সা-র কলকাতার গদীতে জমা পড়েছে। এ বার বইপত্র কেনায় মন দিলাম। এ দিকে যুদ্ধাবস্থা এবং আরও নানা কারণে তিব্বতী টঙ্কার মূল্য কমে যাওয়ায় আমার পক্ষে কম টাকায় অধিক সংখ্যক বই কেনা সহজ হলো। আমার বই কেনার খবর প্রচার হতেই নতুন, পুরানো বইপত্র, হাতে লেখা পুঁথি এবং কয়েকটি চিত্রপট আমার কাছে এল। প্রথমে আমার ছবি কেনার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না, কেন না ও ব্যাপারে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কয়েকটি চিত্রপটের শিল্পনৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করল এবং আমার আগ্রহও সে দিকে বৃদ্ধি পেতে লাগল। একদিন খবর পেলাম যে, এক জায়গায় তেরখানা দুষ্প্রাপ্য ধরনের পট আছে। দেখতে গিয়ে, সেগুলো আমার খুব পছন্দ হয়ে গেলো। পটের মালিক এক-একখানার দাম চাইল পঁচিশ টাকা করে। আমার নেপালী বন্ধুরা বলল—সবুর করুন, দেখবেন দাম আরও কমে যাবে। আপনার ব্যস্ততা দেখে লোকটা দাম বেশী হাঁকছে। তাঁদের কথামতো তিন-চার দিন সবুর করলাম, কিন্তু দাম কমাবার কোনো আগ্রহ পটের মালিকের তরফ থেকে দেখতে পেলাম না। তখন

দুষ্প্রাপ্য পটগুলো হাত-ছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে পঁচিশ টাকা দরেই তেরখানা পট কিনে ফেললাম। তেরটি পটের মধ্যে একটির বিষয়বস্তুই ছিল কেবল অনৈতিহাসিক। এটি ছিল অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রতিকৃতি। পরবর্তী কালে প্যারিসের চিত্রকলাবিশেষজ্ঞগণ এই পটটির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। বাকী বারোটি পটের সব কটিই ছিল বিভিন্ন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে আঁকা। লাসার মন্দিরের সামনে সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো (৬১৮-৬৯৮ খৃ:), টি-স্রোঙ-ল্দে-ব্‌চন (৮০২-৮৪৫ খৃ:) ডোম-তোন-পা (১০০৩-১০৬৪ খৃ:), পোত-পা (১০২৭-১১০৪ খৃ:) চোঙ-খ-পা (১৩৪৬-১৪১৮ খৃ:) এবং প্রথম থেকে সপ্তম দলাই লামা। খুঁজতে খুঁজতে একটি পটের পেছনে এগুলোর অঙ্কনকালও পেয়ে গেলাম। সপ্তম দলাই লামার (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) সময়ে এগুলো আঁকা হয়েছিল। পটগুলোর নীচের দিকটা ছিল অষ্টাদশ শতকের রাশিয়ান কিংখাবে (মখমল) মোড়া। পটগুলো কেনার পর একজন নেপালী ব্যবসায়ী ঐ কিংখাবের টুক্‌রোগুলোর জন্যই চারগুণ দাম দিতে চাইল। তখন মনে হলো যে লণ্ডন কিম্বা প্যারিসে এই পটগুলোর দাম পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আমার সংগ্রহে তখন পর্যন্ত দেড়শো চিত্রপট জমেছে। তার মধ্য থেকে তিন-চারখানা পট বেছে জার্মানীতে আমার বন্ধু, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক, রুডল্‌ফ অটোর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সেখানকার সংগ্রহশালায় রাখবার জন্য। কিছু কিছু পট দু'চার জন বন্ধু-বান্ধবকেও দিতে হয়েছে। কারন তাঁদের আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অবশিষ্ট প্রায় একশো চল্লিশখানা পট পাটনা মিউজিয়ামকে দিয়ে দিলাম। আজও সেগুলো ওখানেই সুরক্ষিত আছে। বইপত্রের সংগ্রহের মধ্যে খম (পূর্ব তিব্বত), মঙ্গোলিয়া, এমন কি সাইবেরিয়াতে ছাপা বই এবং হাতে-লেখা পুঁথি আমার কাছে জমা হয়েছিল। এ ছাড়াও কিছু মূর্তি এবং এ দেশের পূজায় ব্যবহৃত হয় এমন কিছু বাসনপত্রের নমুনাও সংগৃহীত হলো। লাসাতে তঞ্জুর গ্রন্থাবলীটির কোনো কপি পেলাম না। কঞ্জুরের দু'তিনটি মুদ্রিত কপি দেখতে পেয়েছিলাম। তার এক কপি পছন্দও করেছিলাম। দাম চাইলে সাড়ে সতের দোর্জে। খুব বেশী চায়নি, কিন্তু আমি তখনও হাতে-লেখা, কিম্বা খম প্রদেশের দে-র্গী মঠে ছাপা কঞ্জুরের সন্ধানে ছিলাম। দে-র্গী মঠের ছাপার কাজ সবচেয়ে ভালো। এরপর সপ্তাহ ছয়েক সম-য়ে বিহারে কাটিয়ে ফিরে এসে কঞ্জুরের সেই কপিটিকেই সাড়ে সতের দোর্জে দিয়ে কিনলাম, কারণ আমার বাঞ্ছিত জিনিসটি কিছুতেই যোগাড় করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে তিব্বতী টঙ্কার দাম আরও কিছু পড়ে যাওয়ায় আরও কিছুটা লাভ হয়ে গেলো।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে লাসায় খানিক বরফ পড়ল। তবে রোদ উঠলেই তা গলে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডার কিন্তু কোনো কমতি ছিল না।

সপ্তম পর্ব

নববর্ষ উৎসব

চব্বিশ দিনের জন্য সরকার বদল

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম দলাই লামা মঙ্গোলিয়ার সম্রাট গু-শী খানের কাছ থেকে তিব্বতের শাসনভার লাভ করেন। তিব্বতের ভাগ্যবিধাতা হবার আগে তিনি ছিলেন ডে-পুঙ বিহারের একটি ড-ছঙ-এর খন-পো (অধ্যক্ষ)। তিব্বতের শাসন ক্ষমতায় বসে তিনি তাঁর বিহারের খ্যাতি এবং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর নববর্ষের শুরু থেকে চব্বিশ দিন পর্যন্ত লাসা তথা সারা তিব্বতের শাসনভার ডে-পুঙ বিহারের ভিক্ষুদের হাতে ছেড়ে দিতেন। সে নিয়ম আজও চলে আসছে। এখন অবশ্য বিহারের সমস্ত ভিক্ষু শাসনের কাজে অংশ নেয় না, তা সম্ভবও নয়। এখন সমস্ত ভিক্ষুদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি ওই ভার গ্রহণ করে। এই চব্বিশ দিনের জন্য লাসা নগরী সরকারী পুলিশ, আদালত ইত্যাদির আওতার বাইরে থাকে। নেপালী ছাড়া, অন্য সব ব্যবসায়ীকেই এই চব্বিশ দিনের জন্য নতুন করে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। এ ব্যাপারে কোনো ভুল হয়ে গেলে জরিমানা তো আছেই, দৈহিক নির্যাতনেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তিব্বতে পুলিশ হাজত থাকলেও স্থায়ী কোনো কারাগার নেই। এখানকার অধিবাসীদের বক্তব্য কারাগার থেকে কর্তৃপক্ষের লাভ করবার কোনো সুযোগ নেই, আর যেখানে লাভ নেই সেখানে তিব্বত সরকারের কোনো ভূমিকাও নেই। অতএব যে কোনো প্রকার অপরাধের জন্য দৈহিক নির্যাতনই একমাত্র দাওয়াই বলে এখানে মনে করা হয়। এই চব্বিশ দিনের শাসন-ক্ষমতার উচ্চ পদের জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার পেছনে থাকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনের খেলা, যে যত বেশী অর্থ ব্যয় করতে পারে, সে তত বেশী গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হয়।

অধিমাস একসঙ্গে না-পড়ার জন্য তিব্বতী চান্দ্রমাস এবং ভারতীয় চান্দ্রমাস এক সময়ে শুরু হয় না। এ বছর ১লা মার্চ বর্ষ আরম্ভের দিন পড়েছিল। ডে-পুঙ মঠ থেকে যিনি সর্বোচ্চ পদাধিকারী নির্বাচিত হন, তাঁকে দলাই লামার কাছ থেকে চব্বিশ দিন দেশ শাসন করার অনুমতিপত্র নিতে হয়। ২রা মার্চ থেকে দেখতে পেলাম, সমস্ত রাস্তাঘাট শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, রাস্তার দু'ধারে যাদের দোকান

কিম্বা বাড়ি আছে, তারা সকলেই তাদের বাড়ি ও দোকানের সামনের দিকটা সাদা মাটি গুলে চুনকামের মতো করে রেখেছে। এইদিনই অশ্বারোহণে লামার অস্থায়ী শাসকদ্বয় দলবলসহ লাসায় এসে পৌঁছালেন। আমার বাসা যেখানে ছিল, তার পূর্বদিকে খানিক দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় লাসার নাগরিকদের জমায়েত ডাকা হয়েছিল। ওখানেই চব্বিশ দিনের নতুন শাসন-ব্যবস্থার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হলো তারপর তাঁরা সদলবলে জো-খঙ (লাসার প্রাচীন বুদ্ধমন্দির) অভিমুখে রওনা হলেন। চব্বিশ দিনের অস্থায়ী শাসক বাছাই করার সময় দৈহিক যোগ্যতাও অন্যতম বিচার্য বিষয় থাকে কিনা কে জানে, তবে শাসক দু'জনকেই দেখলাম বেশ লম্বা-চওড়া, হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারার অধিকারী। অস্থায়ী শাসকদ্বয়ের সঙ্গে তাঁদের দু'জন দেহরক্ষী, তাদের এক হাতে সাড়ে চার হাত লম্বা একটি লাঠি অন্য হাতে তার চেয়ে হাতখানেক ছোট আর একটি। এই লাঠিগুলো খুব মামুলী জিনিস নয়, বিরী কিম্বা সফেদা গাছের মোটা তিন, সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসের সরল কাণ্ড থেকে তৈরি। শাসক দু'জনের আগে একদল 'নকীব' জাতীয় লোক যথারীতি 'হট যাও' 'মাথা থেকে টুপী খোলো, এ রকম হাঁক দিয়ে যাচ্ছিল। কারও সরে যেতে কিম্বা টুপী খুলতে মুহূর্তের বিলম্ব হলেই মাথায় কিম্বা পিঠে লাঠির ঘা পড়বে নির্দ্বিধায়। এইদিনে পোতলা প্রাসাদে তামাশা দেখানো হয়। আমিও সেখানে গেলাম। প্রচণ্ড ভিড়। চা, রুটি ইত্যাদির অস্থায়ী দোকান বসে গেছে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক। তামাশার জায়গাটি সমতল নয়, সে জন্য দর্শকেরা এক জায়গায় না বসে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে যার সুবিধা-মতো জায়গা বেছে নিয়েছে। আগে পোতলা প্রাসাদের চূড়া থেকে নীচের রাস্তা পর্যন্ত প্রায় হাজার ফুট লম্বা একটা দড়ি ঝোলানো থাকত। তামাশা যারা দেখাত, তারা প্রথমে সেই দড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসত। এখন দুর্ঘটনার ভয়ে ঐ খেলাটি আর দেখানো হয় না। এখন এক এক জায়গায় বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা একটা খুঁটি পোঁতা থাকে, তার ওপরে একজন উঠে নানা ধরনের কসরৎ দেখায়।

ফেরার পথে দেখি ডে-পুঙ বিহারের সহস্রাধিক ভিক্ষুর দল পিঁপড়ের মতো একজনের পেছনে আর একজন, এ রকম সার বেঁধে, নগরীর দিকে আসছে, প্রত্যেকের পিঠে মালপত্র বোঝাই। ডে-পুঙ মঠ থেকে লাসায় আসবার পথটি পোতলা প্রাসাদের গা ঘেঁসেই গিয়েছে। শুনলাম এই সমস্ত ভিক্ষুই এখন চব্বিশ দিন ধরে লাসায় থাকবে। নববর্ষ উপলক্ষে লাসায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়। সুতরাং রাস্তাঘাট পরিষ্কার ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থাও করতে হয়। এই বিপুল সংখ্যক জনমণ্ডলী যাতে জলকষ্টের অসুবিধা ভোগ না করে সে জন্য শহরের সমস্ত খাল, নালা ইত্যাদির জল বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু লোকের ব্যবহারের জন্য খাল, নালার জল দিয়ে যে গর্তগুলি ভর্তি করা হয় তা আগে থেকেই মানুষের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের

ফলে দূষিত হয়ে থাকে, তার ওপরে ঐ জলের মধ্যে মরা কুকুর অথবা গাধার পচা-গলা দেহাবশেষ দেখতে পেলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। বিগত বছরে নববর্ষের পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর সময় শহরের মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ত রাস্তার পাশে পাশে অনেক জায়গায় কয়েকটি শৌচাগার বানানো হয়েছিল। কিন্তু গত এক বছরের মধ্যে সেগুলো একদিনও পরিষ্কার করা হয়নি, মেরামত করা তো দূরের কথা। ফলে ওগুলোর এখন এমন অবস্থা যে, পাশ দিয়ে হাঁটাই দুষ্কর। মাঝখান থেকে এই নোংরা জলের নানা রোগ জীবাণু গৃহস্থের কুয়োটিকেও নষ্ট করে। ফলে এ সময় পেটের গোলমালের অসুখ প্রায় লেগেই থাকে। প্রায় হাজার বিশেক ভিক্ষু এ সময় লাসাতে জমায়েত হয়। সারাদিনে বেশ কয়েকবার এদের মধ্যে চা বিতরণ করা হয়। বড় বড় রূপো বা পেতলের হাতল লাগানো পাত্রে মাখন মেশানো চা তৈরিই থাকে। আদেশ পাওয়া মাত্রই যাতে ভিক্ষুদের চা পরিবেশন করা যায় তার সমস্ত ব্যবস্থা থাকে।

১৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দির

১লা মার্চ জো-খঙ দেখতে গেলাম। জো-খঙ শব্দের অর্থ হলো স্বামী-গৃহ, এখানে স্বামী অর্থে চন্দন কাঠের প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তিটিকে বোঝায়। এই মূর্তিটি এক সময় ভারতবর্ষ থেকে মঙ্গোলিয়া হয়ে চীনে পৌঁছেছিল। লাসা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, তিব্বত সম্রাট স্রোঙচেন-সগেম-পো ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীনবিজয় সমাপ্ত করে সেখানকার রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং যৌতুক-স্বরূপ মূর্তিটিকে লাসায় নিয়ে আসেন। এক বিরাট জলাশয়কে ভরাট করে সম্রাট সেখানে তাঁর নিজের প্রাসাদ এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তিটিও সেই মন্দিরেই স্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম এই মূর্তিটির সঙ্গে এসেছিল বলা যায়। এর প্রভাব জনসাধারণের ওপরে এত গভীর যে, লাসার অসৎ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ লোকেও কথায় কথায় ত্রি-রত্নদেবের নামে দিব্যি গালবে, কিন্তু কখনই ভুল করেও জো-বো-র (বুদ্ধের দারু মূর্তি) নামে দিব্যি করবে না। যদি কেউ সে রকম দিব্যি করেও ফেলে তা'হলে তাকে তার কথা রাখতেই হবে। ফটকের গায়ে জো-খঙের ভেতরের সমস্ত মূর্তির ইতিহাস সুন্দর করে উৎকীর্ণ আছে। তিব্বতের আরও অনেক মঠে মন্দিরে এ রকম ইতিহাস উৎকীর্ণ করা থাকতে দেখেছি। আমাদের দেশের মন্দিরের গায়েও যদি এ রকম ইতিহাস লেখা থাকত, তা'হলে দর্শনার্থীদের অনেক সুবিধা হতো, তারা অনেক অর্ধসত্য, পল্লবিত কল্প-কাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেত। মন্দিরের গায়ে —ভেতরে এবং বাইরে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী অঙ্কিত। কোনো কোনো জায়গাতে সম-য়ে কিম্বা অন্য কোনো প্রাচীন অথচ

বিখ্যাত বিহারের ছবিও অঙ্কিত রয়েছে। ছবিগুলোর মধ্যে কোথাও সোনালী রঙে আঁকা বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি —যেখানে বুদ্ধদেব শিষ্যদের কাছে তাঁর পূর্ব জন্মের কাহিনী বলছেন। কোথাও জীবনের অন্তিম লগ্নে শায়িত তিনি। কোনো ছবিতে তিব্বতের অশোক নামে খ্যাত সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো-র রাজত্ব কাহিনী চিত্রায়িত। সমস্ত চিত্রাবলীই আজও দর্শককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। ভিতরের মূর্তিগুলোর প্রাচীনত্বের জন্য তার ওপরের পলস্তারায় এক পোঁচ ময়লা রঙ ধরেছে, তা সত্বেও সেগুলোর নির্মাণশৈলী এতই মনোহর যে প্রায় জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। মন্দিরের ভেতরে সোনার তৈরি বড় বড় প্রদীপ মাখন দিয়ে জ্বালানো আছে। এই প্রদীপগুলো অবিরাম জ্বালানো থাকে। এতদিন পর্যন্ত একজন নেপালী ব্যবসায়ীর দেওয়া চারশো ভরি ওজনের সোনার একটি প্রদীপই ছিল সর্ববৃহৎ, গত বছর ভূটানের রাজা আটশো ভরির সোনার প্রদীপ এখানে স্থাপন করে আগেরটিকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে দিয়েছেন। চারদিকে বহুমূল্য ধাতু এবং রত্নাদি জড়ো করা। ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটি ছাড়াও চন্দন কিম্বা অন্য কোনো কাঠের তৈরি আরও অনেক ছোট ছোট মূর্তি নিকটস্থ আর একটি দেবালয়ে রাখা আছে। মন্দিরে দু'একজন খ্যাতনামা সম্রাটের মূর্তিও রাখা আছে। প্রধান মন্দিরের সামনেই দোতলায় দুই রাণীর সঙ্গে (চীন এবং নেপালের রাজকন্যা) সম্রাট স্রোঙচেন-স্‌গেম-পো-র মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরের প্রতি অণুপরমাণুতেই যেন ১৩০০ বছরের প্রাচীনত্বের প্রমাণ প্রকটিত হচ্ছে।

মন্দিরের বাইরে এসে দেখি, একটা উঁচু বেদীতে পশমী কার্পেটের ওপর বসে তিন-চারশো জন ভিক্ষু বেশ উঁচু স্বরে স্তোত্র পাঠ করে চলেছে। তাদের সকলেরই পরনে জীর্ণ ধূলিমলিন চীবর। প্রত্যেকের সামনেই একটি করে লোহার তৈরি ভিক্ষাপাত্র। শুনলাম এরা হলো লাসার সবচেয়ে কর্মনিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু ভিক্ষুর দল। মু-রু এবং র-মো-ছে বিহারে এদের বাস। ৪ঠা মার্চ দেখলাম দলে দলে লোক চলেছে মু-রু মঠের দিকে। শুনলাম সেখানে ফো-রঙ-এর লামা ধর্মোপদেশ বিতরণ করবেন। ফো-রঙ-এর লামার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা দেশ জুড়ে, তদুপরি ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম সুন্দর ব্যাখ্যাতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। লোকে বলে তিনি যথার্থই জ্ঞানী। সে দিনই আবার নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে সরকারী তরফেরও ধর্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা ছিল। একদিকে ফো-রঙ-এর লামা আর একদিকে সরকারী ধর্মপ্রচারক, লোকে কিন্তু প্রথমটির দিকেই বেশী ভিড় জমাচ্ছিল। সরকারী ধর্মপ্রচারকের কাছে গিয়ে দেখি জনা বিশেক স্ত্রী-পুরুষ জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকেই তাঁর আসনের যতটা পারে কাছাকাছি বসেছে, যাতে ধর্মপ্রচারক প্রত্যেকের মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন। উপদেশের বিষয়-বস্তু কি তা জানার জন্য আমিও ভিক্ষুর আসনের কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম, শুনলাম সরকারী মহাপ্রভুর বাণী। কি সব তাঁর উপদেশ! তিনি বলছিলেন—

ডাকিনী মা নাকি প্রচণ্ড শক্তিময়ী দেবী, তাঁর সামনে সকলেরই করজোড়ে যাওয়া উচিত এবং ভক্তিভরে তাঁর পূজা করা উচিত। বজ্রযোগিনী মাতাও অনুরূপ শক্তি ধরেন। অতএব তাঁর বেলাও ঐ একই বিধান। বুঝলাম এখানে লোক সমাগম হয়নি কেন। এ হেন বাজে ধর্মোপদেশ লোকে বেশীক্ষণ কি করেই বা হজম করবে।

মহাগুরু দলাই লামার দর্শন লাভ

২রা মার্চ নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে লাসার দোকান-বাজার সবই বন্ধ। গোটকেয়েক নেপালীদের দোকানই কেবল খুলল। অন্য সকলকেই চব্বিশ দিনের অস্থায়ী শাসকের কাছ থেকে লাইসেন্স নবীকরণ করিয়ে নিতে হবে। ৫ই মার্চ ভোর থেকেই দেখি শহরে জোর প্রস্তুতি চলছে। রাস্তাঘাট আর এক দফা ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। বাড়িঘরও নতুন করে আবার সাজানো চলছে। শুনলাম মহাগুরু দলাই লামার মিছিল বেরোবে। সকাল সাতটায় মিছিল বার হবার কথা। লোকে যতটা পেরেছে আগেভাগে এসে রাস্তার ধারের জায়গা দখল করতে চেষ্টা করেছে। আমিও মিছিল দেখার মিছিলে সামিল হয়ে পড়লাম। রাস্তার দু'পাশে সজাগ প্রহরা। রাস্তা পারাপারও নিষিদ্ধ। প্রথমে দুই ঘোড়সওয়ার মাথায় লাল টুপী পরে আবির্ভূত হলো। এরা মন্ত্রীদের দেহরক্ষী। তারপর এলেন চি-টুঙ (ভিক্ষু অফিসার) এবং কু-টা (গৃহস্থ-অফিসার)। এঁদের পিছু পিছু এলেন সেনাপতিরা, তবে তাঁদের পরনে কোনো সামরিক উর্দি ছিল না, সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরেই তাঁরা এলেন। তারপর এলেন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাকে সজ্জিত ছ-রু মন্ত্রী ও দু'জন সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের পর পূর্ণ সামরিক পোশাকে দেখা দিলেন সর্দার বাহাদুর লে-দন-লা। অবশেষে জনতা যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেই মহাগুরু দলাই লামা দর্শন দিলেন। তিনি এলেন চারদিক রেশমী কাপড়ে ঢাকা পাল্‌কিতে চড়ে। সঙ্গে বহু সৈন্য সামন্ত, তারা পাল্‌কির চারদিক ঘিরে ছিল। সৈনিকদের পোশাকের অবশ্য কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। কারও পোশাক নেপালী ধাঁচের, কারো বা মঙ্গোলীয়, কেউ কেউ আবার চীনা পোশাকও পরেছিল। কেবল পাল্‌কিবাহকগণ বাদে মিছিলের সকলেই ঘোড়ার পিঠে চড়েই পরিক্রমা সারল।

* * *

আমার শ্রীলঙ্কা ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত হয়ে যাবার ফলে বইপত্র যেমন যোগাড় করছিলাম, সেটা করতেই থাকলাম। কিন্তু লাসা থেকে দার্জিলিং কালিম্পঙ রাস্তাটা তখনও কড়া সামরিক প্রহরাধীন। কোনো নেপালীকেই ফিরতে দেওয়া হচ্ছিল না। আর লাসাতে আমার পরিচয় অধিকাংশ জায়গাতেই নেপালী বলে। মাঝে মধ্যে নানা রকম উড়ো খবর আসত কিন্তু তার ওপর ভিত্তি

করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না। ৭ই মার্চ ভঙ-রী রিম্পোছের কাছে গিয়ে। তাঁকে বললাম, আপনি আমার হয়ে দলাই লামার কাছে চারটি নিবেদন পেশ করুন। প্রথমত সম-য়ে বিহার যাবার অনুমতি, দ্বিতীয় পোতলা প্রাসাদের যে সমস্ত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ মহাগুরুর আদেশ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, অথচ আমার প্রয়োজন, তার জন্য যেন প্রয়োজনীয় অনুমতি পাই, তৃতীয় দে-র্গী মঠে ছাপা এক কপি করে কঞ্জুর, তঞ্জুর যদি অনুগ্রহ করে আমাকে দেন এবং সব শেষে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি।

আমার অনুরোধ শুনে রিম্পোছে বললেন —প্রথম দুটো সহজেই হয়ে যাবে কিন্তু শেষের দুটো সম্বন্ধে আমি কোনো কথা দিতে পারছি না।

পোতলা প্রাসাদে গ্রন্থের সন্ধানে গিয়ে মহাপণ্ডিত বু-স্তোনের আটাশ বেষ্টনীতে আবদ্ধ গ্রন্থাবলীটি তখন সংগ্রহ করতে পারিনি। পরবর্তী কালে ওই গ্রন্থটির জন্য দলাই লামার একান্ত সচিব কুশো-কুম-ডে-থা-কে লিখেছিলাম। তিব্বতে দলাই লামার পরই তাঁর একান্ত সচিবের ক্ষমতা। তিনি আমার অনুরোধে উক্ত গ্রন্থটিকে সুন্দর করে ছেপে, হলুদ কাপড়ে বাঁধাই করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

৯ই মার্চ লাসায় আঙুল তিনেক তুষারপাত হলো। ১০ তারিখে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি চারদিকের পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, রাস্তা, বাড়ির ছাদ, যায় উঠোন পর্যন্ত তুষারে ছেয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন একটা বিশাল সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে সর্বত্র। একটু বেলা হতেই সমস্ত লোক বরফ পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলো। অনেক বাড়ির দু'আঙুল পুরু মাটির ছাদ বরফগলা জলকে আটকাতেও পারছিল না। তা'ছাড়া নতুন বছরের অস্থায়ী শাসকের ভয়েও দেখলাম সকলেই ভীত। রাস্তায় যদি বরফ জমে থাকে তা'হলে আশপাশের বাড়ির লোকেদের জরিমানা হবে। সে জন্যই বোধহয় বেলা দশটার মধ্যেই রাস্তার বরফ সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। ২৫শে মার্চ যে দিন পুরানো শাসন-ব্যবস্থা ফিরে এল, সে দিন ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বরফ পড়ল। লোকে বলাবলি করছিল— ভাগ্যিস এখন আর অস্থায়ী সরকার নেই। না হলে এই বরফ এখন পরিষ্কার করতে জান লবেজান হয়ে যেত। সে দিন লোকে শুধু নিজেদের বাড়ি ঘরের ছাদের বরফটুকুই পরিষ্কার করল।

তিব্বতী শাস্ত্রার্থ

নববর্ষ উপলক্ষে লাসায় শাস্ত্র সম্পর্কিত বিতর্কের আসরও বসেছিল। ১০ই মার্চ জো-খঙ মন্দিরে বিতর্ক শুনতে গেলাম। আমরা ছাদের ওপরে দর্শকদের সঙ্গে বসলাম। নীচের অঙ্গনে পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাঁদের শিষ্যরা বসেছেন। দু'জন বৃদ্ধ দেখি একটু উঁচুমতো দুটো বেদীতে বসেছেন। শুনলাম তাঁরা দু'জন এই বিতর্কে মধ্যস্থের ভূমিকা নেবেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা তাঁর আসন থেকে উঠে প্রথমে ওই দুই

বৃদ্ধ বিচারককে বন্দনা করে অনুষ্ঠান শুরু করবার অনুমতি চেয়ে নিল। তারপর ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' থেকে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করল। প্রশ্ন করার ভঙ্গীটি বেশ বিচিত্র। প্রশ্ন করতে প্রশ্নকারী কখনও এগোচ্ছিল কখনও বা পিছোচ্ছিল। এক একটা প্রশ্নের শেষে সজোরে হাততালি দিচ্ছিল। একটা মালা হাতে নিয়ে তাকে ধনুক কল্পনা করে তীর নিক্ষেপের নাট্যমুদ্রাও প্রদর্শিত হলো। প্রশ্নকারীর দলের অন্য সবাই, এমন কি তাদের শিক্ষক মহাশয়ও তার এই লম্ফ-ঝম্প পরম পরিতোষ সহকারে দেখছিলেন। উত্তর-পক্ষীয়রা ততক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ পর এ পক্ষের পালা শেষ হলে, অপর পক্ষের একজন উঠে প্রথমে মধ্যস্থকে বন্দনা সেরে, প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্নবাণে তাদের আক্রমণ আরম্ভ করল। আক্রমণের সময় ঠিক অপর পক্ষের মতো অঙ্গভঙ্গী সহকারে নানা মুদ্রার মাধ্যমে তাদের প্রশ্ন রাখল। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, শাস্ত্র বিচারের নামে এ হেন লম্ফ-ঝম্প, তীর-ধনুক, রণংদেহি ভাব কোথা থেকে আমদানি করলেন। উত্তরে বন্ধুটি হেসে বললেন —এ সব এসেছিল নালন্দা এবং বিক্রমশীলা বিহার থেকে। অতএব আপনারও এতে দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। আমি বললাম —আপনার কথাই যদি সত্যি বলে ধরে নিই, তা'হলে আর কোথাও না হোক আজও কাশী অথবা মিথিলার পণ্ডিতদের মধ্যে এ রূপ প্রথার প্রচলন দেখতে পেতাম। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন সেখানেও এ ধরনের কিছু দেখিনি।

১২ই মার্চ লাসায় পঞ্চক্রোশী (পরিক্রমা) আরম্ভ হলে আমিও গেলাম। এই পঞ্চক্রোশীতে লাসা নগর ছাড়াও পোতলা প্রাসাদ, দলাই লামার বাগান-বাড়ি নোর্বুলিং এবং আরও কিছু অট্টালিকা পড়ে। সারা পরিক্রমার দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। দেখলাম কেউ কেউ দণ্ডী কেটে কেটে পরিক্রমা করছে। এই দণ্ডী-পরিক্রমার মধ্যে একজন নেপালী ব্যবসায়ীও ছিল। পরিক্রমা শেষে র-মো-ছে-র মন্দিরে গেলাম। এই মন্দিরটির নির্মাণকালও জো-খঙ-এর সমসাময়িক। এখানেও মন্দিরের গায়ে পাথরে বিচিত্র সব কারুকার্য। তিব্বতে সমস্ত মূর্তিই তৈরি হয় পাথরে কিম্বা প্লাষ্টারে। এখানে দেখলাম বুদ্ধমূর্তির মাথায় মুকুট। শুনলাম বুদ্ধমূর্তির মাথায় মুকুট পরাবার সদিচ্ছা বা কুমতলব যাই বলি না কেন, এসেছিল স্বয়ং চোঙ-খ-পা-র মাথা থেকে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ই কখনও বুদ্ধ মূর্তির মাথায় মুকুট চড়ায় না। বস্তুতপক্ষে চোঙ-খ-পা-র অনেক কিছু সংস্কার সত্যি মহান্ ছিল কিন্তু এটিকে নির্দ্বিধায় ভুল বলা যায়। কারণ সিদ্ধার্থ রাজকুমারই থাকুন বা অন্য যা কিছুই থাকুন, কিন্তু বুদ্ধদেব তো একান্তভাবেই ভিক্ষু ছিলেন। ভিক্ষুদের জীবনযাপন পদ্ধতি, বেশভূষা সব কিছু তিনিই নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন এবং নিজের জীবনেও যথাযথভাবে সেগুলি পালন করেছিলেন। তবে কেন তাঁর মূর্তির ওপর এ হেন অত্যাচার!

মাখনের মূর্তি

১৪ই মার্চ সকালে দেখি পরিক্রমার পথে বিশেষ আয়োজন শুরু হয়েছে। পরিক্রমার পথের চারদিকে খুঁটি পোঁতার কাজ চলছে। তার ওপরে আবার যাতে প্রদীপ রাখা যায় সে জন্য আড়াআড়িভাবে আর এক প্রস্থ কাঠ লাগিয়ে বেড়ার মতো তৈরি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি সবটাই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। শুনলাম, ভেতরে সাজানোর কাজ চলছে। সূর্যাস্তের একটু আগে ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলো, দেখলাম কাঠের স্তম্ভের ওপরে একতলা দোতলা খোপ তৈরি করে রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে সেগুলোকে সাজানো হয়েছে। খোপগুলো বাড়ির আদলে তৈরি করা হয়েছে এবং তার দরজা-জানালায় মানুষের পরিবর্তে ছোট ছোট মাখনের মূর্তি বসানো আছে। সারাটা রাস্তাই এ রকম মূর্তি দিয়ে সাজানো। তিব্বতে ললিতকলার প্রতি আগ্রহের ব্যাপারটা সর্বজনীন, এ বিষয়ে তারা আমাদের দেশের চেয়ে তো বটেই এমন কি ইউরোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশী এগিয়ে আছে। এদের এ সমস্ত কলানৈপুণ্য দেখে এটুকু আন্দাজ করা যায় যে, একদিন ভারতবর্ষেও এ জিনিসের চর্চা ছিল। তারপর একদিন ঈশ্বরভক্তির প্রবল বন্যা এসে সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। এই সমস্ত মূর্তির প্রদর্শনীটি করা হয় ডে-পুঙ, সে-রা প্রভৃতি মঠ, মহাগুরু দলাই লামা এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদ ও অন্যান্য ধনী গৃহস্থদের পক্ষ থেকে। যদিও এটা কোনো প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী নয়, এর জন্য কোনো পুরস্কার নেই, তবুও প্রত্যেকেই চেষ্টা করে অপরের চেয়ে আরও সুন্দর করে সাজাতে। মন্ত্রী থে-মূন-এর পক্ষ থেকে যে মূর্তি সজ্জিত করা হয়েছে, আমি সেখানটাতেই দাঁড়িয়েছিলাম, শুনলাম প্রতিবার দলাই লামা স্বয়ং এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার কোনো কারণে এ বার তিনি এলেন না। রাত্রি হতেই ওই স্তম্ভগুলির ওপরে শত শত প্রদীপ জ্বলে উঠল। সৈনিকরাও একবার এ পথে মার্চ করে চলে গেলো। এরপর চব্বিশ দিনের সাময়িক সরকারের বাহিনী মশাল শোভাযাত্রা সহকারে নিজেদের প্রদর্শনীর সামনে এসে দাঁড়াল। শুনলাম মন্ত্রী থে-মূন অসুস্থ, তাই তিনি প্রদর্শনীতে আসতে পারলেন না, তাঁর পক্ষ থেকে একজন ভিক্ষু মন্ত্রী ও এবং দু'জন গৃহস্থ কর্মচারী এসে প্রদর্শনী ঘুরে দেখে গেলেন। লোকে বলাবলি করছিল যে র-মো-ছে বিহারের প্রদর্শনীটিই নাকি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে, তবে সেটি যে কোনটি তা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারলাম না, কারণ রাস্তায় লোকের ভিড় অসম্ভব রকম। সাময়িক সরকারের রক্ষীবাহিনী বেত চালিয়ে রাস্তার লোকজন সরাচ্ছিল। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এ রকম ভিড় রইল, এরপর লোকে নাচ-গান করেই ভোর পর্যন্ত কাটিয়ে দিলো। এই উৎসবের নাম পঞ্চদশী:তিথির উৎসব। মাখনের মূর্তি

সম্বন্ধে তিব্বতী ভাষায় সুন্দর একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। "সাহস থাকে তো দুপুরবেলা বাইরে বের হও।" বেচারা মাখনের মূর্তি সত্যিই তো কোন সাহসে দুপুর বেলা বাইরে বের হবে। বাইরে বের হলে তো বেচারার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তবে বাইরে না বেরোলেও মূর্তিগুলো দেখতে যে খুবই সুন্দর হয় সে কথা অনস্বীকার্য। কারণ শিল্পরুচিবোধ এদের রক্তে। একটা পেতলের মূর্তির পিছনেও অন্তত তিন জন লোকের অবদান থাকে। একজন ছাঁচ তৈরি করে আর একজন ঢালাই করে এবং তৃতীয় জন পালিশ ইত্যাদি করে মূর্তিটি সম্পূর্ণ করে। এ দেশে কোনো একজন কারু-শিল্পীই সর্ববিদ্যাবিশারদ এ রকমটি বড় একটা দেখা যায় না। মাখন কিম্বা চম্বার মূর্তি তৈরির জন্যও লোকে বড় বড় শিল্পীদের সাহায্যে সুন্দর করে পেতলের ছাঁচ গড়িয়ে নেয়।

তিব্বতী নাচ ও চিত্রকলা

পরদিন ১৫ই মার্চ, প্রকৃত নববর্ষ। এই দিনটিতে লোকে প্রিয়জনকে নানা উপহার ইত্যাদি পাঠায় এবং প্রাচীন মঙ্গোলিয় গাথা গেয়ে পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে। দুপুরের পর থেকে যা শুরু হলো, তা আর কহতব্য নয়। মদের স্রোত বইতে শুরু করল। পান করা এবং করানো দুটোই চলতে লাগল সমান তালে, আর সেইসঙ্গে নাচ আর গান—চতুর্দিকেই এক দৃশ্য। তবে মদ্যপানের এত ঢালাও কারবার থাকা সত্ত্বেও কাউকে খুব বেশী একটা বেসামাল হতে দেখলাম না। তাই আমাদের প্রতিবেশী সত্তর বছরের বৃদ্ধ অখু-কেও (কাকা) দেখলাম একদল কিশোরীর মাঝখানে কেষ্ট ঠাকুরটি সেজে দিব্যি রাসলীলা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাচের দৃশ্য আমাদের দেশের গ্রাম্য মেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। একদিকে একসার মেয়ে আর বিপরীত দিকে পুরুষের সারি। দুই সারিই গান গাইতে গাইতে অর্ধবৃত্তাকারে পাক দিচ্ছে। এই দিনটিতে স্থানীয় নেপালী ব্যবসায়ীরাও তাদের তিব্বতী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মিষ্টি এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী পাঠায়।

এ দিকে যুদ্ধের আশঙ্কা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। কলকাতা কাঠমাণ্ডু থেকে অনবরত টেলিগ্রাম আসছে তিব্বত ছেড়ে চলে যাবার জন্য। কিন্তু রাস্তায় তো কড়া পাহারা, কেউ লাসা থেকে বাইরে যেতে পারছে না। আমি এ সময় কিছু ঐতিহাসিক এবং সাধক ব্যক্তির প্রতিকৃতি আঁকতে পারে এমন লোকের খোঁজ করছিলাম। একজন তরুণ চিত্রশিল্পীর খোঁজ পেয়ে গেলাম, সে আমাদের বাসার কাছেই থাকে। শুনলাম সে নাকি রাজসভার চিত্রকর। গেলাম তার কাজ দেখতে। দেখলাম বয়সে তরুণ হলেও আঁকার হাতটি ভালো, তবে আধুনিক তিব্বতী চিত্রকলার নানা রকম নিয়মকানুনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার ফলে স্বাভাবিক গতি যেন খানিকটা ব্যাহত। প্রতিভার আপন নিয়মে বিকাশিত হবার সুযোগ

এ দেশে প্রায় নেই বললেই চলে। নিয়মের বেড়ী তাকে আটকে রাখবেই। চিত্রকরটির বয়স বাইশ-তেইশের মধ্যে, কিন্তু এর মধ্যেই সে রাজসভার পাঁচ জন প্রধান শিল্পীদের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। শহরে আরও যারা চিত্রকর আছে, তারা ট্যাক্স হিসেবে কাপড়, রঙ, আঁকার অন্যান্য সরঞ্জাম রাজসভার শিল্পীদের দিয়ে থাকে। পাঁচ জন রাজশিল্পীর মধ্যে দু'জন প্রবীণ আছেন। তাঁদের কাজ বাকী তিন জনের কাজকর্মের তদারক করা। অবশিষ্ট তিন জনের মধ্য থেকে প্রতি তিন বছরে এক বছরের জন্য এক-একজন কাজের ভার পায়। এই এক বছরের মধ্যে চব্বিশটি ছবি এঁকে মহাগুরু দলাই লামাকে দেখাতে হয়। এদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অবশ্য সরকারের।

২৩শে মার্চ সৈনিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর সৈন্য বাহিনীর সাজে কুচকাওয়াজের মহড়া প্রদর্শন করল। প্রথমে এল ঘোড়সওয়ার বাহিনী, তাদের মাথায় টুপী, হাতে তীর-ধনুক, পিঠে তূণীর। তারপরই বিচিত্র সাজপোশাকের পদাতিক বাহিনীর পদযাত্রা শুরু হলো। এদের কাছে ছিল পুরানো আমলের পলতে লাগানো গাদা বন্দুক। সেগুলো থেকে অনবরত বারুদ দাগা চলছিল। বারুদের ধোঁয়ায় পথ-ঘাট ভরে গেলো। এরপর এল একদল খড়্গ, কৃপাণধারী সৈন্য আর তাদের পেছনে ছিল রাজা-রাজড়ার পোশাক পরা একদল লোক। আজ থেকে অনেক বছর আগে এই দিনটিতেই পঞ্চম দলাই লামা তিব্বতের ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজাদের পরাজিত করে মঙ্গোল সর্দার গু-শী খানের কাছ থেকে সমস্ত দেশটার শাসন-ভার লাভ করেছিলেন।

২৪শে মার্চ, অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার শেষ দিন। খুব ভোরে মৈত্রেয়-র রথযাত্রা বের হলো। সকলের আগে ছাত্রদের টুপী-পরা একদল ভিক্ষু, তাদের হাতে শঙ্খ এবং বড় বড় করতাল। এদের পিছনে হলদে পোশাকের বাজনদারের দল, তারপর চার চাকার রথে মৈত্রেয়মূর্তি। রথের পিছনে ছিল দুটো হাতী। খুব বাচ্চা অবস্থায় এ দুটিকে ভারতবর্ষ থেকে এ দেশে আনা হয়েছিল। এ রকম ঠাণ্ডা আবহাওয়া হাতীদের পক্ষে অনুকূল নয়। সে জন্য এদের যথেষ্ট যত্নে এবং সাবধানতার সঙ্গে রাখা হয়। সন্ধ্যাবেলা কুস্তীর আসর বসবে বলে খবর পেলাম। যদিও মহাগুরু দলাই লামা প্রথম দিন মিছিলে বেরিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটাকে ফেরা বলে ধরা হয় না। আজকের মিছিলটিকেই তাঁর রাজধানীতে পুনরায় ফিরে আসা বলে ধরা হয়। রাজধানীতে তাঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চব্বিশ দিনের সাময়িক শাসনের অবসান এবং সেই সঙ্গে নববর্ষ উৎসবেরও সমাপ্তি।

অষ্টম পর্ব

সম-য়ে যাত্রা

মঙ্গোল ভিক্ষুর সঙ্গে

২২শে মার্চ তারিখেই নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয়ে যাবার খবর পাওয়া গেলো। ফলে মানুষের মন থেকে যুদ্ধভীতি দূর হয়ে নববর্ষ উৎসবের শেষ কটা দিন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাস্তা অবরোধমুক্ত হতে হতে ৩০শে মার্চ এসে গেলো। আমি অবশ্য ধারণা করেছিলাম যে রাস্তা আরও তাড়াতাড়ি খুলবে, সে জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইপত্র যোগাড়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এ কাজে আমাকে খুবই সাহায্য করছিলেন আমার মঙ্গোল বন্ধু ধর্মকীর্তি। ধর্মকীর্তি আমার কাছেই থাকতেন বলা যায়। ছ'সাত বছর ধরে সে-রা মঠের ড-ছুঙ-এ তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েছেন। তাঁর শরীরও খুব মজবুত। ড-ছুঙ-এ ভালো ছাত্র হিসেবেও তাঁর সুনাম আছে। ধর্মকীর্তির খুব ইচ্ছে যে, তিনি আমার সঙ্গে সিংহলে যান। আমিও তাতে রাজি। পথঘাট খোলার খবর পাওয়া মাত্রই আমরা সম-য়ে বিহারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আচার্য শান্তরক্ষিত প্রতিষ্ঠিত সম-য়ে তিব্বতের প্রাচীনতম বিহার। লাসা থেকে সম-য়ে স্থলপথে যাওয়া ছাড়াও জলপথে চামড়ার নৌকায় লাসার নদী উই-ছু দিয়ে চাঙ-ছু পর্যন্ত, আবার সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র ধরে সম-য়ে বিহার থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরের ঘাটে পৌঁছানো যায়। আমরা জলপথে যাওয়াই ঠিক করলাম।

নদীতীর

লাসা থেকে রোজ কা (চামড়ার নৌকা) ছাড়ে না। সে জন্য বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হলো। ৫ই এপ্রিল একটা নৌকার খবর পেয়ে আমরা দু'জন একটা কা'তে চড়ে বসলাম। আমাদের নৌকায় আমরা ছাড়া আর দু'জন যাত্রী তাদের একজন বছর পঞ্চাশের এক মহিলা আর একজন বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। আমাদের সহযাত্রী যুবক এবং বৃদ্ধাটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে এরা নিশ্চয়ই মা এবং ছেলে। অবশ্য আমি কোনো কথা বলিনি। পরে ধর্মকীর্তি বলল যে এরা স্বামী-স্ত্রী। ধর্মকীর্তির মুখেই শুনলাম, এ দেশে ধনী বিধবার জন্য পাত্রের

অভাব হয় না, বরং সচরাচর তার চেয়ে বয়সে ছোট পাত্রই জোটে। এ দেশে বিধবা হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ বহুপতি প্রথার ফলে একটি স্বামীর মৃত্যু হলেও তার অন্যান্য ভাইরা জীবিত থেকে তাদের সকলের সম্মিলিত স্বামীত্ব দিয়ে স্ত্রীটিকে বৈধব্যের হাত থেকে রক্ষা করে। নৌকা চলতে চলতে নদী-গর্ভের পাথরের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাল্কা সংঘর্ষও ঘটছে। এ দেশে এ জন্যই এ রকম নদীতে চামড়ার নৌকা চলে। ফলে পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে তলা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। ঘণ্টা দেড়-দুই চলার পর যেখানে এলাম, সেখান থেকেও পোতলা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। মাঝি বলল এটাই শেষ দেখা, এরপর নৌকা বাঁক নেবে এবং পোতলা প্রাসাদসহ লাসার কোনো কিছুই আর দেখা যাবে না। আমাদের নৌকার ঠিক পিছনেই যে নৌকাটা আসছিল তাতে লাদাখের শঙ্কর মঠের ভিক্ষু খুব-তন-ছে-রিঙ ছিলেন। লাদাখে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখনই তিনি আমার এ দেশে আসার ইচ্ছার কথা জানতেন। লাসায় থাকবার সময়ও তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিকেলের দিকে বাতাসের বেগ বেশ বাড়ল। নদীর দুই পাড় যথেষ্ট উঁচু থাকায় আমরা অবশ্য ততটা টের পেলাম না। রাত্রিবেলা আমরা মন-ভো নামে একটা ছোট গ্রামে যাত্রা বিরতি ঘটালাম। ঝড়ের মতো বাতাসের বেগ আর সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। তাড়াতাড়ি রাত্রিবাসের জায়গার সন্ধানে লেগে গেলাম। মন-ভো গ্রামটি আক্ষরিক অর্থেই ছোট গ্রাম মাত্র চার-পাঁচ ঘর লোকের বাস। নৌকার মাঝিরাই বাড়ির মালিকদের ডেকে আনল। তাঁদেরই একজনের বাড়িতে রাতের মতো জায়গাও জুটল। আমার তো এক ফোঁটা নড়া-চড়া করতেও ভালো লাগছিল না। এরই মধ্যে কে যেন অনুগ্রহ করে দু'পেয়ালা চা দিয়ে গেলো। গোটা রাত ওই দু'পেয়ালা চায়ের ওপর দিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগেই আমাদের নৌকা ছেড়ে দিলো। নদী এখানে বেশ খরস্রোতা। সে জন্য উঁচু-নীচু পাথরের হাত থেকে নৌকা বাঁচানো ছাড়া মাঝিদের আর বিশেষ কিছুই করতে হয় না। নৌকা আপন গতিতেই এগিয়ে চলে। নদীর দু'পাশে এ বার কিছু কিছু গাছপালার দেখা পেলাম। অধিকাংশ গাছেই সদ্য সদ্য নতুন পাতা জন্মেছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের নৌকা ছু-শর-এর কাছাকাছি পৌছাল। গতকালের মতো আজ হাওয়ার বেগ ততটা ছিল না। গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদীতীরেই রাত্রিবাস করতে হলো। ভোরে উঠেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। ভোরবেলা খানিকক্ষণ নৌকা চলার পরই ব্রহ্মপুত্রের দেখা মিলল। ঠিক হলো যে আমরা চা খাবার জন্য কুঙ-গা জোঙে নৌকা বাঁধব। ওখানে ছোট একটি মঠ আছে। ডান-দিকে নদীর ঐ রেখার কাছাকাছি মঠটির অবস্থান। দলাই লামার আগের আমলে এ দেশ অনেক ছোট ছোট রাজত্বে বিভক্ত ছিল, তখন এখানেও একজন ছোট

রাজার রাজত্ব ছিল। এখন অবশ্য সে জায়গায় মাত্র ছোট একটি গ্রামই অবশিষ্ট আছে। পথে ছবি তুলব ভেবে সঙ্গে ক্যামেরা নিয়েছিলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি একেবারে নবীশ হবার ফলে দশ-বারোখানা ফিল্ম এমনি নষ্ট হলো। তবে কুঙ-গা জোঙের ছবি খানিকটা এলো, কারণ পরে ছবি দেখে অন্তত জায়গাটি চিনতে পেরেছিলাম। যাই হোক চায়ের পর্ব সাঙ্গ করে আবার রওনা হলাম। দুপুরবেলা ব্রহ্মপুত্রের বাম-তীরে ক-নে-তুম্বা নামে একটা গ্রামে নৌকা থামানো হলো। গ্রামটিতে দেখি প্রচুর পরিমাণে মাছ শুকোবার কাজ চলছে। সমস্ত মাছই ধরা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র থেকে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে রওনা হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হলো না। আমাদের সহযাত্রী মহিলাটির ওপর আবার নানা রকম দেবতার ভর হয়। এরই মধ্যে দেবতার ভরের কল্যাণে এই গ্রামে তাঁর কিছু যজমানও জুটে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই নৌকা তীরে লাগা মাত্রই গ্রামের ভিতরে চলে গিয়েছিল। কেবল আমরা দু'জনেই শুধু নৌকার পাহারায় ছিলাম। রাত্রিতে আমরাও গ্রামের ভেতরে শোবার জন্য গেলাম। গ্রামের মধ্যে ঢোকা মাত্রই শুরু হলো কুকুরের চিৎকার। এটা এ দেশের সমস্ত জায়গাতেই সইতে হয়।

পরদিন ভোরে শয্যা ছেড়ে আবার ফিরে গেলাম নৌকাতে, কিন্তু কখন ছাড়বে তার কোনো ঠিক নেই। শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ যতক্ষণ আমাদের সহযাত্রিণী এসে না পৌছাচ্ছেন, ততক্ষণ মাঝিরা নৌকা ছাড়ে কি করে? এ দিকে সেই মহিলা বোধহয় গ্রামের সমস্ত ভূত-প্রেত অপদেবতাকে সংহার করে বেলা বারোটা নাগাদ স্বামীসহ ফিরে এলেন এবং তাঁদের পিছু পিছু জনা-পঁচিশ স্ত্রী-পুরুষের এক জনতা। তাঁদের সঙ্গে বেশ লোভনীয় পরিমাণের উপহার সামগ্রী। যাই হোক সমবেত বিদায় সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে আমাদের নৌকা ছাড়ল। বিকেলের দিকে নদীর বাঁ-ধারে দোর্জে-ডক নামে একটা বিহারের কাছে নৌকা বাঁধা হলো। এটি তিব্বতের সবচেয়ে পুরানো বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিগ-মা-পা গোষ্ঠীর বিহার। অন্যান্য মঠ বা বিহারের মতো এটির অবস্থানও একটু উঁচু টিলা মতো জায়গায়। এই মঠের বাসিন্দাদের জীবন যাপনের ধরন-ধারণ অনেকটা আমাদের দেশের অযোধ্যা অঞ্চলের হনুমানগড়ী নাগ বংশীয়দের মতো। দোর্জে-ডক বিহার নিগ-মা-পা গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহার, প্রথমটির নাম মিন-ডো-লিঙ বিহার।

তিব্বতে ভারতের পাহাড়

বিকেল পাঁচটায় আবার যাত্রা শুরু হলো। এখানে ব্রহ্মপুত্রে আগের মতো তীব্র স্রোত ছিল না। নদীর উভয় তীরেই দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। তারই মাঝে কোথাও কোনো গ্রাম, লোকবসতি, ক্ষেত-খামার দেখা যাচ্ছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে

আমাদের নৌকা একটা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পৌছাল। পাহাড়টির বিশেষত্ব এই যে, তাতে এক ফোঁটা মাটির চিহ্ন মাত্র ছিল না। সমস্তটাই নিরেট পাথরে গড়ে ওঠা। শুনলাম পাহাড়টিকে পবিত্র মনে করে ভারতবর্ষ থেকে আনানো হয়েছিল। বাঁ-দিকে দেখা যাচ্ছিল আরও তিনটি পাহাড় নদীগর্ভে গা-ডুবিয়ে বসে আছে। এ তিনটির সম্বন্ধেও অনেক কল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। এই পাহাড় তিনটির নাম হলো সো-নম, ফুন এবং সু-ম। এরা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের একটি পুত্র। এরাও নাকি ভারতবর্ষ থেকেই এ দেশে এসেছে। জানি না আচার্য শান্তরক্ষিত কিম্বা আচার্য দীপঙ্করের সময়েও রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত বহনের মতো কোনো ঘটনা ঘটেছিল কিনা? ইতিমধ্যে আমাদের নৌকা সম-য়ে বিহারের কাছাকাছি পৌছাল। দূর থেকে বিহারটিকে দেখেই এর গঠন পদ্ধতিতে ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমার এবং ধর্মকীর্তির কাছে একটি করে পিস্তল ছিল। আর সে জন্য আমার সঙ্গীরাও যাত্রাপথে চোর ডাকাত সম্বন্ধে নির্ভাবনায় ছিল। রাত্রি নটায় নৌকা একটা বিরাট পাথরের স্তূপের গায়ে থামানো হলো। এই স্তূপটির নাম ডাক-ছেল অর্থাৎ মহাশিলা। এ দেশের বিভিন্ন মঠে বা বিহারে উৎসব অনুষ্ঠানে কোনো উঁচু দেওয়াল বা ঐ রকম কোনো জায়গায় বড় বড় চিত্রপট টাঙানো হয়। এটা এ দেশের একটা রেওয়াজ। সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, সম-য়ে বিহারেও চিত্রপট টাঙাবার জন্য এই মহাশিলাটিকেই ব্যবহার করা হতো। এটিও ভারত থেকেই আমদানি। শিলাটি উচ্চতায় প্রায় দেড়শো ফুট, এবং ওটির অবস্থান নদীগর্ভের ঠিক মাঝখানে। মহাশিলাটির ত্রিকোণাকার আকৃতিটিও তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। জুন-জুলাই মাসে যখন নদীর বুকে বর্ষার ঢল নামে তখনও এই মহাশিলা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে যা বহু দূর থেকেও যাত্রীরা দেখতে পায়।

ভোরবেলা মহাশিলার কাছ থেকে যাত্রা শুরু করে জম-লিঙ গ্রামে এসে যাত্রা বিরতি করলাম। এখানে নেপালের কাঠমাণ্ডুর বোধা স্তূপের মতো একটি স্তূপ আছে। ব্রহ্মপুত্রের এ দিককার উপত্যকা অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হওয়ার জন্য প্রচুর আখরোট গাছ জন্মায়। মনে হয় চেষ্টা করলে এ সব অঞ্চলে আরও নানা রকমের ফলের চাষ করা যায়। কিন্তু যা চলে আসছে, এই গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করা সর্বকালে সব দেশেই একটু কষ্টকর। এ দেশে তার পরিমাণ মাত্রাধিক বেশী। জম-লিঙ ছাড়িয়ে খানিক এগোতেই যে গ্রাম পড়ল সেটি আমাদের নৌকার মাঝিদের গ্রাম। এখানেই আমাদের নৌকাযাত্রা শেষ। মাঝিরা বলেছিল এখান থেকে হাঁটা পথে সম-য়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু নিজেদের গ্রামে পা দিয়েই তাদের আর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো গরজ দেখা গেলো না। আমরা ঠিক করলাম যে, তিন মাইল পথ নিজেরাই পার হয়ে সম-য়ে বিহারে আশ্রয় নেব।

সম-য়ে বিহারে

ব্রহ্মপুত্র নদের জল-সীমা যেখান থেকে শুরু, তিব্বতের উই-যুন অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের শেষও সেখানে। এরপরের অঞ্চলকে দক্ষিণ প্রদেশ অর্থাৎ লো-খা বলা হয়। বিগত দলাই লামার জন্মস্থান ছিল এখানে। বর্তমান টশী লামা, যিনি চীনে আছেন, তাঁরও জন্মস্থান এই লো-খা প্রদেশ। আমি এবং ধর্মকীর্তি সামান্য জলযোগ সেরে সম-য়ে বিহারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বাঁ-দিকে পথ। খানিক দূর গিয়েই অনেকগুলো স্তূপ নজরে পড়ল। স্তূপগুলো খুব বড় নয়, উচ্চতাও তিন-চার হাতের মতো হবে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধগুহার মধ্যে এই ধরনের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো যে পাথরে তৈরি তা প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম মাটির তৈরি, কাছে গিয়ে অবশ্য সে ভুল ভাঙল। এগুলোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। এ রকম অনেকগুলো স্তূপ পার হয়ে আমরা আরও বাঁ-দিকে বাঁক নিলাম। দু'ঘণ্টা চলার পর আমরা সম-য়ে বিহারের চূড়া দেখতে পেলাম। সমতল ভূমিতে অবস্থিত, চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সম-য়ে বিহারের সঙ্গে তিব্বতের আর পাঁচটা বিহার অপেক্ষা আমাদের দেশের বিহারগুলির সঙ্গেই মিলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিহারের চারদিকে বহু নিস্ফলা গাছের বাগান। আমরা বিহারের পশ্চিম দ্বার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, কালো চশমা পরা চীন দেশের জনৈক ভিক্ষু তখন পরিক্রমা করছেন। পরিক্রমা শেষে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। ভিক্ষুর নাম উর্গেন-কুশো। তবে উনি চীনা নন, সিকিমের লোক। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে উনি আমাদের গ্রহণ করলেন এবং আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত দেখে, অল্প কিছু কথাবার্তা বলেই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য লোকজন ডেকে বলে দিলেন। সম-য়ে পৌছেই নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জায়গা পেয়ে গেলাম।

তিব্বতী পুঁথিপত্রে লেখা আছে যে আচার্য শান্তরক্ষিত সম-য়ে বিহারটিকে ভারতের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে নির্মাণ করিয়েছিলেন। ওদন্তপুরী বিহার তৈরি হয়েছিল পাল রাজবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট ধর্মপালের রাজত্ব কালে। আর সম-য়ে বিহারের নির্মাণ কালে তিব্বতের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট টি-সোঙ-দে-চন। সম-য়ে-র নির্মাণ কাল ৩৫১ থেকে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বর্তমান বিহারের সবকটি দালানই কিন্তু প্রাচীন কালের নয়। প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তী কালে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। তবে বিহারের চার কোণে অবস্থিত চারটি ইটের তৈরি স্তূপ এবং স্তূপগুলোর মাথা এখনও আগেকার মতো ছত্র শোভিত, সেগুলোকে দেখে অনুমান হয়, ওগুলো খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। পাশেই চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্রাদি খচিত অনেকগুলো বজ্রযানী স্তূপও আছে।

তবে সেগুলো ইটের তৈরি নয়, মাটির। একেবারে মাঝখানে রয়েছে চুগ-নগ-খঙ-এর মঠ। অনেক কাল আগে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই বিহারের অধিকাংশ ঘর-বাড়িই জ্বলে গিয়েছিল। তারপর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে র-লোচ-ব এই বিহারের পুনরুদ্ধার করেন। বিহারটি চতুষ্কোণ এবং সমস্ত সীমানাই পাঁচ-ছ' হাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চার দিকের চারটি প্রবেশ দ্বার দিয়ে বিহারে ঢোকা যায়। মাঝখানে প্রধান বিহারটির অবস্থান। প্রধান বিহারকে ঘিরে ভিক্ষুদের থাকবার জন্য দোতলা বাসগৃহ।

আচার্য শান্তরক্ষিতের দেহাস্থি

সম-য়ে বিহারের প্রধান অংশটি সম্পূর্ণই প্রায় কাঠের তৈরি এবং তিনতলা। একদম নীচের তলায় রয়েছে একটি বুদ্ধমূর্তি। বাইরে একপাশে একটি বৃদ্ধের মূর্তি যার মুখে একটি মাত্র দাঁত অবশিষ্ট আছে। শুনলাম এইটিই নাকি আচার্য শান্তরক্ষিতের মূর্তি। তার পাশেই আচার্যের এ দেশীয় শিষ্য বৈরাচনের ও আর এক পাশে সম্রাট টি-সোঙ-দে-চন-এর মূর্তি আছে। আচার্য শান্তরক্ষিত যখন একশো বছর অতিক্রম করে মহানির্বাণ লাভ করেন তখন বিহারের পূর্ব দিকে এক পাহাড়ের সানুদেশে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথানুসারে তাঁর দেহ জ্বালানো হয়নি। পরে তাঁর সমাধির ওপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। পাহাড়ের কোলে শায়িত থেকে আচার্য শান্তরক্ষিত সহস্র বছর ধরে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, এই বিহারকে দেখে আসছিলেন। সম্প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ বছর হলো স্তূপটি জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে এবং সেখান থেকে সমাহিত আচার্যের বিশাল করোটি এবং অস্থি পঞ্জর বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তখন সেগুলোকে সংগ্রহ করে একটা কাচের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। বাক্সটি এখনও বিহারেই আছে। আমি যখন সেই দেহাবশেষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শুধু যদি জানতাম যে এগুলো এমন এক মহাজ্ঞানী পুরুষের দেহাস্থি, যিনি আমার দেশের ধর্ম, দর্শন, কৃষ্টিকে হিমালয় অতিক্রম করে এ দেশের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেটাই আমাকে বিমুগ্ধ রাখার পক্ষে যথেষ্ট হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বরোদা থেকে প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্বসংগ্রহ' আমি পড়েছি। আচার্য শান্তরক্ষিত রচিত এই গ্রন্থটিকে এক মহান্ সৃষ্টি বলে সারা পৃথিবী এক বাক্যে রায় দিয়েছে। আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর এই মহামূল্য গ্রন্থে পাঁচ হাজার শ্লোকের মধ্যে সমস্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধদর্শন শাস্ত্রে যাঁদের বলা হয় ত্রিমূর্তি, আচার্যদেব তাঁদের অন্যতম, বাকী দু'জন হলেন দিঙনাগ ও ধর্মকীর্তি। আচার্য শান্তরক্ষিত তাঁর ৭৫ বছর বয়সে এ দেশের দুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে এমন এক মহান্ উদাহরণ

রেখে গেছেন যা আজকের দিনের পণ্ডিতদেরও ভাবিয়ে তুলবে, তাঁরা চল্লিশ বছর পার হতে না হতেই নিজেদের বৃদ্ধের দলে ফেলে স্মৃতিচারণায় মগ্ন হয়ে যান। আচার্যের দেহাস্থির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মনে হচ্ছিল যদি কোনো রকমে এই নিদর্শন দেশে নিয়ে যেতে পারতাম, তা'হলে এই দেহাস্থি এবং মহান্ গ্রন্থ তত্ত্বসংগ্রহকে সামনে রেখে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে পারতাম —এই মহান্ লোকটি শুধু মাত্র একজন পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি বুদ্ধের অনুশাসনের অনুসারী হয়ে জরা বার্ধক্যকেও জয় করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তুষার-মৌলী হিমালয়ের দুর্গম গিরি-সঙ্কট সমূহ পার হয়ে ছিলেন কোনো পার্থিব ভোগসুখের জন্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি-কৃষ্টির যে মহান্ আলো একদিন আমাদের দেশকে আলোকিত করত, তারই খানিক এ দেশে পৌঁছে দেওয়া। সেইদেশ থেকেই আমি আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছি। এ কথা কটা সারা দেশে কি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করত, দেশবাসী কি গভীর শ্রদ্ধায় এই দেহাবশেষকে গ্রহণ করত তা ভাবতেও আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, আমার হৃদয়, আবেগে শ্রদ্ধায় দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছিল। আর সকলে আমাকে ঐ রকম আচার্যের দেহাস্থির সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি ভাবছিল কে জানে।

বিহারের দুরবস্থা

বিহারের দ্বিতলে অভি-তায়ু-র মূর্তি আছে। তিনতলা এখন খালি। যে ভিক্ষুটি আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিল সে বলল —দেখুন সে কালের কি নিপুণ নির্মাণশৈলী। এই বিশাল ঘরের এত বড় ছাদ কিন্তু কোনো স্তম্ভ ছাড়াই রয়েছে। এখান থেকে নেমে দ্বীপ দেখতে গেলাম, বিহারের চতুঃসীমার মধ্যে ছোট ছোট অঙ্গন যুক্ত কুটির আছে সেগুলোকেই গ্লিং অথবা দ্বীপ বলে। সম-য়ে বিহারে এ রকম দ্বীপের সংখ্যা এক ডজন। প্রথম দ্বীপটির নাম জম্বুদ্বীপ, এখানে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। এর পাশেই রাণী নে-তুঙ-চুন-মো-র চন্দন কাঠের মূর্তি। সম্ভবত এই রাণীই এই দ্বীপটির প্রতিষ্ঠাত্রী। এরপরের দ্বীপটির নাম গ্যা-গর-গ্লিং অর্থাৎ ভারত দ্বীপ। এক সময় এখানে ভারতীয় পণ্ডিতদের বাস ছিল। এখানে বসে তাঁরা তাঁদের তিব্বতী সহকর্মী এবং অনুগামী শিষ্যদের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সমূহকে তিব্বতী ভাষায় ভাষান্তরিত করার দুরূহ কাজ সম্পাদন করতেন। এ রকম ভাবে প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থের তর্জমার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল যার মূল গ্রন্থ আমাদের দেশে নানা ধরনের বিদেশী হামলার ফলে এবং দেশবাসীর সঠিক চেতনার অভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন ঐ সমস্ত গ্রন্থের জন্য আমাদের এ দেশের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য দীপঙ্কর যখন এই বিহারে এসেছিলেন তখন তিনি বিহারের গ্রন্থাগারে সংস্কৃত

ভাষার সংগ্রহ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন —এখানে এমন অনেক গ্রন্থ দেখতে পাচ্ছি যা আমাদের দেশেও নেই।

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য মানব জাতির —এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই মহামূল্য রত্নভাণ্ডার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যারা এই বিহারের রক্ষক তাদের কথা না বলাই ভালো। কেউ কেউ তো দেখলাম ধর্মের অনুশাসন শিকেয় তুলে রেখে আপন রক্ষিতাকে নিয়েই বাস করছে। এখানে জনৈক ভিক্ষুর কাছ থেকে পদ্ম-ক-থঙ (পদ্মসম্ভবের জীবনচরিত)-এর এক প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি ও খান পঁচিশ চিত্রপট কিনলাম। এ দেশে সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রাও তামার তার ফলে বেশী অর্থ সঙ্গে নেবার অর্থই হলো একটা বোঝা বয়ে বেড়ানো। সঙ্গে বেশী অর্থ না থাকায় আরও অনেক দুর্লভ ছবি, পুঁথি এবং মূর্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না।

চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর

ফেরার পথে উর্গেন-কুশো ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়ায় খুবই সুবিধা হলো। আচার্য শান্তরক্ষিতের সুমহান্ কীর্তিকে প্রণাম জানিয়ে সম-য়ে ত্যাগ করলাম। চার-পাঁচ মাইল চলার পর হুঙ-গো-চঙ-গঙ গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আলাপ পরিচয় হবার পর লোকটি আমাদের আবার সম-য়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করল এবং ফিরে যেতে যা খরচ-খরচা লাগবে তা সবই সে বহন করবে এমন প্রস্তাবও করল। কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অনুরোধ রাখা সম্ভবপর ছিল না। আমাদের পথ এ বার উচ্চ মালভূমির মধ্য দিয়ে। রাস্তাও খুব ভালো, ঘণ্টা দুই-আড়াই চলার পর পথের ধারে একটি এক-কক্ষের বাড়ি দেখতে পেলাম। শুনলাম এই জায়গাটি সম্রাট স্রোঙচেন-ল্দে-বচন-এর জন্মস্থান। আরও খানিক এগিয়ে একটা বড় ধরনের গ্রাম পড়ল। গ্রামটি যদিও বড় কিন্তু অধিকাংশ বাড়ি-ঘরই দেখলাম জনশূন্য। আরও এগিয়ে হুঙ-গো-চঙ-গঙ গ্রাম, সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। কয়েক সপ্তাহ স্নান করা হয়নি। এখানে গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছোট স্রোতধারাটিকে দেখে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না, নেমে পড়লাম। অনেক দিন পর সাবান সহযোগে মহানন্দে স্নান করে নিলাম। পরদিন সকালে উঠে আবার বেরিয়ে পড়লাম। গত রাত্রির আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা সামনের গ্রাম পর্যন্ত যাবার জন্য দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সেখান থেকে যাতে আমরা আমাদের অবশিষ্ট পথের জন্য ঘোড়া পেতে পারি সেই মর্মে তাঁর এক বন্ধুকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন। এ দিককার পথে চড়াই খুব দুরূহ না হওয়ায় সহজেই চলতে পারছিলাম এবং আঠার হাজার ফুট উচ্চতায় যে রকম ঠাণ্ডা লাগা উচিত সে রকমও কিছু পেলাম না। কিছু দূর যাবার পর রাস্তার ডান-দিকে একটা পুরানো বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। এই ধ্বংস কার্যটি সমাধা হয়েছিল

মঙ্গোল সর্দার গু-শী খানের বাহিনীর দ্বারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই মঙ্গোল গু-শী খানই সমস্ত তিব্বত জয় করে দলাই লামাকে তার শাসন ভার অর্পণ করেন। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা আবার সেই উই-ছু-র (লাসাভিমুখী নদী) ধারে ছেন-জোঙ গ্রামে পৌঁছালাম। এই গ্রামটির অবস্থান চীন-মঙ্গোলিয়ার বাণিজ্য চলাচল-পথের ধারে। গ্রামের বাইরে একটা টিলার ওপর ছোট মতো একটা বিহার আছে তা'ছাড়া একটা সরকারী কাছারীও আছে। থাকবার জায়গা খুব সহজেই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে সুপারিশ পত্র থাকা সত্ত্বেও অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হলো। অনেক কষ্টে আমার জন্য একটা ঘোড়া যোগাড় করা গেলো। কিন্তু ধর্মকীর্তি বেচারার হাঁটা ছাড়া কোনো গত্যন্তর রইল না। এখান থেকে গঙ-দন মঠ পুরো একদিনের পথ। প্রসিদ্ধ সংস্কারক চোঙ-খ-পা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মঠকে তাঁর পীঠস্থান করেন। চোঙ-খ-পা-র মৃত্যুও হয় এই মঠে। বর্তমান তিব্বতের সংস্কারবাদী পীত টুপীধারী সম্প্রদায় (দলাই লামা এবং টশী লামাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত) এই মঠের নামানুসারে গঙ-দন-পা নামেও ভূষিত হয়। গঙ-দন সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল। সে জন্য লাসা ফেরবার পথে ওখানে একবার হয়ে যাওয়া ঠিক হলো। ১৩ই এপ্রিল আমি ঘোড়ায় চড়ে আর ধর্মকীর্তি পদব্রজে গঙ-দন রওনা হলাম। আমাদের সংগৃহীত সমস্ত জিনিস বস্তায় পুরে মুখ সেলাই করে গালার মোহর এঁটে ছেন-জোঙ গ্রামেই রেখে এলাম।

পথের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন। এই দিনটিতে গঙ-দন-এ বড় মেলা বসে, উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে জন্যই বহু লোক চলেছে সে দিকে। চারদিকে শুধু হরিতাভ শূন্য রুক্ষ উপত্যকা। গঙ-দন-এর কাছাকাছি থেকেই শুরু হলো দুরূহ চড়াই। গঙ-দন বিহারটি পাহাড়ের একটা উঁচু চূড়ার ওপর। সে-রা অথবা ডে-পুঙ মঠে যেতেও এত উঁচু চড়াই ভাঙতে হয়নি। বিহারের কাছাকাছি কোনো ঝর্ণা অথবা অন্য কোনো জলের উৎস না থাকায় দূর থেকে ঘোড়া কিম্বা খচ্চরের পিঠে জল বয়ে এখানে আনতে হয়। ধর্মকীর্তির পরিচিত একজন মঙ্গোল ভিক্ষু এখানে ছিলেন। আমরা তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে গঙ-দন পরিক্রমায় বের হওয়া গেলো। প্রথমে গেলাম যেখানে চোঙ-খ-পা-র পবিত্র দেহাবশেষ রাখা আছে সেই স্তূপ দেখতে। এরপর গেলাম সেই মহান্ সংস্কারক যেখানে থাকতেন, সেই জায়গাটি দেখতে। যেখানে বসে চোঙ-খ-পা তাঁর সংস্কারধর্মী গ্রন্থাদির রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন, সেই কাষ্ঠাসনটিও দেখলাম। শুনলাম চোঙ-খ-পা-র সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিই একটা বাক্সের মধ্যে সুরক্ষিত আছে। এখানেও বিহারের মধ্যে সোনা-রূপোর ছড়াছড়ি। নীচে নেমে আমরা উপাসনা গৃহে গেলাম। বিরাট একটি হলঘর যাতে একশো আটটি স্তম্ভ রয়েছে, সেটিই গঙ-দন বিহারের উপাসনাকক্ষ। এখানেই সমস্ত

ভিক্ষুরা মিলিত হয়ে থাকেন। এই কক্ষে চোঙ-খ-পা-র সিংহাসনটি রক্ষিত আছে। এ সময় গঙ-দন-এ বিশেষ উৎসব চলছিল। সে জন্য উপাসনা কক্ষটিতে নানা রঙের সত্তুপিণ্ডের মূর্তিও গড়া হয়েছে। এক জায়গায় দেখি দলাই লামার একটি প্রমাণ সাইজের মূর্তি। বর্তমানে গঙ-দন-এ ভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এখানে একটি ড-ছঙ এবং তিন জন খন-পো আছেন। নিয়ম কানুন সবই সে-রা বা ড়ে-পুঙ বিহারেরই মতো। আমরা যে মঙ্গোল ভিক্ষুর আবাসে আশ্রয় নিয়েছি শুনলাম তিনি নাকি মঙ্গোল বীর গু-শী খানের বংশধর এবং সে জন্য এই মঠে তাঁর খাতিরও অনেকের চেয়ে বেশী। আগে এখানে প্রচুর মঙ্গোল ছাত্র এবং ভিক্ষুর আনাগোনা ছিল কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। এই কমে যাওয়ার কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। মঙ্গোলিয়ায় সোবিয়েত ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এখানে ছাত্র আসা খুবই কমে গেছে।

দরিদ্র গ্রামবাসীর কুটিরে

১৪ই এপ্রিল বেলা বাড়বার আগেই গঙ-দন থেকে বেরিয়ে দুপুরের কাছাকাছি ছেন-জোঙ গ্রামে আবার ফিরে এলাম। পথে ধর্মকীর্তির পরিচিত আর একজন মঙ্গোলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো। মঙ্গোলটি অবশ্য একা ছিলেন না, সঙ্গে তাঁর খম দেশীয় একজন সঙ্গিনী। সবাই মিলে ঠিক করলাম এখান থেকে লাসা পর্যন্ত 'ক্য' যোগে যাব। দুই সাং (প্রায় বারো আনা) কবুল করে 'ক্য' ভাড়া করা হলো। খুব ভোরে রওনা হব বলে রাতটা মাঝিদের কুটিরেই কাটালাম। ভোরবেলা উঠে দেখি যথেষ্ট যাত্রী না হওয়ায় মাঝিরা নৌকা ছাড়তে চাইছে না। অবশেষে দ্বিগুণ ভাড়া কবুল করায় নৌকা ছাড়তে আর আপত্তি করল না। যে মাঝিদের কুটিরে আমরা গত রাত্রিতে ছিলাম তাদের চেয়ে দরিদ্রতর অবস্থার লোক সারা তিব্বতে এতদিনেও আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু কি আশ্চর্য ঐ রকম চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা তাদের কুটিরে দু'চারখানা সুন্দর চিত্রপট এবং কয়েকটি মৃন্ময় মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে এমনই শিল্পবোধ। জলপথের দু'পাশের গ্রাম ও পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। দু'ঘণ্টা চলার পর ডান-দিকে হের-বা পাহাড় দেখা গেলো। আচার্য দীপঙ্কর বহু দিন ঐ পাহাড়ে বাস করেছেন। দুপুরের কাছাকাছি আমরা লাসা পৌছে গেলাম।

৫ই এপ্রিল লাসা ছেড়ে যখন যাই তখনও শীতের প্রকোপ বেশ ভালো রকমই ছিল, আর ১৫ই এপ্রিল ফিরে এসে দেখলাম বেশ গরম পড়ে গেছে। আরও দেখলাম ভারতীয় টাকার দাম বেড়ে গেছে। এতে আমার আরও সুবিধা হলো। সাড়ে তের দোর্জে একটা কঞ্জুর কেনার ব্যবস্থা হয়েছিল, এ বার সেটা কিনে ফেললাম।

১৯শে এপ্রিল লাসাতে শুরু হলো দ্বিতীয় উৎসব। তবে এটি আগেরটির তুলনায় অনেক ছোট মাপের। এ বার আমার সংগৃহীত জিনিসপত্র গোছগাছ করা, প্যাক ইত্যাদির ব্যবস্থায় লেগে পড়লাম। চিত্রপট এবং কিছু মূল্যবান পুঁথিপত্র মোম মাখানো চটের থলিতে ভরে কাঠের বাক্সে প্যাক করলাম। বাক্স গুলিকেও আবার বাইরে থেকে ইয়াকের চামড়া দিয়ে সেলাই করলাম। এর ফলে আমার কোনো জিনিস নষ্ট হয়নি। কিছু কিছু বই পুঁথিপত্র অবশ্য আগেই খচ্চরের পিঠে গ্যাংচী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তঞ্জুর গ্রন্থটি প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেও লাসাতে যখন পাওয়া গেলো না তখন বাধ্য হয়ে ঠিক করলাম নর-থঙ ছাপাখানায় গিয়ে ওটি ছাপিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব। অতএব এ বার নর-থঙ যাবার পালা।

নবম পর্ব

গ্রন্থ সন্ধানে

আবার টশী-লুন-পো

পথের জন্য দুটো খচ্চর কেনা সাব্যস্ত করেছিলাম, বন্ধু-বান্ধব যারা ছিল, তারাও এতেই সায় দিলো এবং বলল কালিম্পঙ বাজারে আবার যদি খচ্চর দুটোকে বিক্রী করে দিই তা'হলে একরকম নি-খরচায় দেশে ফেরা হয়ে যাবে। অতএব দেখেশুনে দুটো মাদী খচ্চর কেনা হলো। দাম পড়ল যথাক্রমে সাড়ে আট এবং সাড়ে পাঁচ দোর্জে।

২৩শে এপ্রিল সকাল সাড়ে নটা নাগাদ লাসা থেকে বিদায় নিলাম। বিগত সওয়া নয় মাস ছু-শিঙ-শা-র কুঠিতে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ছিলাম। কুঠিয়াল জ্ঞানমান সাহু তাঁর সহকারী ধীরেন্দ্রবজ্র, কুঠিয়ালের এ দেশীয় স্ত্রী এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। এদের সাহচর্যে লাসাকে কখনও বিদেশ বিভূঁই বলে মনে হতো না। তা'ছাড়া এ দেশে আমার যে সমস্ত আরব্ধ কাজ ছিল সে সবের সম্পাদনেও ছু-শিঙ-শা-র কুঠির প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সাহায্য ছিল। এদের সকলকে ছেড়ে আসবার সময় মনে হচ্ছিল, নিজের একান্ত প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছি। সকলেই আমাকে এগিয়ে দিতে শহরের বাইরে পর্যন্ত এলেন। এরপর পোতলা প্রাসাদের গা-ঘেঁষে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় চলা শুরু করলাম। একটা সময় ছিল যখন নিজের চোখে পোতলা প্রাসাদ দেখতে পাব ভাবাটাই ছিল চাঁদ চাওয়ার মতো, কিন্তু বিগত কয়েকমাসের ক্রমাগত দর্শনের ফলে এই প্রাসাদ তার মহিমা যেন অনেকখানি খুইয়ে বসেছে। আমাদের সঙ্গে খাবার-দাবার, অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র ছাড়াও ছিল দুটি পিস্তল এবং বেশ কিছু কার্তুজ। ধর্মকীর্তি তো কার্তুজের মালা গলায় ঝুলিয়ে পিস্তলটিকে কোমরে বেঁধে চলছিল। আমি অবশ্য অতটা না করলেও পিস্তলটি প্রকাশ্যেই রেখেছিলাম। এ দেশের পথে-ঘাটে ডাকাতি, লুণ্ঠন হামেশাই ঘটে। সে জন্য আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলাম। আজকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল রে-থঙ গিয়ে বিশ্রাম নেবার। সেই ফাঁকে ওখানকার বিখ্যাত তারা মন্দিরটিও দর্শন করবার ইচ্ছা ছিল। ঐ তারা মন্দিরেই আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁর অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। দুপুরবেলা রে-থঙ পৌঁছে

গেলাম এবং থাকবার জন্য সেই বাড়িটিকেই ঠিক করলাম, যেখানে ন'মাস আগে এ পথে আসবার সময় রাত্রি যাপন করেছিলাম। বাড়ির কর্ত্রীঠাকরুণ অবশ্য আমাকে চিনতে পারলেন না, যদিও মহিলার এ কথা স্মরণ ছিল যে, কিছুদিন আগে জনৈক ভিক্ষুক শ্রেণীর লাদাখী এ পথ দিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর কাছে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। চা খেয়ে খানিক বিশ্রাম নিলাম, তারপর তারা মন্দির দেখতে বের হলাম। রে-থঙ গ্রাম থেকে তারা মন্দিরের দূরত্ব বেশী নয়, সে জন্য খচ্চরের পিঠে না গিয়ে হেঁটে যাওয়াই ঠিক করলাম। ধর্মকীর্তি আমাদের ভারবাহী দুটোর দেখাশোনা করার জন্য থেকে গেলো। স্থানীয় একটি বাচ্চা মেয়ে আমার পথ-প্রদর্শিকা হলো। রে-থঙ ছেড়ে কিছু দূর গিয়ে আর একটি ছোট জনবসতি অতিক্রম করলাম। সেখান থেকে তারা মন্দির দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন খুব কাছে, বস্তুতপক্ষে তা নয়। তিব্বতে বাতাস খুব পাতলা এবং স্বচ্ছ। সে জন্য প্রায়শঃই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। অনেক দূরের জিনিসকেও খুব কাছের বলে ভ্রম হয়। আরও প্রায় মাইল দুই হাঁটার পর তারা মন্দিরে পৌছালাম। এ দেশের অন্যান্য মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানের মতো এ মন্দিরটিও আজ উপেক্ষিত, জীর্ণ। দেবালয়ের বাইরে মোটা মোটা রক্তচন্দন কাঠের স্তম্ভ। দেখেই বোঝা যায় মন্দিরটি অন্ততপক্ষে আটশো বছরের প্রাচীন। মন্দিরের বর্তমান বাসিন্দারা দেখলাম সকলেই বাচ্চা ছেলে। মন্দিরের পূজারী থেকে আরম্ভ করে বাসিন্দাদের সকলকেই কিছু কিছু করে পয়সা দিলাম। তারপর তাদের উৎসাহ দেখে কে? সকলে মিলে মহা উৎসাহে আমাকে মন্দিরের সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে যেটিকে কিঞ্চিৎ বয়স্ক মনে হলো, তাকে বললাম —আমি যে দেশ থেকে এসেছি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশও ছিলেন সেই দেশের মানুষ। মন্দিরের অভ্যন্তরে আচার্য দীপঙ্করের ইষ্ট তারা দেবীর একুশটি বিভিন্ন ধরনের মূর্তি রক্ষিত আছে, এ ছাড়া মন্দিরের বাঁ-দিকের এক কোণে একটা লৌহ পেটিকায় দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড, তামার তৈরি জলপাত্র ইত্যাদি সযত্নে রাখা আছে। আমি অবশ্য জিনিসগুলোকে দেখতে পেলাম না। কারণ পেটিকাটি বন্ধ ছিল এবং তার ওপরে দলাই লামার শীলমোহর লাগানো ছিল। মন্দিরের পিছনে ভেতরের দিকে তিনটি পেতলের স্তূপ ছিল। শুনলাম ঐ স্তূপ তিনটির একটিতে আছে দীপঙ্করের পাত্র, আর একটিতে সিদ্ধ করো-পা-র হৃদপিণ্ড এবং তৃতীয়টিতে আচার্যের প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন-এর বস্ত্র রক্ষিত আছে। সমস্ত কিছু ঘুরে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। এরপর আমার ছোট্ট পথ-প্রদর্শিকার সঙ্গে রে-থঙ গ্রামে ফিরে এলাম।

২৫শে এপ্রিল ভোরে রে-থঙ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিজেদের খচ্চর অতএব চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই গ্যাংচী পৌছে যেতে পারব মনে হচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারে চাষের জমি, সেখানে ইয়াকের সাহায্যে হাল দেওয়া হচ্ছে। ইয়াকগুলোর

সারা শরীর লম্বা লম্বা লাল পশমে ঢাকা। কিন্তু দুপুরবেলা আমরা যখন ছু-শার-এ গিয়ে পৌছালাম, সেখানে দেখলাম ক্ষেতে ফসল বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছে। এখানে গাছগুলোর পাতার সাইজও বেশ বড় বড়। এখন আমার আর ভিখারীর বেশ নেই, পরনে লম্বা পোস্তীনের চোগা, মাথায় রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ফেল্ট হ্যাট, কোমরে পিস্তল ঝুলছে। অতএব ছু-শার-এ গিয়ে সবচেয়ে ভালো বলে যে বাড়িটাকে মনে হলো, সেখানে গিয়ে উঠলাম। বলা বাহুল্য আমাদের বেশ ভূষা দেখে বাড়ির উৎকৃষ্টতম ঘরটিই আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো। বাড়ির কর্ত্রী-ঠাকরুণও একটু বেশী রকমই খাতির যত্ন করতে লাগলেন। গৃহকর্ত্রী একজন আধা চৈনিকের স্ত্রী। বেচারীর স্বামী বহু দিন ধরে গৃহত্যাগী। না সে লোকটি এখানে আসে, না দেয় কোনো খবরাখবর। অনেক কষ্টে মহিলাটি জানতে পেরেছেন যে তাঁর স্বামী কালিম্পঙে আছে। অশ্রু সজল চোখে বেচারী আমাকে কালিম্পঙে তাঁর স্বামীর খোঁজ করতে অনুরোধ জানালেন।

পরদিন ভোরে উঠে চায়ের পর্ব চুকিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া গেলো। ব্রহ্মপুত্র পার হবার ঘাট এখন আর বেশী দূরে নয়। নদী এখানে অপ্রশস্ত এবং স্রোতের বেগও যথেষ্ট কম। নদী পার হয়ে আমরা পাঁচ জন একসঙ্গে চলতে লাগলাম। সঙ্গীদের তাড়া থাকায় আমরা বেশ দ্রুতবেগে চলে খম-বো-লা চড়াই পার হয়ে দেখলাম একদিকে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ ধারা আর একদিকে নগ-রে-র বিশাল হ্রদ। এরপরই উৎরাই। এ বার খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। উৎরাইয়ের শেষে হম-লুঙ নামে ছোট একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত হলো। আমাদের সঙ্গী তিন জন পেশায় সওদাগর সে জন্য এই পথের সমস্ত গ্রাম, জনবসতি ও লোকজন তাদের পরিচিত।

২৭শে এপ্রিল ভোর থেকেই খুব ঝড়ো হাওয়া বইছিল। তবু তার মধ্যেই বের হতে হলো। আমরা বাতাসের বিপরীত দিকে চলছি। হ্রদের কিনারা ধরে রাস্তা। এ জায়গার উচ্চতা তের হাজার ফুট। তার ওপর ঝিলের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। হ্রদের পাড়ে জায়গায় জায়গায় সামান্য কিছু তুষারপাতও হয়েছে। ঠাণ্ডার জন্য না অন্য কোনো কারণে জানি না আমার ঘড়িটি পকেটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে বসে ছিল। অতএব সময় বোঝবার কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা না থাকায় আন্দাজেই কাজ চালাতে হচ্ছিল। সামনের একটা গ্রামে খানিক থেমে দুপুরবেলার আহারাদি সেরে নিলাম। এ দিকে বাতাসের বেগ কোনোমতেই কমছে না। সবচেয়ে কষ্টকর যখন বাতাসের দাপটে ছোট ছোট বালিকণা, কাঁকর মুখে এসে ঝাপটা মারছিল। খম-বো-লা পার হবার সময় হাতে মুখে ভেসলিন মেখে যতটা সম্ভব শরীর কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলাম। কিন্তু এখানে কোনো উঁচু চড়াই না থাকায় খানিকটা বেপরোয়া হয়ে হাত মুখের কাপড়ের ঢাকনা খুলে পথ চলছিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত

মুখ সব কালিবর্ণ হয়ে গেলো। তবে ধর্মকীর্তির ওপরে এই সমস্ত ঝড়ো বাতাসের কোনো প্রক্রিয়া হতে দেখলাম না। কোনো ক্রমে বিকেলের দিকে গা-চে পৌছালাম, এখানে একজন জোঙ-পোন অর্থাৎ জিলা অধিকর্তা থাকেন। ঠাণ্ডার জন্য এ অঞ্চলে চাষ-বাসের কাজ এখন বন্ধ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে এখানকার অবস্থান। সে জন্য এ সমস্ত এলাকার পশম খুব নরম এবং মোলায়েম। আমিও এখান থেকে কালো রঙের একটা চুকটু কিনে ফেললাম।

২৮শে এপ্রিলও আগের দিনের মতো ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে পড়লাম। গতকাল পর্যন্ত দেখেছি ধর্মকীর্তি মাথায় কিছু চাপায়নি। কিন্তু আজকের ঠাণ্ডা তাকেও কাবু করেছে। আমরা চলছিলাম যেন ডাক-চলাচলের গতিতে। সামনে একটা 'লা' পার হয়ে যেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম, আমি এ দেশে আসবার পথেও সেখানেই রাত্রিবাস করেছিলাম। এখন যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। সর্বত্র প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। কয়েক মাইল উৎরাই ভেঙে রা-লুঙ গ্রামে আসার পর, ঠাণ্ডার প্রকোপ যেন একটু কম মনে হলো। এখানে দেখলাম চাষের কাজ চলছে। এর আগে এ পথে আসার সময় লোঙ-মোর গ্রামে থেমেছিলাম, এ বারও সেখানেই স্থিতি। একজন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলাম।

গ্যাংচীর বৃটিশ দূতাবাস

পরদিন ২৯শে এপ্রিলও ঠাণ্ডা এতটুকু কমল না। আমাদের পথ ছিল নদীর পাড় ধরে। নদীর সমস্ত জলই বরফে পরিণত হয়ে গিয়েছে, চারদিকের গাছপালাতেও শীতের আমেজ, পাতা ঝরার পালা, বসন্ত এখনও দূর-অস্ত্। দুপুরের মধ্যেই গ্যাংচী পৌছে গেলাম। আমরা লাসা ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায় সাড়েপাঁচ দিন হলো। আমার সওদাগর সহযাত্রীদের লেগেছে চার দিন। গ্যাংচীতে ছু-শিঙ-শা-র শাখা গ্যাঙ-লিঙ-ছোপ্পাতে গিয়ে উঠলাম। এখানে স্রেফ নিশ্চিন্তে দু'রাত্রি বিশ্রাম নিলাম: একদিন বৃটিশ রেসিডেন্টের কার্যালয়ে গেলাম। রেসিডেন্টের অফিসটি অনেকটা কেল্লার মতো করে তৈরি এবং সে রকমই সুদৃঢ়। স্থানীয় লোকেও এটাকে কেল্লাই বলে। রেসিডেন্ট ভবনের চারদিকের যে প্রাচীরটিকে মাটির তৈরি বলে মনে হয়, আসলে তা লোহা এবং পাথর দিয়ে গড়া। বৃটিশ ডাক বিভাগের অফিসও এই রেসিডেন্সীর চৌহদ্দির মধ্যেই। শুনলাম বেশ কিছু স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রও এখানে মজুত আছে। দূতাবাসের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য শ'খানেকের ওপর সৈনিকও আছে। অতীতে যখন দলাই লামার সরকারের সঙ্গে ইংরেজদের খুব দহরম-মহরম ছিল তখন ইংরেজরা এখানে বেশ কয়েকশো একর জমি কায়দা করে হাতিয়ে নিয়েছিল। এখন সে জমিতে চাষ-বাস হয় এবং কয়েকশো প্রাক্তন গোর্খা সৈন্য এই কাজ দেখাশোনা করে। গ্যাংচীতে অবস্থিত বৃটিশ দূতকে বলা হয় ট্রেড

এজেন্ট। তিব্বতের সঙ্গে সন্ধির শর্ত অনুসারে বৃটিশ সরকার এ দেশে কোনো রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি রাখার অধিকারী নন, তাই বাধ্য হয়ে তাঁদের রেসিডেণ্টকে ট্রেড এজেণ্টের ছদ্ম আবরণ নিয়ে চলতে হচ্ছে। রেসিডেন্সীতে বাণিজ্য প্রতিনিধি, তাঁর সহকারী এবং একজন ডাক্তার এই তিন জন সব সময় ইংরেজদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হয়। তবে সিপাই-সান্ত্রীরা অধিকাংশ ভারতীয় অথবা নেপালী। রেসিডেন্সী ভবনে বৃটিশ সরকারের টেলিগ্রাফের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, তা'ছাড়া একদিন অন্তর ডাক-চলাচল ব্যবস্থা তো আছেই।

আবার শীগর্চী

১লা মে আমি আর ধর্মকীর্তি টশী-লুন-পো-র উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আকাশ যদিও একটু মেঘলা ছিল কিন্তু তা আমাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে গেলাম, আর তার সঙ্গে শুরু হলো তুষারপাত। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নির্দিষ্ট ছিল না, অতএব সহজেই পথ হারিয়ে চাষের জমিতে চলে এলাম। অনেক কষ্টে মোটামুটি দিক ঠিক করে সেই দিকে চলে কাছাকাছি একটা গ্রামে পৌছালাম। এখন তো আমি একজন কুশোক (সম্ভ্রান্ত লোক) তাই কোথাও আশ্রয় পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিল না। ভালো দেখে একটা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে চা ডিমসেদ্ধ খেয়ে এবং বাড়ির ভৃত্যদের ছঙ পানের জন্য কিছু বখশীস দিয়ে পুনরায় রওনা হলাম। যদিও রাস্তায় তুষারপাত এবং ঝড়ো হাওয়া চলছিল খুবই তবু আসবার সময় যে রাস্তা অতিক্রম করতে তিন দিন লেগেছিল তা একদিনেই পার করে তো-সা গ্রামে পৌছে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। পরদিন সকালে সেখান থেকে রওনা হয়ে কোথাও না থেমে সোজা পৌছালাম টশী-লুন-পো।

তঞ্জুর ছাপার খোঁজে

টশী-লুন-পো এসে দেখি আমার পরিচিত নেপালী ব্যবসায়ী ঢাক্কা সাহু এখানে নেই। শুনলাম তিনি গোলমালের সময় ব্যবসাপত্র এক রকম ফেলেই দেশে চলে গিয়েছেন। তবে ভাগ্য ভালো ছিল, তাই সাহু মণিরত্নের দেখা পেয়ে গেলাম। উনিই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। লাসার ছু-শিঙ-শা-র গদী থেকে এখানকার একজন ব্যবসায়ীর নামে একখানা চিঠি এনেছিলাম, কথা ছিল যে চিঠিটি দেখালেই আমি আমার প্রয়োজন মতো অর্থ পেয়ে যাব। অতএব এখন সেই ব্যবসায়ীটিকে খুঁজে বার করা দরকার। ছোট জায়গায় একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তার ঠিকানা পেয়ে গেলাম। ঠিকানা মতো গিয়ে আমার চিঠিটা দেখালাম। চিঠি

পড়ার পর লোকটি কিন্তু টাকা-পয়সা দেবার ব্যাপারে বেশ গড়িমসি করতে শুরু করল। প্রথম দিন আমি কোনো কথা না বলেই ফিরে এলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ভাবনা হতে লাগল, যদি লোকটি চিঠির নির্দেশ মতো টাকা না দেয়, তা'হলে তো আমাকে আবার সেই গ্যাংচীতে ফিরে গিয়ে টাকা চেয়ে টেলিগ্রাম করতে হবে এবং অকারণে প্রচুর সময় নষ্ট হবে। দ্বিতীয় দিন আবার লোকটির কাছে গেলাম। সে দিনও তার সেই একই রকম ভাব। এ দিকে আমার সমস্ত কাজকর্ম টাকার অভাবে থেমে আছে। এখনও আমাকে নর-থঙ থেকে তঞ্জুর ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা'ছাড়া টশী-লুন-পো থেকে টশী লামার পুরানো পুঁথিপত্র ইত্যাদি কিছু সংগ্রহ করাও বাকি আছে। দুপুরের পর অগত্যা সাহু মণিরত্নের শরণাপন্ন হলাম। বললাম, আপনি লোকটিকে বলুন অন্তত হ্যাঁ বা না, যা হোক একটা স্পষ্ট করে বলুক। প্রথমে মণিরত্নের সঙ্গেও সে একই রকম টালবাহানা শুরু করল। একবার বলে চিঠিতে মালিকের যথোপযুক্ত সীলমোহর নেই, তা'ছাড়া সামান্য একটা চিঠির ওপর ভরসা করে এত টাকা দিতে একটু কিন্তু কিন্তু লাগছে। যাই হোক মণিরত্ন সাহু মাঝখানে থাকার জন্যই বোধ হয় অবশেষে সে আমার প্রাপ্য অর্থ দিতে রাজি হলো। এখানে কনৌরের রঘুবর এবং ভিক্ষু-সোনম-ছেরিঙ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওরা দু'জনে তো আমাকে দেখে মহা খুশী। সমস্ত কিছু শোনার পর ওরা মহানন্দে আমার কাজে সাহায্য করতে তৈরি হয়ে পড়ল। টাকা পেয়ে সেই দিনই ২২৮ সাং দিয়ে (আড়াই সাং = ১ টাকা) টশী লামাদের গ্রন্থাবলী এবং আরও কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি কিনে ফেললাম। পরদিন ১৩৬ সাং খরচ করে ছাপার কাগজ ও কালি কিনলাম। খোঁজ করে জানলাম সম্পূর্ণ তঞ্জুর ছাপতে পাঁচ-ছ' দিনের বেশী সময় লাগে না। শুনে মনটা নিশ্চিন্ত হলো, যাক এক সপ্তাহের মধ্যেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে পারব।

এর মধ্যে একদিন আমরা দু' জনে নর-থঙ গেলাম। টশী-লুন-পো থেকে নর-থঙ-এর দূরত্ব ছ'সাত মাইল হবে। এখানকার বিহারটি সমতলে অবস্থিত অন্যান্য বিহারের মতো উঁচু টিলার ওপরে নয়। বিহারের চতুর্দিক হাত দশেক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এখানকার ছাপাখানার ভার যার ওপর, সে লোকটি তেমন কর্মতৎপর না হওয়ার ফলে, এই বিহারের যিনি প্রধান তাঁকেই ছাপাখানার কাজ-কর্মও দেখতে হয়। সমস্ত কথাবার্তা পাকা করে সে দিন ফিরে এলাম। পরদিন কাগজ কালি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক রইল যে, সাত দিনের মধ্যে ছাপার সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে। সাহু মণিরত্নের এ দেশীয় এক শ্যালক আবার ঐ বিহারের একজন ভিক্ষু। সে যখন আছে তখন ছাপার কাজ সময়মতো হয়ে যাবে বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। চার-পাঁচ দিন পর খবর নিয়ে জানলাম ছাপার কাজ আরম্ভই হয়নি। কাজেই আমি সেখানে গিয়ে চেপে বসলাম। কারণ মুখে তারা যাই বলুক, চাপ না দিলে এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না।

নর-থঙ বিহারটি টশী-লুন-পো-র অধীনে। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে লামা স্থম-স্তোন এটি তৈরি করেন। ডুগে-লুক-পা-র সংস্কার আন্দোলনের সময় এখানকার ভিক্ষুরা তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সে জন্য এই বিহারকে লোকে ডুগে-লুক-পা বিহারও বলে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত চন্দন কাঠ ও পিতলের তৈরি সুন্দর সুন্দর অনেক মূর্তি এখনও এখানে রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষ থেকে আনা কিছু মূর্তিও চোখে পড়ল। বিহারের কাছে দুটি মন্দির থুব-বঙ এবং থম-স্থম। এখানেও পুরানো দিনের অনেক মূর্তি আছে। মন্দিরের বাইরে প্রাচীরের গায়ে চুরাশী সিদ্ধের বহু মূর্তি খোদিত রয়েছে। পঞ্চম দলাই লামার অন্যতম অমাত্য মি-বঙ (১৬১৭-১৬৮২ খৃঃ.)-এর আনুকূল্যে এই বিহার যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। মি-বঙ এখানে স্বর্ণাক্ষরে কঞ্জুর ছাপিয়েছিলেন, যা আজও এখানে আছে। সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে যে সমস্ত গ্রন্থ ভাষান্তরিত করা হয়েছিল, তা আগে কোনো সুনির্দিষ্ট সংগ্রহশালায় রাখা ছিল না। বু-স্তোন (মহাপণ্ডিত) রিন-ছেন-গ্রু্ব (১২৯০-১৩৬৮ খৃঃ.) ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলীকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। ঐ দুটি গ্রন্থাবলীর একটি কঞ্জুর এবং আর একটির নাম তঞ্জুর। এ সম্বন্ধে আগেই বিশদ আলোচনা করেছি। বু-স্তোন-এর পরবর্তী কালে ঐ মহাসংগ্রহে আর বিশেষ কিছু যোগ হয়নি। সামান্য যা কিছু হয়েছে তাও পঞ্চম দলাই লামার রাজসভার অনুবাদক লামা তারানাথ (জন্ম ১৫৭৫ খৃঃ.) কৃত। মি-বঙ এই দুই বৃহৎ সংগ্রহকে কাঠের ছোট ছোট পাটিতে খোদাই করে মুদ্রণযোগ্য করে গিয়েছিলেন। ঐ কাঠের পাটি এখনও নর-থঙ বিহারে বর্তমান এবং আমরাও তা থেকেই তঞ্জুর ছাপাবার ব্যবস্থা করেছি। আজকাল টশী-লুন-পোতে টশী লামা না থাকার ফলে এখানকার বিহারের মধ্যে শৃঙ্খলার বড়ই অভাব দেখলাম, প্রকাশ্যেই মদ্যপান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যভিচার চলছে। তা'ছাড়া বিভিন্ন উচ্চ পদের জন্য উৎকোচের বাড়াবাড়িও চোখে পড়ার মতো।

গন-ভী মহারাজা

আমি যখন এ দেশে, ভারতবর্ষে তখন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোর কদমে চলছিল। দেখলাম, সেই আন্দোলনের খবর হিমালয় পার হয়ে এই সংবাদ-পত্রহীন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে একজন ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি ভারতবর্ষের লোক শুনে সে বলল আপনাদের দেশের গন-ভী মহারাজা আসলে হলেন লোবন রিম্পোছে-র অবতার। লোবন রিম্পোছে তিব্বতের সর্বত্র পূজিত এক ঘোর তান্ত্রিক লামার নাম। অবশ্য এই লামার ঐতিহাসিকতা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি তাকে বললাম —আপনাদের লোবন রিম্পোছে তো শুনেছি পিপে পিপে ছঙ ওড়াতেন এবং নারী সম্বন্ধেও ছিলেন খুবই স্বচ্ছন্দ-

গতির মানুষ, কিন্তু গন-তী মহারাজা তো এই দুটোর কাছ থেকেই সহস্র হাত দূরে। আমার কথায় ভিক্ষুটি একটু থতমত খেয়ে গেলো কিন্তু পরমুহূর্তেই উত্তর দিলো কে জানে, এই জন্মে লোবন রিম্পোছে-র হয়ত এটাই ইচ্ছা।

তিন-চার দিন বিহারে থাকার পরও দেখি ছাপার কাজ সেই আগের মতোই। অগত্যা ১২ই মে শীগর্চী ফিরে এলাম। নিজেদের খচ্চর থাকায় সাত মাইল পথ দু' ঘণ্টায় চলে এলাম। রঘুবর আর ধর্মকীর্তি বিহারেই থেকে গেলো। শুনলাম এখানে সৈন্যরা লাসার চেয়ে অনেক বেশী অত্যাচার চালিয়েছে সাধারণ মানুষের ওপরে। লাসায় তবু যা-হোক একটা সরকার ছিল। এ দিকে সিপাই-সান্ত্রীরাই সরকার। যে সব সৈন্য লাসায় থাকবার সময় হয়ত একটু শাসন মেনে চলেছিল তারাই আবার যখন এখানে এসেছে তখন জোর জুলুমের বন্যা বইয়েছে। বিদেশী সৈন্য বাহিনীও বোধহয় বিজিত পক্ষের ওপরে এতটা অত্যাচার করে না। এই নতুন মঙ্গোলদের ভয়ে অধিকাংশ নেপালীই তাদের দোকানপাট বন্ধ রেখেছে।

বহুমূল্য কিছু চিত্রপট এবং গ্রন্থপ্রাপ্তি

টশী-লুন-পো'তে বর্তমানে চারটি ড-ছঙ বা বিভাগ আছে। এগুলো হলো যথাক্রমে অং-পা, শব-চে, কিল-খ, ও খুসা-লিং। এই চারটি ড-ছঙ-এ খন-পো-র সংখ্যাও চার জন। এক সময় টশী-লুন-পো বিহারের মোট ভিক্ষু-সংখ্যা ছিল আটত্রিশ হাজার। কিন্তু যে দিন থেকে টশী লামা চীনে চলে গিয়েছেন সে দিন থেকে এই বিহারেরও পড়তি দশা শুরু হয়েছে। এখন ভিক্ষুর সংখ্যাও অনেক কম, আর বিহারেরও তেমন রমরমা ভাব আর নেই। তবে থাকা খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে এখানকার আবাসিকরা সে-রা বা ডে-পুঙ মঠের চেয়ে এখনও ভালোই আছে বলতে হবে। এখানকার একজন খম-জন (বিদ্যালয় প্রধান) পালিয়ে চীনে গিয়ে টশী লামার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তিব্বত সরকারের তাঁর কাছে কিছু পাওনা ছিল। সে সমস্ত এখন আর আদায় করবার কোনো উপায় না থাকায়, খম-জন-এর জিনিসপত্র বিক্রি করে পাওনা উশুলের চেষ্টা চলছে। শুনলাম বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্রের মধ্যে কিছু চিত্রপটও আছে। খবর পেয়েই দেখতে গিয়ে তিনটে চিত্রপটের সংগ্রহ পছন্দ হলো। একটি সংগ্রহে এগারখানা চিত্রপট ছিল যার বিষয়বস্তু ভারতীয় এবং তিব্বতী আচার্যগণ। দ্বিতীয় সংগ্রহটিতে রেশমী কাপড়ের ওপরে আঁকা আটখানা পট ছিল যার মধ্যে নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি ইত্যাদি ভারতীয় দার্শনিকদের প্রতিকৃতি চিত্রিত ছিল। তৃতীয় সংগ্রহটিতে ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর উত্তর কালে যে সমস্ত অনুগামী তাঁর অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতিকৃতি ছিল। আমি প্রথম দুটি

সংগ্রহ কিনে ফেললাম, কিন্তু টাকার অভাবে তৃতীয় সংগ্রহটি কিনতে পারলাম না।

১৬ই মে তারিখে একটা অমূল্য জিনিস হাতে এসে গেলো। কাছাকাছি গ্রামের এক মঠের লামা তাঁর এক শিষ্যকে দিয়ে একখানা তালপাতার পুঁথি পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, পুঁথিটি কি বিষয়ে লেখা সেটা যেন তাঁকে জানাই এবং পুঁথিটি আমি রেখে দিই। আমি 'কুটিল' লিপিতে (নাগরী বর্ণমালা চল হবার ঠিক আগে আমাদের দেশে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো তারই একটু চক্রাকার লেখনকে কুটিল বলা হতো। সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ ধরনের লিপি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।) লেখা দেখেই বুঝলাম পুঁথিটি রচিত হয়েছে অন্ততপক্ষে দশম-একাদশ শতাব্দীতে। পুঁথিটির নাম বজ্রডাকতন্ত্র এবং এটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়ে কঞ্জুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান লাভ করেছে। বৈশালীর কায়স্থ পণ্ডিত গঙ্গাধর শা-লু মঠের জনৈক ভিক্ষুর সাহায্যে এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ শা-লু মঠেই এই অমূল্য সম্পদটি এতদিন পড়ে ছিল। আজ সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকে আমার হাতে এল। ১৯২৬ সালে আমি যখন লাদাখে গিয়েছিলাম তখন একজন তরুণ লামার কাছে একখানা পুঁথি দেখেছিলাম। তার কাছেই শুনেছিলাম যে, সে ঙো-র মঠের সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানে এ রকম পুঁথি আরও অনেক আছে। আমি টশী-লুন-পো-র আশেপাশে খোঁজ-খবর করেও ও রকম নামের কোনো মঠের হদিশ পাইনি। অথচ তার কাছে যে প্রাচীন আমলের তালপাতার একখানা পুঁথি ছিল তা তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তবে হতে পারে আরও অনেক পুঁথির কথা হয়ত সেই লামাটি বাড়িয়ে বলেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এ দেশ থেকে ফিরে ১৯৩৩ সালে আবার যখন লাদাখ যাই তখন ঙো-র মঠের সঠিক অবস্থানের কথা জানতে পারি। ঙো-র মঠের স্থানীয় নাম এ-বঙ গোম্বা। পন-ছেন (১২১৫-১২৪২ খৃ:) ওটির প্রতিষ্ঠাতা। মঠটি নর-থঙ থেকে আট বেলার পথ। তখন আমার বিশ্বাস হলো ঐ মঠের ভারতীয় ভাষা বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার পুঁথিপত্র থাকা খুবই সম্ভব, কারণ ঐ বিহারটি স-ক্য-পা গোষ্ঠীর অনুগামীদের। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন মহাবিহার এবং তার আচার্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে সময় ঐ সমস্ত পুঁথি ভারতবর্ষ থেকে এখানে আনানো হয়েছিল। এই মঠটি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানবার পর ওখানে না যেতে পারার জন্য খুবই আপশোস হয়েছিল।

১৫ই মে তঞ্জুর ছাপা হয়ে এল। বলা বাহুল্য এ বারও নিরুপদ্রবে হয়নি, মাঝে আরও একবার তাড়া দিতে হয়েছে। বইপত্র যা ছিল সব লাসার মতো করেই প্যাক করলাম। মোম মাখানো চটের থলি না পাওয়ায় শুধু ইয়াকের চামড়া দিয়ে প্যাক করে ফেললাম। শীগর্চী থেকে গ্যাংচী না হয়েও আর একটা ভিন্ন পথে ফ-রী যাওয়া যায়। সেটাই সোজা রাস্তা অতএব মালপত্র সেই পথেই গেলো।

দশম পর্ব

প্রত্যাবর্তন

সীমান্তে

২১শে মে সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই আমি আর ধর্মকীর্তি বেরিয়ে পড়লাম। শা-লু বিহারটি এখান থেকে মাইল দুই-আড়াই দক্ষিণে। দশটার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এই বিহারটিও ভারতীয় রীতিতে সমতল ভূমিতে তৈরি হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় বিহারটি প্রাচীন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বু-স্তোন (মহাপণ্ডিত) রিন-ছেন-ডুব, যাঁর তুল্য পণ্ডিত অতীতে কখনও এ দেশে জন্মায়নি, আর ভবিষ্যতেও নাকি জন্মাবে না, তিনি এই বিহারের বাসিন্দা ছিলেন (১২১০-১২৬৪ খৃ:.)। এখানকার কঞ্জুর এবং তঞ্জুর সংগ্রহটি দেখেই মি-বঙ, নর-থঙ-এ ছাপাখানা বানাবার উৎসাহ পেয়েছিলেন। বিহারটি সাত-আটশো বছরের প্রাচীন অনেক মূর্তি এবং বহুমূল্য গ্রন্থসম্ভারে পূর্ণ। এর মধ্যে ভারত থেকে আনা চন্দন কাঠ আর পিতলের মূর্তির প্রাধান্যই বেশী। একটা বুদ্ধমূর্তি দেখলাম, বর্মী কায়দায় চীবর পরিহিত এবং মূর্তির এক হাত চীবরের প্রান্তদেশ ধরে আছে। ধর্মকীর্তি তো বুদ্ধমূর্তির এ হেন রূপ দেখে অবাক। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম বর্মা দেশে এমন কায়দাতেই চীবর পরা হয়। এখানে হাতে লেখা এবং মি-বঙ-এর ছাপাখানা তৈরি হবার আগেই ছাপা, এই দু' রকমের তঞ্জুর এবং কঞ্জুরের সংগ্রহ দেখলাম। সব দেখা শেষ করে চা খেয়ে সহৃদয় মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। যে পথে এসেছিলাম সে পথেই যাত্রা করে, এক গ্রামে রাত্রিবাস করে ২২শে মে আবার গ্যাংচীতে পৌঁছালাম।

ভেবেছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে টশী-লুন-পো, নর-থঙ আর শীগর্চীর কাজ সেরে ফিরে আসব, সেখানে লাগল তিন সপ্তাহেরও বেশী। লাসা থেকে রওনা হয়েই সিংহলে বন্ধু আনন্দকে তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি, সেইসঙ্গে দেশে ফেরার সম্ভাব্য তারিখ জানিয়ে আলাদা চিঠিও লিখেছি। কিন্তু এ দিকে বাইশ দিন সময় লেগে গেলো, অথচ এর মধ্যে আর কোনো সংবাদ দিতে পারিনি। ফলে আমার কোনো খবর না পেয়ে বন্ধুবর আনন্দ সিংহল থেকে চিঠিপত্রে আমার খোঁজ আরম্ভ করেছিলেন। এ দিকে লঙ্কায় ফিরে, আমার ভিক্ষু হওয়ার সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ভিক্ষু হওয়া যায় না, বছরে একবার এক

বিশেষ সময়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ভিক্ষুজীবনে দীক্ষা দিয়ে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই বিশেষ সময়টি আগতপ্রায়। ফলে আমাদের দু' পক্ষেরই যথেষ্ট চিন্তা হচ্ছিল।

গ্যাংচী পৌঁছে আমার অশ্বতর বাহনটি পড়ল অসুস্থ হয়ে। একে তো নর-থঙ-এ তঞ্জুর ছাপাতে অনেক সময় লেগেছে, এরপর যদি খচ্চরের কল্যাণে সময় নষ্ট হয়ে যায় তবে তো হয়েছে। তিব্বতে প্রত্যেকটি খচ্চরওয়ালা আবার পশু-চিকিৎসকও বটে। একজনকে খবর দিতে সে এসে কি সব ওষুধ দিলো, তার ফলে অল্পেতেই আমার বাহনটি আবার সুস্থ হয়ে উঠল, যাক একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো। তবে এত কিছু সত্ত্বেও ২৩শে মে বেলা বারোটার আগে গ্যাংচী ছেড়ে রওনা হওয়া সম্ভব হলো না।

গ্যাংচী থেকে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তাটির দেখাশোনার ভার বৃটিশ সরকারের। এই রাস্তায় মাঝে মাঝে সেতু বা ক্যালভার্ট করা আছে। পথে রাত্রি-বাসের জন্য স্থান বিশেষে ডাকবাংলো আছে। ডাকবাংলোগুলোতে টেলিফোনের সুবিধাও পাওয়া যেতে পারে। রাস্তার দু' পাশে অসংখ্য পাথরের বাড়ির ভগ্ন-স্তূপ। শুনলাম এ সমস্ত ধ্বংসকাণ্ডই অতীতের মঙ্গোল হামলার ফল। সন্ধ্যাবেলা চন্দা গ্রামে এসে থামলাম রাত্রিবাসের জন্য। গ্রাম তো নয় যেন পাথরের স্তূপ, একটা ভালো বাড়ি পর্যন্ত নেই। গ্রামবাসীদের অবস্থাও খুবই দরিদ্র। পরদিন ২৪শে মে আমরা নদীর তীর ধরে চলছিলাম, তবে ওপরের দিকে। চারদিকে গাছপালা শূন্য নগ্ন পাহাড়ের মেলা। পাহাড়ের গায়ের পাথরগুলোতে কত বিচিত্র রঙের সমাবেশ। পাথরগুলো যেভাবে স্তরে স্তরে সাজানো তাও বড় কম কৌতূহলপ্রদ নয়। কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রগর্ভ থেকে এই সব পাহাড় যখন জন্ম নিয়েছিল তখন তার অঙ্গীভূত পাথরের স্তরের যে বিন্যাস ছিল আজ নিশ্চয়ই তেমনটি নেই। এর মধ্যে প্রকৃতি কত অদল-বদল করেছে। চলতে চলতে এ রকম সমস্ত উদ্ভট ভাবনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ধর্মকীর্তির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন নিয়ে আলোচনা করতাম। ধর্মকীর্তিকে বোঝানো সবচেয়ে কঠিন হতো পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে —বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। অনেক কষ্টে তাকে বোঝালাম যে প্রত্যেক মানুষের মুখে যে পরিমাণ বিষ আছে তা একজন মানুষের জীবনহানি করার পক্ষে যথেষ্ট। সে জন্য যখনই তুমি কোনো কারণে মুখে হাত দেবে, তৎক্ষণাৎ হাত ধুয়ে ফেলবে।

২৪শে মে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রাত্রিতে যে গ্রামে আশ্রয় নিলাম তার নাম সন-দা। এখানকার বাড়িঘরের অবস্থা দেখলাম চন্দা গ্রামের চেয়ে অনেক ভালো। অর্থাৎ এখানে কিছু সচ্ছল লোকের বাস আছে।

সন-দা ছেড়ে যত সামনে এগোচ্ছি ততই জনবসতি কমে আসছে। পথে ক-লা নামে একটা গ্রাম পড়ল যেটি এক সময় খুবই বর্ধিষ্ণু ছিল কিন্তু বর্তমানে প্রায় জনশূন্য। আর একটু এগিয়ে একটা বিরাট হ্রদের মুখোমুখী হলাম। ঠাণ্ডা

ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একে তো বিরাট হ্রদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাস, তার ওপর আমরা ওপরের দিকে উঠছি। গ্যাংচী থেকে প্রায় চৌষট্টি মাইল আসার পর হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গ দেখতে পেলাম। ঐ সমস্ত গিরি-শিখর দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, ভারতবর্ষ আর খুব বেশী দূরে নয়। যদিও এ দিকের উপত্যকা, পাহাড় পর্বত সবই বনস্পতি শূন্য তবুও প্রাকৃতিক সরোবরটি চোখ জুড়িয়ে দিলো। আকাশে ঘন মেঘ, বাতাসের বেগও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। আমরা হ্রদের ডান-দিক ধরে চলেছি। সত্তর মাইল নির্দেশকারী মাইল ষ্টোনটির গায়েই দো-জিঙ গ্রাম। এখানে যে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম তার মালিকানা দুই সহোদরার। কিন্তু তাদের পতি একজনই। তিব্বতে অনেক ভাইয়ের একটি মাত্র স্ত্রী, এটি খুব সাধারণ প্রচলিত ব্যবস্থা আবার কয়েক বোনের মিলিতভাবে একটি মাত্র স্বামী এমনটিও দেখা যায়। যে সমস্ত পরিবারে ছেলে নেই শুধু মেয়ে, তাদের পক্ষে পারিবারিক সম্পত্তি ছেড়ে অন্যত্র সংসার করতে যাওয়া সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে ঘরজামাই রাখার ব্যবস্থা হয়। এ রকম প্রথা অবশ্য আমাদের দেশেও আছে। তবে এ দেশে তফাৎ এটুকুই যে, এখানকার ঘরজামাইরা কেবল একটি মাত্র স্ত্রীর আকর্ষণে সারা জীবন শ্বশুরবাড়িতে আবদ্ধ থাকতে রাজি হয় না, সে জন্য ফাউস্বরূপ শ্যালিকাদেরও দিতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে ভার্যা অর্থাৎ পোষণীয় শব্দটি যথোপযুক্ত নয়, বরং পত্নী অর্থাৎ পালক শব্দটিই যথার্থ। এই প্রথার পিছনের কারণ হলো এটা এক পাহাড়ী অনুর্বর দেশ। দেশের এক বিরাট অংশ বছরের অধিকাংশ সময় খরা পীড়িত আর অবশিষ্টাংশ প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে বরফাচ্ছন্ন। এ রকম একটি চরম আবহাওয়ার দেশে জীবন ধারণের উপযোগী বস্তু সমূহের উৎপাদন খুবই কষ্টসাধ্য এবং সে জন্য অপ্রতুলও বটে। অতএব যত খুশী লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করা, পরিবার বিভক্ত করে চলা এখানকার অধিবাসীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা নিজেদের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে নিজেদের মতো করে এর সমাধান করে নিয়েছে। তিব্বতীরা জীবনযাত্রার প্রতিপদে ঈশ্বর বা খোদার আবির্ভাব না ঘটিয়ে সামাজিকভাবেই সকল ভাইয়ের একটি মাত্র স্ত্রী কিম্বা সকল বোনের একটি মাত্র স্বামী এই নিয়ম মেনে নিয়েছে। এর ফলে সম্পত্তি বিভাজন বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক আচার্যগণ যখন এ দেশে এসেছিলেন, তখন এই প্রথা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু এ হেন কুপ্রথার ফলে আজন্ম নরকবাস ইত্যাদি বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং তাঁরা এই দেশাচারের পিছনের কারণগুলোকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই প্রথা এ দেশের পক্ষে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যাই হোক তিব্বতে এই প্রথার ফলেই দো-জিঙ গ্রামের যে বাড়িতে আমরা উঠেছি সেটি দু' টুকরো হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ফ-রী জোঙ

উচ্চতার আধিক্যের জন্যই এ অঞ্চলে চাষবাস বিশেষ হয় না। পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। পশুর মধ্যে আছে চমরী বা ইয়াক এবং ভেড়া। সামান্য কয়েকটি ছোট ছোট আকারের ছাগলও মিশে রয়েছে ঐ পশুপালের মধ্যে। ছাগল এ সব অঞ্চলে খুব লাভদায়ক নয়, কারণ তার শরীর থেকে পশম পাওয়া যায় না এবং এদের শরীরে চর্বি কম থাকার জন্য মাংসও খুব সুস্বাদু হয় না। ২৩শে মে চলতে চলতে অবশেষে সেই বিশাল হ্রদের শেষ দেখতে পেলাম। এ বার সামনে বিশাল প্রান্তর। দূরে বাঁ-দিকে হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত অঞ্চল। রাস্তায় চলতে চলতে টেলিগ্রাফ লাইনের চীনা মাটির ইন্সুলেটরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলাম। বুঝলাম তিব্বতী পশুপালকের দল ওগুলোর ওপরেই পাথরের টুক্‌রো দিয়ে তাদের লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করেছে। খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকায় এতটা পথ আসতে কোনো কষ্টই হয়নি। সকাল নটা নাগাদ ধু-না গ্রামে পৌঁছালাম। এখানকার বাড়িগুলো অধিকাংশই প্রাচীর ঘেরা। তবে প্রাচীর খুব বেশী উঁচু নয়। ঘাস সমেত মাটির চাপড়া তুলে তাই দিয়ে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। এ অঞ্চলে জলের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বেশী। সে কারণেই এখানে ঘাস জন্মায়। ধু-না গ্রামের প্রতিটি বাড়িই কালিম্পঙ যাতায়াতকারী যাত্রীদের সরাইখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারবাহী পশুদের জন্য ঘাস এবং যাত্রীদের জন্য চা ইত্যাদি সহ বিশ্রামের স্থান করে দেওয়া এখানকার বাসিন্দাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যাত্রীরা খাদ্য ও পানীয়ের মূল্য ছাড়া কখনো হয়ত অতিরিক্ত কিছু ছঙরিন (মদ্য পানের জন্য দেয় বকশিস) দিয়ে থাকে। আমরাও এখানে থেমে শুধু চা খেয়ে নিলাম।

এ বার আমাদের সামনে বিস্তীর্ণ বিশাল মাঠ। তার বুক চিরে পথ চলে গিয়েছে। মাঠে প্রচুর ঘাস জন্মেছে। এদিক-ওদিক ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। বাঁ-দিকে হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত শৃঙ্গের অনেকগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম। একবার মনে হলো যদি ঐ গিরিশৃঙ্গে উঠতে পারতাম, তা'হলে একই সঙ্গে তিব্বত এবং ভারতবর্ষ দুটো দেশকেই দেখতে পারতাম। গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূরে ডাক-বহনকারী রাণারের বিশ্রাম নেবার জায়গা। এরপর একটা ছোট নদী পার হয়ে আমাদের চলা শুরু হলো। খানিক এগিয়ে যেতেই একটা শুকনো খালের মুখোমুখী হলাম। খালের কিনারা ঘেঁসে ডান-দিকে সমকোণে ঘুরে গেছে আমাদের পথ। ঘণ্টাখানেকের মতো বোধহয় চলেছি, তারপরই শুরু হলো উৎরাই। এ দিককার পাহাড়গুলো যদিও বৃক্ষহীন তবুও যেন একটু শ্যামলতার আভা আছে, প্রান্তর যেন ক্রমশ তৃণভূমিতে পরিণত হয়ে চলেছে। সেই তৃণভূমিতে বিরাট দেহের চমরীর পাল ও ছোট-খাটো ভেড়ার পালের সহাবস্থান চলেছে। নির্জন

তৃণভূমি অতিক্রম করার পর লোকালয় দেখতে পাওয়া গেলো। সাড়েতিনটের সময় আমরা ফ-রী জোঙ পৌছালাম।

এখানেও ছু-শিঙ-শা কুঠির একটি শাখা বর্তমান। গুভাজু ধীরেন্দ্র বজ্র এখানেই ছিলেন। দেখা হতেই আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন। এখানকার সমস্ত বাড়ি-ঘরই খুব সুন্দর করে সাজানো, তবে কেন জানি না প্রত্যেক ঘরের মেঝেই বাইরের রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচুতে। নিকটেই জঙ্গল থাকায় বাড়ি তৈরির জন্য কাঠের ব্যবহার অধিক। এই গ্রামের নাম ফ-রী হওয়ার কারণ কাছের বরাহ আকারের পাহাড়টি। ফ-রী শব্দের অর্থ বরাহগিরি। পূর্বে ঐ পাহাড়ের ওপর একটা জোঙ ছিল, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইংরেজরা ওটিকে ধ্বংস করে দেয়। ফ-রীতেও বৃটিশের ডাক বিভাগ এবং টেলিগ্রাফ কেন্দ্র আছে। এখান থেকে বাঁ-দিকের পাহাড় পার হয়ে ভুটান আধবেলার পথ। প্রত্যেক দিন ভুটানীরা ফলমূল, তরীতরকারী, চিড়ে ইত্যাদি নিয়ে এখানে আসে এবং স্থানীয় একটি প্রায় অন্ধকার ঘরে নিত্যকার যে হাট বসে সেখানে সে সব বিক্রি করে। দোকানদারদের মধ্যে সাত-আট জন নেপালীও আছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে ফ-রী'তে শ'খানেক ঘরের বসতি হবে। এখানে এসে দেখি আমার মালপত্র অধিকাংশই এসে গেছে। গ্যাংচী থেকে ফ-রী পর্যন্ত প্রতিদিন ডাক চলাচল করে। এখান থেকে কালিম্পঙ পর্যন্ত যাবার জন্য সতেরটা খচ্চর ভাড়া করলাম। কারণ এখন দু' জন ছাড়া প্রচুর মালপত্রও রয়েছে। প্রতিটি খচ্চরের জন্য ষোল টাকা করে ভাড়া ঠিক হলো। ভাবলাম এই বেলা আমাদের খচ্চর দুটিকেও বিক্রি করে দিই। একজন ও দুটোর জন্য দুশো সত্তর টাকা পর্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তখন আবার মনে হলো, আরও আগে গেলে হয়ত বেশী দর পাব। ধর্মকীর্তি খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে আগেভাগে রওনা হয়ে গেলো। কিন্তু আগে গিয়ে দাম বেশী পাওয়ার বদলে কমই পেলাম। মাত্র দু'শো চল্লিশ টাকায় খচ্চর দুটোকে বিক্রি করতে হলো। ফ-রী উপত্যকায় বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ফলে কৃষি-কাজ সুবিধার হয় না। ২৯শে মে ফ-রী ত্যাগ করলাম। ছু-শিঙ-শা-র স্থানীয় শাখার বরখাস্ত কর্মচারী কান্ছা আমাদের সঙ্গে চলল। সে হলো ছু-শিঙ-শা কুঠির মালিক ধর্মমান সাহুর আপন ভাগ্নে। ছেলেটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। এত অল্প বয়সেই সে ফ-রী শাখাব সমস্ত ব্যবসাপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়েছিল। তিব্বতে মদ্যপান এবং নারী সংসর্গ কাউকে ফতুর করতে পারে বলে মনে হয় না। কারণ দুটোই এখানে অঢেল মেলে এবং তার জন্য এমন কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয় না যে মানুষ ফতুর হয়ে যেতে পারে। তা'ছাড়া স্থানীয় মেয়েরা রক্ষিতাবৃত্তি করলেও খুব লোভী হয় না। তবে ও রকম একটা অল্প বয়সের ছেলের হাতে অত কাঁচা পয়সার ভার দিয়ে ফ-রী-র মতো জায়গাতে পাঠানোটাই ভুল। এ জায়গাটা তিব্বত, ভুটান আর ভারত এই তিন দেশের লাগোয়া। এই তিন দেশের মত

ধূর্ত, ঠগ, চোরাকারবারীদের আড্ডা হলো এই ফ-রী। নেপালীদের ব্যবসার রীতিনীতি একটু অন্য রকমের। চলছে তো চলছে, হয়ত কয়েকবছর বাদে একবার হিসেব মেলাবার কথা মনে হলো। এ রকম ভাবেই যখন কান্ছার হিসেবপত্র দেখার পালা এল, তখন দেখা গেলো বেশ কয়েকহাজার টাকার গরমিল। সকলেই একবাক্যে বলতে লাগল জুয়া এবং মেয়েমানুষের পেছনেই এত টাকা কান্ছা উড়িয়েছে। কিন্তু কান্ছার তিব্বতী স্ত্রীটি, যে আবার ছিল কান্ছার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, সে তো শপথ করে বলল যে, সে তেমন কিছুই নেয়নি। বরং নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে কান্ছাকে খাইয়েছে। কান্ছা যেহেতু বয়সে তার চেয়ে ছোট সে জন্য কান্ছার প্রতি সত্যি তার মন বসে গেছে। সকলেই কান্ছার স্ত্রীর কথাকে সত্যি বলেই জানত, কিন্তু মেয়েটির বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ ছিল। প্রথমত সে ঠিক কান্ছার বিবাহিত নয় রক্ষিতা গোছের এবং কান্ছা ছাড়া আরও বহু জনকেই সে দেহ দান করত, হয়ত কান্ছার প্রতিই বেশী টান ছিল। তবে সকলেই এমন কি কান্ছার সেই তথাকথিত স্ত্রীটিও একমত হয়ে বলল জুয়াতেই বেশীর ভাগ টাকা-পয়সা উড়ে গেছে। সকলেই ছেলেটিকে খুব গাল-মন্দ করছিল। আমি বললাম —দোষ তোমাদের, তোমরা ছেলেটির সামনে তার অধঃপাতে যাবার সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে রেখে দিয়েছ আর এখন তাকে অধঃপাতে গেছে বলে দোষারোপ করছ। তা'ছাড়া যদি টাকা-পয়সা নষ্ট করেও থাকে, তা'হলে মামার টাকা ভাগ্নে উড়িয়েছে, সুতরাং অন্যদের মাথা গলাবার প্রয়োজন কি ?

ফ-রী ছেড়ে বেরিয়ে খানিকটা সমতল ও খানিকটা উৎরাইয়ের পথ ধরে ঘণ্টা-দেড়েক হাঁটা হলো। এ দিককার পথের বৈশিষ্ট্য হলো দু'পাশে ছোট-বড় অনেক-গুলো ঝর্ণাধারা এবং তারই ফলে যতদূর চোখ যায় সবুজের বিপুল সমারোহ। উৎরাইয়ের পথে যত নামছি ততই বনস্পতির জগতে প্রবেশ করছি। এ অঞ্চলে টেলিগ্রাফ লাইনে লোহার খুঁটির বদলে কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঘণ্টা-তিনেক চলার পর মনে হলো যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছি। তখন শুধু দেবদারু, পাইন আর ফারের মেলা। প্রথম দিকে গাছের দৈর্ঘ্য কিছুটা কম তারপর যতই এগোই ততই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সরল বৃক্ষের দেখা পেতে পেতে এক সময় যেন আকাশছোঁয়া গাছের দেশে পৌছে গেলাম। পথে যে সমস্ত লোকালয় পড়ল তার অধিবাসীরা একটু ভিন্নতর। পোশাক-পরিচ্ছদে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাড়িঘর সাজানো-গোছানো। সন্ধ্যাবেলা কালিঙ-খা গ্রামে পৌছালাম।

পাহাড়ী জাতির সৌন্দর্য

কালিঙ-খা গ্রামটি মাঝারি আয়তনের। ঘরবাড়ির সংখ্যা একশোর মতো। কাছাকাছি জঙ্গল থেকে অঢেল দেবদারু কাঠের যোগান দেবার ব্যবস্থা থাকায়

এখানকার প্রতিটি বাড়িতেই দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে যথেচ্ছভাবে। প্রতিটি বাড়িতেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলছে, বলা বাহুল্য জ্বালানীও দেবদারু কাঠ। আমরা খচ্চরওয়ালার বাড়িতেই থাকলাম। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির মতো এটিও দোতলা এবং বেশ উঁচু ছাদ। একতলায় গৃহপালিত পশুদের আস্তানা আর দোতলা মানুষের জন্য। তিব্বতের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে তুলনা করলে পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এ বাড়িটিকে স্বর্গ বলা যেতে পারে। স্থানীয় লোকজনের চেহারাও বেশ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। মেয়েদের বেশভুষা অনেকটা আমাদের দেশের কিনৌর অঞ্চলের মেয়েদের মতো। এদের গায়ের রঙ গোলাপী নাকও মঙ্গোলিয়ানদের মতো অতটা চ্যাপ্টা নয়। আমার মতে হিমালয়ের তিনটি অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সৌন্দর্য দেবীর একটু বেশী রকমের কৃপা আছে। একটা হলো রামপুর-বুশহর রাজ্যে শতদ্রু নদীর ওপরিভাগের কিনৌর বা কিন্নর দেশ। দ্বিতীয় কাঠমাণ্ডু থেকে উত্তরে চার-পাঁচ দিনের পথে য়ল্মোদের দেশ এবং তৃতীয় এই ডো-মো প্রদেশ যাকে ইংরেজরা বলে চুম্বী উপত্যকা। এই তিন জায়গাতেই প্রকৃতি দেবী যেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়েছেন। যদিও য়ল্মোদের মধ্যে যারা পাহাড়ের নীচের দিকটাতে থাকে, তাদের সৌন্দর্যের অনেকখানি সমতলের নবাগতদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওপরিভাগের অপেক্ষাকৃত দুর্গম-অঞ্চলে ঘন দেবদারুর ছায়ায় যাদের বাস, তাদের সৌন্দর্যের খ্যাতি এখনও অম্লান। যদিও আমি সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই, তবু আমার মতে কিন্নর সুন্দরীরা প্রথম, ডো-মো বাসীনিরা দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থান য়ল্মো দুহিতাদের। তবে এটা হলো চোখ, নাক মুখের গঠন অনুসারে। আবার রঙের দিক থেকে বিচার করলে য়ল্মো কন্যার স্থান সর্বাগ্রে। তারপর ডো-মো-বাসিনী এবং কিন্নর সুন্দরীর স্থান সেখানে তৃতীয়। হিমালয়ের এই তিন অঞ্চলে কেন এত সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হলো, তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার ধারণা হয়েছে যে আর্য এবং মঙ্গোল রক্তের সংমিশ্রণই এর প্রধান কারণ। কিন্নরীদের মধ্যে আর্য রক্তের প্রভাব শতকরা প্রায় আশী ভাগ যদিও তাদের ভাষা শুনলে এর বিপরীতটাই মনে হতে পারে। ডো-মো দুহিতাদের তুলনায় ডো-মো পুরুষেরা কিন্তু ততটা সুন্দর নয়। এটাও প্রকৃতির একটা খেয়াল। ডো-মো উপত্যকা সব দিক থেকেই আমাকে মুগ্ধ করল। আমাদের খচ্চরওয়ালার অনুরোধে আরও একটা দিন এখানেই কাটালাম। ডো-মো-র লোকেরা চাষবাস করে, তবে পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা। শস্য ছাড়া আলু এবং অন্যান্য তরীতরকারীর চাষও হচ্ছে দেখলাম।

৩০শে মে ডো-মো উপত্যকার সৌন্দর্যের পরিবেশ থেকে বিদায় নিলাম। কিছু দূর গিয়ে আমাদের দেশের মতো ছোট আকৃতির কাক দেখতে পেলাম। তিব্বতের কাকগুলো ছিল বেশ বড় বড়। দেখতে যেন চিলের মতো। নদীর কোল-ঘেঁসে সুন্দর রাস্তা। এক ঘণ্টা চলার পর আমরা স্যা-সীমা নামে একটা জায়গায় এসে

থামলাম। এখানে ইংরেজদের একটা সৈন্যাবাস আছে, তা'ছাড়া তাদের একটি কুঠি এবং ডাক ও তার বিভাগের অফিস আছে। ১৯০৪ সালের যুদ্ধের পর ডো-মো উপত্যকা বহু দিন ইংরেজদের দখলে ছিল। তখন এই স্যা-সীমা গ্রামই ছিল ডো-মো-র শাসনকেন্দ্র। পরবর্তী কালে চীন, ইংরেজ সরকারকে ভালো রকম ক্ষতিপূরণ দিয়ে ডো-মো উপত্যকাকে উদ্ধার করে তিব্বতকে ফিরিয়ে দেয়।

স্যা-সীমা ছাড়িয়ে ছে-মা গ্রাম। চেহারায় এটি কালিঙ-খা গ্রামের মতো, সে রকমই কাষ্ঠ সম্পদে পূর্ণ, তারপরের গ্রাম রিন-ছেন-গঙ। প্রত্যেক গ্রামেই দু' টাকা করে দিতে হলো খচ্চরের পরিচর্যার জন্য। রিন-ছেন-গঙ-এ ধর্মকীর্তির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেলো। ওকে বললাম, আর আলাদা গিয়ে কাজ নেই, মালপত্র নিয়ে দু' জনে এখন থেকে এক সঙ্গেই যাব। এরপরের রাস্তা চড়াইয়ের। পথে বৃষ্টি নামল। এতদিন যে জায়গায় কাটিয়ে এলাম, সেখানে বৃষ্টি হয় না বললেই হয় তাই এই বৃষ্টিটুকুকে বড় ভালো লাগল। বৃষ্টির মধ্যেই চলছিলাম। অবশেষে দেবদারু বনের মধ্যে য়ু-থঙের সরাইখানাতে এসে উঠলাম। একজন বৃদ্ধা সরাইখানাটি পরিচালনা করে। বিরাট আয়তনের সরাইখানা। এ অঞ্চলে কাঠের অভাব নেই তাই ঘরগুলি সুপ্রশস্ত করতে অসুবিধা হয়নি। একশো-দেড়শো খচ্চর ঘোড়ার সঙ্গে সেই পরিমাণ মানুষেরও থাকার বন্দোবস্ত আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর কামরায় বসে আমরা নিছক গল্পগুজব করছি, এমন সময় সরাইখানায় একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষের আগমন ঘটল। সরাইয়ের বৃদ্ধা পারিচালিকা দেখি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাদের আপ্যায়ন করতে লাগল। তাদের খাতিরের বহর দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, আগন্তুকেরা বেশ কেউকেটা গোছের হবে। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল ততক্ষণ ওরা দু' জনে চা খেয়ে আর গল্প করেই কাটাল। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওদের বাড়ি ফ-রী জোঙ-এর কাছে, সম্প্রতি কালিম্পঙে ডো-মোঙ-গে লামাকে দর্শন করে ফিরছে। কিন্তু যেই সন্ধ্যা হলো তখন দেখি তাদের আর এক রূপ। স্ত্রীলোকটি নানা কায়দায় আড়ামোড়া ভাঙছে, গড়িয়ে পড়ছে আর সঙ্গের লোকটি তাকে কখনো হাত ধরে বসাবার চেষ্টা করছে, কখনো দেখি নানা রকম দেবতা দানব আঁকা একটা কৌটো তার মাথায় রাখছে। এক সময় দেখি লোকটি হাঁটুগেড়ে করজোড়ে তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। শুনলাম মহিলাটি নাকি দেববাহিনী। ফলে মাঝে মধ্যেই দেবতারা তার ওপর ভর করে থাকেন। কিছুক্ষণ এ রকম হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত পা ছোঁড়ার পর এক ঝটকায় লোকটিকে ঠেলে ফেলে ঘরের বাইরে চলে গেলো। আমরাও কৌতূহল দমন করতে না পেরে পিছু পিছু গেলাম। দেখলাম দেববাহিনী মহিলা আমাদের সরাইমালিকানীর ঘরে একটা মোটা গদীর ওপরে বসে। ঘরের ভিতর ইতিমধ্যে পাঁচ-সাতটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। মহিলার সামনে একটা পিতলের পাত্রে খানিক কাঁচা মদ অর্থাৎ ছঙ রাখা আছে। কিছুক্ষণ পরে মহিলার স্বামীটিও একটা ডমরু জাতীয়

বাজনা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেববাহিনী মহিলা একটা ধনুকের মতো কাঠি দিয়ে সেটিকে বাজাতে শুরু করল। শুনলাম এ বার মহিলার জিভে স্বয়ং দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হবেন। এরপর মহিলার সমস্ত কথাবার্তাই পদ্যছন্দে হতে লাগল। প্রথমে দেবী পদ্যে আপন পরিচয় দিলেন। খচ্চরওয়ালাদের ঘরণীরা যারা ঘাস-পাতার যোগাড়ে গিয়েছিল তারাও পড়ি কি মরি করে ছুটে এল। এরপর সমবেত লোকেরা আপন দুঃখ কষ্টের কথা দেবতাকে নিবেদন করতে শুরু করল। প্রশ্নকর্তাকে অবশ্য প্রশ্ন করার আগে সামান্য কয়েকআনা পয়সা দেবীর সামনে রাখতে হচ্ছিল, তারপর করজোড়ে প্রশ্ন করার পালা। দেবী এ দিকে মাঝে মাঝে সামনের পাত্র থেকে পেয়ালা ভরে ছঙ পান করে চলেছেন। একজন প্রশ্ন করল—আমার খচ্চরটিকে যথেষ্ট সাবধানে রাখি, যত্ন আত্তির করি কিন্তু তবু সে রোগা প্যাঁটকা হয়ে যাচ্ছে কি কারণে? কি করলে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? তৎক্ষণাৎ দেবী পদ্যছন্দে বিধান দিলেন:

হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়টি আমি জানি
খচ্চরের রোগের কথাও মানি
রাস্তার ধারে আছে কালো এক ক্ষেত
সেইখানে বাস করে ভীষণ এক প্রেত
সে প্রেতের কাজই হলো এই
কিন্তু জেনো খচ্চরের মরণ নেই
ছঙ আর ডিম দিয়ে পূজা দিলে পরে
খচ্চরের সব রোগ যাবে চলে দূরে।

সে দিন তো সরাইখানাতে সারাক্ষণই ভিড় জমে রইল। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কিছু না কিছু দুঃখ কষ্ট জমে আছে। এই সুযোগে সে সমস্ত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় জেনে নিতে সকলেই আগ্রহী। দেবী কিন্তু অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হিসাবে ভূত-প্রেত শান্তির বিধান দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে দেববাহিনীর সামনে দু'এক আনা পড়তে পড়তে এখন দু' আড়াই টাকা জমা হয়ে গেছে। আমি একটু কৌতুক করবার জন্য কান্‌ছাকে বললাম, প্রশ্ন করতে। কান্‌ছা দেবীর সামনে পয়সা রেখে উকীল মারফৎ প্রশ্ন করল—বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে ছেলের খুব অসুখ, সে সম্বন্ধে দেবী কি বলেন? বলা বাহুল্য পদ্যছন্দে উত্তর পাওয়া গেলো:

জানি অসুস্থ হয়েছে তোমার ছেলে
এসেছ আমার কাছে যদি কোনো উপায় মেলে
যদিও দেবতাগণ আছেন নারাজ
তবু বলি ভাবনাতে নেই কোনো কাজ
নগর দেবতা যিনি, তিনি হবেন সহায়
যদি কেউ ভক্তিভরে পূজা চড়ায়

দেবতার কৃপা হলে নেই কোনো ভয়
মঙ্গলে ভরে যাবে সকলের ঘর।

উত্তর শুনে কান্‌ছা তার পাশের লোকটিকে চুপিচুপি বলল, আমার ছেলে তো দূরের কথা আমার তো এখনও বিয়েই হয়নি। তবে দু' একজন অবিশ্বাস করলে কি-ই বা এসে যায়, যেখানে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আসলে দেবী সরাইখানাতে অনেক লোকের ভিড় দেখে আবির্ভূতা হয়েছেন এবং বেশ সহজেই ছঙ পান করতে করতে টাকা তিন-চার রোজগারও করে ফেলেছেন।

সিকিম রাজ্যে

১লা জুন সিকিম অভিমুখে যাত্রা করলাম। কঠিন চড়াই ও বৃষ্টির মধ্য দিয়ে জে-লপ গিরিসঙ্কট পার হয়ে দেখলাম চারদিকে বেশ বরফ পড়েছে। এখানেই সিকিম এবং তিব্বতের সীমান্ত এরপরেই ইংরেজদের একচ্ছত্র অধিকার। সুতরাং ১লা জুনই আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এতটা পথ চড়াই ভেঙে আসার ফলে বিপরীত দিকে অনেকটা উৎরাইয়ের রাস্তা পেয়ে গেলাম। মাইল তিন-চার নামার পর কু-পুক-এর ডাকবাংলোতে পৌছালাম। এখানে দেখি দু' তিনটি রুটি এবং চায়ের দোকানও আছে। দোকানগুলো সবই নেপালী গোর্খাদের। বৃষ্টির জন্য কু-পুক-এর ডাকবাংলোতে রাতে থেকে যাওয়াটাই স্থির হলো।

২রা জুন, কিছুটা গিয়ে তু-কো 'লা' (গিরিসঙ্কট) পার হলাম। বেলা সাড়ে-তিনটের সময় আমরা যে গ্রামে এসে থামলাম, তার নাম পদম-চেঙ। এখানে আর দেবদারু গাছের তেমন ঘন অরণ্য নেই, তাপমাত্রাও কিঞ্চিৎ বেশী। গ্রামের কাছেই একটা ঝর্ণা, সেখানে খুব করে সাবান মেখে স্নান করে নিলাম। এখানে কেউ যখন আমার পরিচয় জানতে চাইছিল তখন নিজেকে আর লাদাখী বা নেপালী না বলে মদেসিয়া বলে পরিচয় দিলাম। (যুক্তপ্রদেশ, [অধুনা উত্তর প্রদেশ] বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা, যারা চা-বাগানে কাজ করার জন্য এ সমস্ত অঞ্চলে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে, স্থানীয় লোকে তাদেরই মদেসিয়া বলে)। রাতে গ্রামেই থেকে গেলাম। ৩রা জুন সকালে উঠে আবার চলা শুরু করে সকাল নটার সময় ছোট একটা গ্রামে এসে থামলাম। এখানকার প্রতিটি ঘরই দেখি দোকানঘর। অনেক দিন পর এখানে এসে আবার মাছি দেখতে পেলাম। তাও আবার দু' একটি নয় অগুনতি। সিকিমে ঢোকার পর থেকেই তিব্বতী মাখন-চায়ের বদলে আমাদের পরিচিত বেশ করে চিনি দুধ দেওয়া চা পাচ্ছি। তবে এখানে মাছিদের অত্যন্ত উপদ্রব দেখে আর চা খেতে ইচ্ছে করল না। শুধু রুটি দিয়েই জলযোগ সেরে নিলাম। দুপুরের আগেই রো-লিঙ-ছু-গঙ পৌছে গেলাম। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি ভালো দোকান আছে। যার মধ্যে একটির মালিক আবার

বিহারের ছাপরা জেলার বাসিন্দা। বহু দিন পর পরিচিত ভোজপুরী ভাষা কানে যেন মধু বর্ষণ করল। আমি কিন্তু নিজের পরিচয় দিলাম না, দিলেই এখানে থামতে হবে এবং তাতে অযথা সময় নষ্ট। গ্রাম ছাড়িয়ে নদী। নদীর ওপরে লোহার শেকলের সেতু। সেটি পেরিয়ে আবার মুখোমুখী হলাম চড়াইয়ের। এখানে পথের দু'পাশে গোর্খাদের গ্রাম। জমিতে আবাদের কাজ চলছে। ফসলের মধ্যে মকাইয়ের চাষই হয়েছে বেশী। দুপুর দুটো নাগাদ দো-লম-চেঙ গ্রামে পৌছালাম। এখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন করা হলো। একজন সিকিমী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁর কাছ থেকে সিকিম সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিলাম। সিকিম রাজ্যে প্রকৃত সিকিমীদের সংখ্যা হাজার পনের মাত্র, বাদ বাকি সবই দেশত্যাগী গোর্খা। পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জুন আবার বিপরীত দিকে নামার পালা। নীচে নামতে লক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম। আর একটু এগোলেই নদীর ওপরে সেতু। এই সেতুই সিকিম এবং দার্জিলিং জেলার সীমানা নির্ধারণ করছে।

কালিম্পঙে

যখন শুনলাম, দার্জিলিং জেলাতে ঢোকার পরও চড়াই ভাঙতে হবে। তখন মনটা একটু দমে গেলো। এখানে খৃষ্টান মিশনারীদের খুব বড় একটা স্কুল আছে। আমার অশ্বতরটির নাল খুলে গিয়ে বেচারা খোঁড়া হয়ে পড়ায় অগত্যা পদযুগলের ওপর নির্ভর করতে হলো। বলা বাহুল্য পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এখান থেকে প্রচুর কাঠ চালান যাচ্ছে দেখলাম। দুপুরবেলা অল-গর-হা বাজারে পৌছে দেখলাম, আমার দেশোয়ালী ছাপরাবাসীদেরও বেশ কয়েকটি দোকান আছে। এক দেশোয়ালী দোকানদারের কাছে ভোজপুরী ভাষায় জল চাইলাম। আমার মুখে ভোজপুরী শোনা সত্ত্বেও সে আমাকে নেপালীই ভেবেছিল, অবশেষে পরিচয় দিতেই খুব আগ্রহের সঙ্গে আমন্ত্রণ এল। আর সেইসঙ্গে পেলাম বেশী পরিমাণ দুধ দিয়ে তৈরি চা। দু' এক কান হয়ে খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য ছাপরাবাসীরাও এসে হাজির। শীতলপুরের মিশ্রজী তো শুনে দৌড়ে এলেন। তিনি আমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। শুনলাম তাঁর মিশ্রাইন (স্ত্রী) এক সময় আমার পড়শী ছিলেন। তা'ছাড়া দিনটিও নাকি কোন এক পূজার দিন, সেই উপলক্ষে পুরী ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। এ রকম নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে মন আর সায় দিলো না। অতএব খাওয়া-দাওয়া সারতেই হলো। মিশ্রজী এখানে একটা দোকান দিয়েছেন যেখানে কাপড়, সিগারেট, চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলার চাষবাস যেমন গোর্খাদের হাতে তেমনি এখানকার ব্যবসাপত্র, কয়েকটি বড় মাড়োয়াড়ীদের দোকান বাদ দিলে অধিকাংশই ছাপরা জিলাবাসীদের হাতে।

এখানেও খচ্চরের পায়ের নাল লাগানো গেলো না। অতএব সেটির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হাঁটতে হচ্ছিল। রাস্তায় একটি বৌদ্ধমন্দির পড়ল। শ্রীধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য সে সময় মন্দিরেই ছিলেন। উনি নেপালের একজন খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিত এবং কলকাতাস্থ নেপালী ভাষা-সাহিত্য মণ্ডলের অন্যতম পরিচালক। সে দিনের মতো আমরা সবাই ওঁর আশ্রয়েই গিয়ে উঠলাম। পরদিন সকালে আমাদের দেশে ফেরার খবর দিয়ে শ্রীলঙ্কায় একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। বইপত্র পাঠাবার দায়িত্ব ছু-শিঙ-শা-র এজেণ্ট এবং কালিম্পঙ-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুহ্য-কুঠির স্বত্বাধিকারী ভ়াজুরত্ন সাহু স্বয়ং নিয়েছিলেন। তাই সে কম্পর্কে আমার আর কোনো চিন্তাই ছিল না। তবে কিছু ছবি এবং পটের প্যাকিং যথেষ্ট ভালো না থাকায় সেগুলোকে খুলে নতুন করে আবার কাঠের বাক্সে প্যাক করালাম। ঠিক করলাম যে এগুলোকে এ বার থেকে আমার সঙ্গেই রাখব। ধর্মকীর্তি এখানে চারদিকে এত সবুজের সমারোহ দেখে খুব খুশী। কিন্তু এখানকার গরম বেচারাকে খুব তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেলল, সে আর এগোতে নারাজ। আমি অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম।

কালিম্পঙ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা হলো। ৬ই জুন বেলা তিনটের সময় শিলিগুড়ি রওনা হলাম। যত নীচে নামছি ততই ঘাম বাড়ছে। সমতলের ভ্যাপসা গরমের মুখোমুখী হতে চলেছি আমরা। তিস্তার পুল পার হয়ে দেখি ধর্মকীর্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাহাড়ের জগৎ পিছনে রেখে এ বার আমরা সমতলে এসে গেলাম। চারদিকে আগামী মরসুমের চাষবাসের প্রস্তুতি চলছে। অধিকাংশ চাষীই বাঙালী মুসলমান। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমরা এখন বাংলাদেশে। সন্ধ্যাবেলা শিলিগুড়ি রেলষ্টেশনে যখন পৌঁছালাম, তখন দেখি ধর্মকীর্তি একেবারে এলিয়ে পড়েছে। আমি এ বার ভয় পেয়ে গেলাম। জুন মাসের গরমের মধ্যে রেলগাড়ীর ধকল বেচারাকে হয়ত প্রাণেই মেরে ফেলবে। অতএব যে ট্যাক্সি করে কালিম্পঙ থেকে শিলিগুড়ি এসেছি তারই চালককে অনেক অনুরোধ করে ধর্মকীর্তিকে আবার কালিম্পঙেই ফেরৎ পাঠালাম। ওখান থেকে ও আবার তিব্বতে ফিরে যাবে। খুবই ভারাক্রান্ত মনে ধর্মকীর্তির মতো একজন সহৃদয় উপকারী বন্ধুকে বিদায় জানালাম।

আবার লঙ্কায়

রাত্রির গাড়ীতে কান্ছা ও আমি কলকাতা রওনা হলাম। পরদিন ভোরে কলকাতা পৌঁছে হ্যারিসন রোডে ছু-শিঙ-শা-র গদীতে গিয়ে শুনলাম লঙ্কা থেকে আমার জন্য চারশো টাকা এসেছে। তিন হাজার টাকা লাসাতেই পেয়েছিলাম। লঙ্কায় পাকা-

পাকিভাবে যাবার আগে পাটনা এবং বেনারসে কিছু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। সারা দেশ জুড়ে তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোয়ার বইছিল। কলকাতায় সত্যাগ্রহীদের ওপরে পুলিশকে লাঠি চালাতে দেখলাম।

১০ই জুন পাটনা পৌঁছেই গেলাম স্বরাজ্য আশ্রমে। ব্রজকিশোর বাবুকে সেখানেই পেয়ে গেলাম, তাঁর কাছেই খবর পেলাম যে বীহপুরে পুলিশের লাঠি চালানোতে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদজীও আহত হয়েছেন। পাটনায় বন্ধু অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের বাড়িতেই অতিথি হলাম। ১১ই এবং ১৩ই জুন কাটল বেনারসে। বন্ধু আনন্দকে বাদ দিলে আমার এই অভিযানে আচার্য নরেন্দ্রদেবের সাহায্যই ছিল সবচেয়ে বেশী। সে জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো ছিল আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী।

১৫ই জুন ফিরে এলাম কলকাতায়। ভারতবর্ষে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেলাম না, যাঁরা আমার আনা বিপুল গ্রন্থসমূহের দায়িত্ব নিতে পাবেন। অগত্যা বাধ্য হয়েই সমস্ত বইপত্র লঙ্কা পাঠানোই ঠিক করলাম এবং ছু-শিঙ-শা-র কলকাতা শাখাকেই এ কাজের ভার দিলাম। সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেসন কোম্পানির লঙ্কাস্থ প্রতিনিধি শ্রীনানাবতী আমার এই সমস্ত বইপত্র বিনা মাশুলে তাঁদের কোম্পানির জাহাজে করে লঙ্কায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রাখলেন। এ বার সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে ১৬ই জুন লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করে ২০শে জুন গিয়ে সেখানে পৌঁছালাম।

আমার এবং ভদন্ত আনন্দের উপাধ্যায় ত্রিপিটকাবাগীশ্বরাচার্য শ্রীধর্মানন্দ নায়ক মহাস্থবির ২২শে জুন আমার প্রব্রজ্যার দিন নির্দিষ্ট করলেন। শ্রমণ হতে প্রব্রজ্যা নেবার প্রাক্‌মুহূর্তে আমার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব এল। মুহূর্তের মধ্যেই নাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। রামোদারের 'রা' শব্দটিকে নিয়ে নিজের নামকরণ করলাম রাহুল এবং নিজের সাংকৃত্য গোত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অবশিষ্টাংশকে করলাম সাংকৃত্যায়ন। ২২শে জুন, ভিক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট পীত বস্ত্রের সঙ্গে আমার নতুন নামকরণ হলো—রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ২৮শে জুন সঙ্ঘও আমাকে ভিক্ষু হিসাবে স্বীকৃতি দিলো এবং সেই মতো ঐ দিন কাণ্ডী নগরে সঙ্ঘের সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমার উপসম্পদা (ভিক্ষু জীবনের নিয়মাবলী) সম্পূর্ণ করলাম।

লঙ্কা থেকে একদিন যে অভিযান শুরু করেছিলাম, আবার লঙ্কাতেই তার সমাপ্তি ঘটল।